JANMABHUMI Rs. 25

(A Bengali Novel)

By PRAFULLA ROY

Dey's Publishing, C/o. Dey Book Store
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

জন্মভূমি

প্রফুল্ল রায়



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৫৮

LIBRARY
SL/R.R.R/
MR. NO. (R.K.R.L.F.)(GEN) 74332

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ :
ধীরেন শাসমল

মুদ্রক :
শিবনাথ পাল
প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

দাম : পঁচিশ টাকা

শ্রীমণীন্দ্র রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

আলোছায়াময়
যুদ্ধযাত্রা
দায়দায়িত্ব
হৃদয়ের ঘ্রাণ
আক্রমণ
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
আকাশের নীচে মানুষ
দায়বদ্ধ
চতুর্দিক
রামচরিত্র
ধর্মান্তর
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
বাঘবন্দী
স্বর্গের ছবি

আমাকে দেখুন ১/২/৩/৪
একাকী অরণ্যে
শীর্ষবিন্দু
সুখের পাখি অনেক দূরে
রৌদ্রঝলক
শঙ্খিনী
আমার নাম বকুল
নয়না
নিজের সঙ্গে দেখা
আলোর ফেরা
পূর্বপার্বতী
মহাযুদ্ধের ঘোড়া ১/২
সিন্ধুপারের পাখি
নোনা জল মিঠে মাটি
তিনমূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে

শ্রেষ্ঠ গল্প

জন্মভূমি

বোয়িং ৭০৭ প্লেনটা এয়ারপোর্টের মাথায় তিন চারটে পাক খেয়ে ঝপ্ করে বাজপাখির মতো নেমে এল। রানওয়ের ওপর দিয়ে মসৃণ বেগে খানিক ছুটবার পর ইণ্টারন্যাশনাল টার্মিনাল বিল্ডিং-এর সামনে এসে তার গতি একেবারে স্তব্ধ। এয়ার হোস্টেস-এর সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, 'আমরা কলকাতায় পৌঁছে গেছি। এক্ষুণি স্টেয়ার দেওয়া হবে। অনুগ্রহ করে এখানকার যাত্রীরা নামবার জন্য প্রস্তুত হোন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কয়েক ঘণ্টা আগেও সন্দীপরা ছিল করাচীতে, তার আগে পুরোনো পারস্যের আধুনিক নগর তেহেরান, তার আগে বেইরুট, তার আগে ভূমধ্য সাগরের ওপারে রোম, রোমের আগে বেলগ্রেড এবং তারও আগে জার্মান মুলুকে।

করাচী ছাড়বার পর বিমান-সেবিকারা মাঝে মাঝেই জানিয়ে দিচ্ছিল, আমাদের পরবর্তী স্টপেজ কলকাতা।

ফ্রাঙ্কফুর্ট-বেলগ্রেড-রোম-বেইরুট-তেহেরান-করাচী-কলকাতা।

কোথায় ওয়েস্ট জার্মানী আর কোথায় ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের এই অঙ্গরাজ্য বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশ বলা বোধ হয় ঠিক না; দেশটা কি আর আস্ত আছে! পশ্চিমবঙ্গ বলাই এখন উচিত।

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে কলকাতা। মাঝখানে পড়ে রয়েছে কয়েক হাজার মাইল। জার্মানী থেকে বাঙলা দেশের দূরত্ব কি শুধু মাইলের মাপে?

পাঁচশো বছরও পূর্ণ হয়নি ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। পালের নৌকোয় ইউরোপ থেকে কালিকটে পৌঁছতে তাঁর ক'মাস লেগেছিল? অথচ একালের গরুড় এই বোয়িংখানা চব্বিশ ঘণ্টায় জার্মানী থেকে কলকাতায় পৌঁছে গেল। মাত্র কয়েক শ' বছরে আধুনিক বিজ্ঞান সুদূর ইউরোপকে বাঙলা দেশের দোরগোড়ায় টেনে এনেছে।

ইউরোপ, এশিয়া, বোয়িং ৭০৭, ভাস্কো-ডা-গামা এসব কিছুই ভাবছিল না সন্দীপ। প্লেনের পেছন দিকের একটা সীটে বসে থাকতে থাকতে কলকাতার কথাই তার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

কলকাতা-কলকাতা-কলকাতা!

ক'বছর পর কলকাতায় ফিরল সে? সন্দীপ পরিষ্কার মনে করতে পারে, নাইনটিন

সিক্সটিতে এই দমদম থেকেই আকাশে উড়েছিল। আর এটা হ'ল নাইনটিন সেভেনটি। পাক্কা দশটি বছর পর ঘুড়ি আবার সুতোর টানে ফিরে এসেছে।

কলকাতা-কলকাতা-কলকাতা !

দশ বছর আগেও কলকাতার নামে সন্দীপের বুকের ভেতরটা ফুটন্ত দুধের মতো উথলে উঠতো। আর আজ ? সামান্য একটা ঢেউ খেলে গেল মাত্র। দেখা যাচ্ছে দশ বছরে আবেগ নামক বস্তুটির অনেকখানিই খোয়া গেছে।

এদিকে প্লেনের ঢাউস পেটের কাছে দরজা খুলে গেছে ; তার তলায় সিঁড়িও লাগানো হয়েছে।

সিঁড়ি দেবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা হুড়মুড় করে সেদিকে ছুটতে শুরু করেছে। কার আগে কে নামবে তার প্রতিযোগিতা চলছে। সন্দীপ চোখ কুঁচকে লক্ষ করল, ওরা প্রায় সবাই বঙ্গসন্তান। জেট প্লেনে লণ্ডন-প্যারী রোম-বার্লিন করে বেড়ালে কি হবে, সমস্ত বাঙালী জাতির মধ্যেই হয়তো একটা করে শ্যালদা স্টেশনের ডেলি প্যাসেঞ্জার লুকিয়ে রয়েছে।

এখানকার সব ক'টি যাত্রী নেমে যাবার পর সন্দীপ উঠল। বড় বড পা ফেলে সিঁড়িব মাথায় এসে হঠাৎ দাঁডিয়ে গেল।

মাসটা মে অর্থাৎ গরম কাল। বাঙলা ক্যালেণ্ডারে এটা কী মাস—বৈশাখ না আষাঢ, চট করে সন্দীপ মনে করতে পারল না। বাঙলা সাল তারিখের সঙ্গে পুরো দশটি বছর তার যোগাযোগ নেই।

বিকেল ফুরিয়ে আসছে। পশ্চিমের ঢালু পাড বেয়ে সূর্যটা লাল বলের মতো গড়াতে গড়াতে নেমে যাচ্ছে। আকাশ ঝকঝকে নীল ; পালিশ করা আয়নার মতো। কোথাও এক ফোঁটা কালো চোখে পড়ছে না। এমন উজ্জ্বল নীলাকাশ কত কাল পরে দেখল সন্দীপ !

দমদমকে ঘিরে শুধু গাছপালা, সবুজ বেষ্টনী—যাকে বলে গ্রীন বেল্ট। সূর্যটা যেখানে, তার ঠিক উল্টোদিকে আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ছিল। কী পাখি এত দূরে দাঁড়িয়ে চেনা যাচ্ছে না। কাছে গেলেও কি চিনতে পারত সন্দীপ ? এত কাল পরে এদেশের অনেক কিছুই তার অচেনা হয়ে গেছে। দক্ষিণ থেকে জোর হাওয়া দিচ্ছে—গরম কালের শেষবেলার হাওয়া। কিছু উষ্ণতা থাকলেও বেশ সুখদায়ক, এলোমেলো।

দশ বছর ইওরোপ বাসের ফলে বাঙলা দেশ সন্দীপের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। সে নিজেও প্রাণপণে এদেশকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। অনেক সময় এখানকার মানুষজন, পশুপাখি, ভৌগোলিক চেহারা, ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে রূপ-

বদল, এমন কি নিজের বাবা-মা-ভাই-বোনদের মুখ পর্যন্ত তার মনে পড়ত না। দীর্ঘ সময় দূরে থেকে এদেশকে ঘৃণা করতেই শিখেছে সে। তবু বাঙলা দেশের এই শেষবেলাটা মোটামুটি ভালোই লাগল। মুগ্ধ চোখে কয়েক পলক আকাশ দেখল সন্দীপ, লাল টুকটুকে সূর্য দেখল, পাখির ঝাঁক দেখল। তারপর সিঁড়ি টপকে টপকে নীচে নেমে এল।

নেমেই অবাক। সামনেই বিশাল ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনাল বিল্ডিং। ক'বছর আগে দমদম থেকে সন্দীপ যখন লুফৎহানসার প্লেন ধরেছিল, এই বাড়িটা ছিল না। আপনা থেকেই তার মাথা বাঁ দিকে ঘুরল। ঐ তো সেই পুরনো হতচ্ছাড়া চেহারার এয়ারপোর্ট বিল্ডিংটা। আবার সে তাকাল নতুন টার্মিনাল বিল্ডিংটার দিকে। এই ক'বছরে কলকাতার তা হ'লে কিছু উন্নতি হয়েছে।

টারম্যাক-দেওয়া রানওয়ে পেরিয়ে একটু পরেই টার্মিনাল বিল্ডিং-এর ভেতর ঢুকে পড়ল সন্দীপ। তারপর পাসপোর্ট আর ভিসা কাউন্টার ডিঙিয়ে এল কাস্টমসে। সন্দীপ আসবার আগেই তার লাগেজ কাস্টমস বেরিয়ারে পৌঁছে গিয়েছিল। লাগেজ আর কী, প্লাস্টিকের মস্ত এক স্যুটকেশ।

টেবিলের ওপার থেকে কাস্টমস অফিসার বললেন, 'এক্সকিউজ মী, আপনার স্যুটকেসটা একটু খুলতে হবে।'

সন্দীপ বলল, 'গ্ল্যাডলি'—পকেট থেকে চাবি বের করে নিজেই খুলে দিল সে। স্যুটকেশ তল্লাসী করতে গিয়ে একটা মজার ব্যাপার ঘটল।

অফিসারটির বেশ বয়েস হয়েছে; বাইরে থেকে দেখে মনে হয় কিঞ্চিত নীতি-বাগীশ ধরনের।

জিনিসপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে প্রথমে বেরুল ডজনখানেক ট্রাউজার আর শার্ট; তারপর একটা শৌখিন ট্রানজিস্টর সেট, ক্রমশ শেভিং বক্স, টুকিটাকি প্রসাধনের জিনিস, তারও পর এক বোতল স্কচ হুইস্কি। বোতলটা তুলেই তৎক্ষণাৎ নামিয়ে রাখলেন অফিসার।

হুইস্কি পর্যন্ত এক রকম ছিল। কিন্তু তারপরেই হাতে যা উঠল তাতে চোখে অন্ধকার দেখলেন ভদ্রলোক। গোছা গোছা ন্যুড ছবি তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কড়া রকমের 'শক' খাওয়ার মতো ছবিগুলো ফেলে ঝড়াং করে বাক্সের ডালা নামিয়ে দিলেন অফিসার। তিন পা পিছিয়ে বার দুই জিভ কাটলেন।

সন্দীপ মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছিল। আজকাল কি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট শুকদেব ধরে ধরে কাস্টমসে চালান দিচ্ছে?

সুস্থ হতে অফিসারের খানিক সময় লাগল। তারপর বাঁধা গৎ আওড়াবার

মতো করে বললেন, 'প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড ফর দা ট্রাবল্।'

সন্দীপ বলল, 'নট অ্যাট অল।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'বাট—'

'কিছু বলবেন?'

'ইয়েস—'

হঠাৎ সন্দীপের ইচ্ছে হ'ল অফিসারকে এক পাক চরকি ঘুরিয়ে দেয়। সে বলতে লাগল, 'ঐ স্যুটকেশটায় নেই এমন আরো কিছু আমি কিন্তু সঙ্গে করে এনেছি। সেগুলো আপনাদের আইনে আটকাবে না তো?'

'কী—কী এনেছেন?' অফিসারের চোখ তীক্ষ্ণ হ'ল।

'এই দেখুন না, ক'বছর আগে যখন জার্মানী যাই তখন আমি পারফেক্ট গুড বয়; সিগারেটের গন্ধ নাকে গেলে স্রেফ ভিরমি খেতাম। সেই সুশীল সুবোধ বালকটি আর নেই মশাই। আজকাল হুইস্কি না টানলে সন্ধের পর চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। মালটানার পাকা অভ্যাসটি আমার সঙ্গে রয়েছে। আর জার্মানীতে গিয়ে একটা দিনও বান্ধবী ছাড়া কাটাইনি; সেই অভ্যাসটাও আমি সঙ্গে করে এনেছি।'

অফিসার বললে, 'ইউ মে গো নাউ। আই হ্যাভ গট টু চেক আদার্স—'

'আর কী কী এনেছি শুনবেন না?'

অপ্রসন্ন মুখে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন অফিসার।

সন্দীপ মনে মনে একটা খিস্তি আউড়ে বলল, 'ব্যাটা ভাটপাড়ার ভট্‌চাযি্য!' বলেই টুক করে স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে বিস্তৃত লাউঞ্জের দিকে চলল।

যে কোম্পানির প্লেনে এসেছে, তাদের বাসেই চৌরঙ্গী পর্যন্ত যাওয়া যায়। কিন্তু বাড়িতে খবর দেওয়া আছে। কেউ যদি তাকে নিয়ে যাবার জন্য এসে থাকে? থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সন্দীপ। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকের লাউঞ্জ দেখতে লাগল। কিন্তু চেনা মুখ একটাও চোখে পড়ল না। তবে কি কেউ আসেনি?

সন্দীপ মনে মনে ভেবে নিল, টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বাইরেটা একবার দেখে নেবে। ভেতরে না ঢুকে বাবা, দাদা কি হারু যদি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে? ওদের কাউকে না পাওয়া গেলে বিমান কোম্পানির বাসেই সে শহরের মাঝখানে চলে যাবে। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে শহরতলীতে তাদের সেই বাড়ি।

বাড়ির কথা মনে পড়তেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল সন্দীপের। দেশে ফেরার আদৌ কোন ইচ্ছে তার ছিল না। বাড়ির নামে সন্দীপের প্রাণে বান ডাকে না। নেহাত মা মৃত্যুশয্যায়; বাবা বার বার টেলিগ্রাম করছিল। তাই এক মাসের

ছুটি নিয়ে এসেছে। পুরো একটা মাস এই নরককে কাটানো অসম্ভব; তার আগেই সে পালাবে। এবার গেলে, কেউ মরুক বাঁচুক, সে আর ফিরছে না। সন্দীপ ঠিক করে ফেলেছে, জার্মানীতেই স্থায়ীভাবে সেট্‌ল্‌ করবে।

টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বাইরে আসতেই পার্কিং বে চোখে পড়ল সন্দীপের। অনেকগুলো প্রাইভেট কার আর ট্যাক্সি ওখানে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে।

সন্দীপ একবার ডাইনে তাকাল, একবার বাঁয়ে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখতে পেল, সামনের রাস্তায় ওরা দাঁড়িয়ে আছে। এতকাল পরেও বাবাকে ঠিক ঠিক চেনা গেল। ওল্ড ফেলা হুবহু সেই রকমই রয়েছে। সেই টিপিক্যাল চেহারা, টিপিক্যাল পোশাক।

ছেলেবেলা থেকেই সন্দীপ দেখে এসেছে, বাবার গায়ে মাংসের চাইতে হাড় বেশি। চোকো মুখে গোল চোখ; চোখের তলায় শ্যাওলার মতো কালচে দাগ। গাল ভাঙা; কণ্ঠার হাড় গজালের মাথার মতো খাড়া হয়ে আছে। পাতলা চুল পাট করে মাথার ডান ধারে নামানো।

পরনে ধুতি আর ডবল-কাফ দেওয়া ফুল শার্ট। শার্টটা আবার ধুতির ভেতর গুঁজে দেওয়া, তার ওপর ময়লা সুতী কোট। সামনের দিকে কোঁচা ঝুলছে। হাঁটু পর্যন্ত কালো মোজা, পায়ে তালি মারা বুট জুতো। চোখে গোলাকার নিকেলের চশমা। মুখে তিন চারদিনের দাড়ি পিনের মতো ফুটে আছে।

ইংরেজ আমলে বাবা একটা ব্রিটিশ ফার্মে লেজার-কীপার ছিল। স্বাধীনতার পরেও তের বছর ওখানে কাজ করে রিটায়ার করেছে। সন্দীপ শুনেছে, বাবার ওপরওলা নতুন এক সাহেব খাস বিলেত থেকে এসে কড়া ফতোয়া জারী করেছিল প্যান্ট-কোট-স্যুট-বুট পরে অফিসে আসতে হবে। বাবা তার হাতে-পায়ে ধরে বলেছিল, 'আমি ভটচায্যি বামুনের সন্তান সাহেব, প্যান্ট পরা গুরুর বারণ।' সাহেব বলেছিল, 'তাহা হইলে নৌকরি ছাড়িয়া দাও।' বাবা বলেছিল, 'চাকরি ছাড়লে খাব কী? সগোষ্ঠী উপোস দিয়ে মরতে হবে।' অনেক দড়ি টানাটানির পর প্যান্টটা মুকুব হয়েছিল কিন্তু ধুতির সঙ্গে বুট আর কোট জুড়ে গিয়েছিল। সেই থেকেই নাকি উৎসবে ব্যসনে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে বাবাকে এই বেশে দেখা যায়।

বাবা যেন ব্যাকরণের অব্যয় পদটি। এক চেহারায় এক পোশাকে চিরকাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কোনরকম যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ নেই।

বাবাকে দেখতে দেখতে কপাল কুঁচকে যেতে লাগল সন্দীপের। এই লোকটা, দিস ওল্ড ম্যান, জার্মানী যাবার আগে কি বাগড়াটাই না দিয়েছিল। আরেকটু হলে যাওয়ার বারোটা বেজে যেত। নেহাত দাদা তাকে সাহায্য করেছিল তাই

যেতে পেরেছে। সারা বাড়িতে দাদাই একমাত্র মানুষ যাকে সে এখনও শ্রদ্ধা করে ; তার সম্বন্ধে মোটামুটি একটু কৃতজ্ঞতা সন্দীপের ক্ষুব্ধ ক্ষিপ্ত অসন্তুষ্ট মনে আজও আবছাভাবে থেকে গেছে।

বাবার ডান পাশে ঐ মেয়ে দুটো কে ? গৌরী আর রমা বলেই মনে হচ্ছে। দশ বছর আগে ওদের কতটুকু দেখে গিয়েছিল ! আর এখন ? প্রায় চেনাই যায় না। এত বড়ো হয়েছে তবু এখনও বাবা গৌরী আর রমার বিয়ে দ্যায়নি !

বাবার বাঁ দিকে তিন চারটে বাচ্চা। ওরা কারা ? তাদের পাশে ঐ বিধবা মহিলাটিই বা কে ? সন্দীপ চিনতে পারল না।

ওরা ছাড়া আর কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। দাদা, হারু আর পটলা তা হ'লে আসেনি। মা-ও আসেনি। অসুস্থ শরীর নিয়ে মা'র পক্ষে এত দূর আসা অবশ্য সম্ভব না।

দূরে দাঁড়িয়ে কয়েক পলক ওদের দেখল সন্দীপ। তারপর অন্যমনস্কের মতো এগিয়ে গেল। যথেষ্ট বিরক্তি সত্ত্বেও একটা কথা ভেবে তার খুব মজা লাগছিল। সে যেন ভি. আই. পি.। আর গৌরী রমা বাবা, ওরা সবাই যেন গার্ড অফ অনার দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে আসতেই বাবার গালের দু'পাশে ঢিলে কোঁচকানো চামড়া কাঁপতে লাগল। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠল খানিকটা। গোল চশমার ভেতর আটষট্টি বছরের পুরোনো ধূসর চোখ আবেগে ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। এবড়ো-খেবড়ো একটা হাত সন্দীপের কাঁধে রেখে আচ্ছন্ন অপরিষ্কার গলায় বলল, 'ভাল আছিস বাবা ?'

এই ন্যাস্টি নোংরা চেহারার লোকটা তার জন্মদাতা। বাবার মোটা মোটা গাঁটওলা আঙুলগুলো কাঁধের ওপর নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। সন্দীপ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কোন রকমে বলল, 'হ্যাঁ। তুমি ভাল আছ তো ?'

'আমার আর ভাল থাকাথাকি।' বাবার গলা বুজে আসতে লাগল, 'কী সুখে যে দিন কাটছে !'

সন্দীপ উত্তর দিল না। জ্ঞান হওয়া থেকে সে দেখে আসছে, বাবা কখনও কোন অবস্থাতেই সুখী না। সব সময় তার অভিযোগ, সব সময় কাঁদুনি। সারা দুনিয়া ঘুরেও এমন অসুখী মানুষ দ্বিতীয়টি দ্যাখেনি সন্দীপ।

হঠাৎ সন্দীপের মনে পড়ল, এই বাঙলা দেশে বিশ্রী একটা কাস্টম আছে। অনেকদিন পর বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা হলে প্রণাম করতে হয়। বাবার পায়ের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে কোমরের কাছে টান পড়ল।

সন্দীপের গায়ে নাইলনের ওপেন-ব্রেস্ট জ্যাকেট আর খুব টাইট লো-কাট আমেরিকান প্যাণ্ট। কোমরের কাছ থেকে প্যাণ্টটা চামড়ার সঙ্গে সেঁটে ক্রমশ সরু হয়ে পা পর্যন্ত নেমে এসেছে। আমেরিকা বাজারে এই এক জিনিস ছেড়েছে। ভূ-ভারতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে এই বস্তুটি চলছে না। এমন কি অ্যান্টি আমেরিকান স্লোগানে যেখানকার আকাশ ফেটে চৌচির হচ্ছে, তেমন অনেক জায়গায় এই প্যাণ্টটার জয়জয়কার।

কোনরকমে হাঁটু ভেঙে 'দ' হয়ে বাবার পা ছুঁল বটে সন্দীপ, কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারল না, এই বুড়ো লোকটা, দিস ওল্ড ফেলা, আরেকটু হলে জার্মানী যাওয়া ঘুচিয়ে দিয়েছিল।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই রমা আর গৌরী সন্দীপের পায়ে ঝুঁকে পড়ল। রমার বয়েস কুড়ির মতো, গৌরীর পঁচিশ। দুজনেই পূর্ণ যুবতী। কিন্তু দশ বছর আগে যেমন দেখে গেছে তার পর ওরা আর খুব বাড়েনি। এশিয়ার আণ্ডার-ডেভেলপ্‌ড্‌ ওভারপপুলেটেড দেশগুলোতে যা হয়ে থাকে; খাদ্য-টাদ্য নেই। কাজেই রমা আব গৌরীকে ঘিরে শুধু অপুষ্টি। ওদের শীর্ণ শুকনো মুখে, শিরবার-করা রেখাবহুল হাতে, কর্কশ চামড়ায় শরীরের 'বাড়' চিরকালের জন্য স্থগিত হয়ে আছে। একজন মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হ'লে কতটা 'ক্যালরি' যেন দরকার ? এই মুহূর্তে সন্দীপ মনে করতে পারল না।

দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল না, কাছে আসতে দেখা গেল, গৌরী আর রমার পরনে খুব খেলো ধরনের শাড়ি ; মোটা কাপড়ের ব্লাউজ। পায়ে সস্তা স্যাণ্ডেল। প্রণাম করে দু'জনে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের চোখে খানিক ভয়, খানিক বিস্ময়, খানিক কৌতূহল এবং অনেকখানি দূরত্ব।

গৌরী রমার পর বাচ্চাগুলো এসে টকাটক সন্দীপকে প্রণাম করল। কিছুটা বিব্রতভাবে সন্দীপ বাবার দিকে তাকাল, 'এরা ?' তার খুব ভয় হচ্ছিল, এই দশ বছরে বাবা হয়তো ভটচাযি্য বংশের জনবল আরো বাড়িয়ে ফেলেছে।

এমনিতেই সন্দীপরা দশ ভাইবোন। চার ভাই, ছয় বোন। দুই বোন অবশ্য মারা গেছে। সন্দীপের এক বন্ধু তাপস ছিল মহা হারামজাদা—রগড়ের গলায় একদিন বলেছিল, 'তোর বাবা করছে কি রে ! ওয়ান-টেন্‌থ অফ কুরুবংশ বানিয়ে ফেললে। এরপর সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে শালারা না খেয়ে মরবি। বাঁচতে হ'লে তোর বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে খোজা করে ফ্যাল।' সেদিন তাপসের সঙ্গে সন্দীপের মারামারি হয়ে গিয়েছিল।

বিষণ্ণভাবে বাবা মাথা নাড়ল, 'ওরা নেত্যর ছেলেমেয়ে।'

নেত্য অর্থাৎ দাদা। সন্দীপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাচ্চাগুলোকে দেখতে লাগল। রোগা অপুষ্ট শরীরে তাদের প্রয়োজনীয় আচ্ছাদনটুকু পর্যন্ত নেই। কারো ছেঁড়া ইজেরের ওপর ময়লা ফ্রক, কারো জ্যালজেলে বুশ সার্ট। প্রায় সবারই খালি পা।

দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন মাথা গরম হয়ে উঠল সন্দীপের; ভেতর থেকে অসহ্য উত্তাপ নাক-মুখের মধ্যে দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল। তার মনে হল, এ যেন ষড়যন্ত্র। টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বাইরে সারি সারি এই সমস্ত করুণ দৃশ্য সাজিয়ে রাখার মানে কী ?

বাবার গলা আবার শোনা গেল, 'তুই তো ওদের দেখিসনি, তাই চিনতে পারছিস না। তুই যাবার পর ওরা হয়েছে।'

নীরস গলায় সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'দাদাকে দেখছি না যে—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই আচমকা ওধারের সেই বিধবা মেয়েমানুষটি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুপিয়ে উঠল। মনে মনে একটা অকথ্য গালাগাল আউড়ে রুক্ষ স্বরে সন্দীপ বলল, 'কী হ'ল ?'

ভাঙা ভাঙা বসা গলায় বাবা উত্তর দিল, 'নেত্য নেই।'

সন্দীপ চমকে উঠল, 'নেই মানে ?'

'গেল বছর জানুয়ারি মাসে আত্মহত্যা করেছে।'

আত্মহত্যা ! সন্দীপের মোটা শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে হিম নামতে লাগল।

সামনের দিকে মাথাটা অল্প কাত করে বাবা বলল, 'হ্যাঁ। তোকে তো চিঠি লিখেছিলাম, পাসনি ?'

বাড়ি থেকে যত চিঠি যেত তাতে একটাই রঙ—শুধু অভাব আর দুঃখের কাঁদুনি। শেষ দিকে আর এয়ার লেটারগুলো খুলত না সন্দীপ। বাড়ির চিঠি দেখলেই কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলত। ছেঁড়া চিঠির টুকরোর মধ্যে দাদার মৃত্যু-সংবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ বিচিত্র এক অপরাধবোধ পাষাণভারের মতো সন্দীপের বুকে চেপে বসতে লাগল। দম বন্ধ করে অপরিষ্কার শিথিল গলায় সে বলল, 'কই না।'

'আশ্চর্য, পাওয়া তো উচিত ছিল।'

বিধবা মেয়েমানুষটি কাঁদছিলই। এতক্ষণ ভালো করে তাকে লক্ষ করেনি, এবার আচ্ছন্ন চোখে তার দিকে তাকাল সন্দীপ। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল—বৌদি। দাদার মৃত্যুতে কেউ ছেলে হারিয়েছে, কেউ ভাই, কিন্তু যে সব কিছু হারিয়েছে সে বৌদি, বৌদি তো কাঁদবেই।

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কান্নার শব্দ শুনল সন্দীপ। তারপর

অদ্ভুত এক ঘোরে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। বৌদির নাম মাধুরী ; তার একটা হাত ধরে সান্ত্বনা দেবার মতো করে বলল, 'কেঁদো না বৌদি।'

মাধুরী কিছু বলল না, শুধু তার কান্নাটা আরেকটু উচ্ছ্বসিত হ'ল।

সন্দীপের ঝট্ করে মনে পড়ে গেল, জার্মানী যাবার সময় খরচের টাকা যখন কম পড়ে যাচ্ছিল, এই বৌদি গা থেকে সব গয়না খুলে দিয়েছিল। সন্দীপ আবার বলল, 'কেঁদো না বৌদি, কেঁদো না।'

দুই

পশ্চিমের গড়ানে পাড় বেয়ে সূর্যটা আরো নেমে গেছে—ঘন গাছপালার তলায় ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে।

এই অবেলায় রোদের রঙ বাসি হলুদের মতো, তার তাপ ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসছে। লাটাইতে সুতো গুটানোর মতো শেষ বেলার রোদটুকু কেউ যেন খুব তাড়াতাড়ি টেনে নিচ্ছিল।

বাবা বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে ? এবার বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করতে হয়। চল্, বাস স্ট্যাণ্ডে যাই।'

কলকাতার বাস মানেই বিভীষিকা। সন্দীপ বলল, 'আমি এই বাসে চেপে যেতে পারব না।'

'তবে কিসে যাবি ?'

'ট্যাক্সিতে।'

মাধুরীর হাত ছেড়ে দিয়ে সন্দীপ একটা ট্যাক্সি ডেকে আনল। তারপর এতগুলো লোককে গুনে নিয়ে বলল, 'একটা ট্যাক্সিতে তো হবে না, আরেকটা ডাকি।'

বাবা ব্যস্তভাবে বলল, 'একটাতেই হবে। পয়সা খোলামকুচি নাকি, এঁ্যা ?' বলেই ট্যাক্সির দরজা খুলে গাদিয়ে গাদিয়ে সবাইকে ভরতে লাগল।

ট্যাক্সিটা পুরনো মডেলের একটা ফিয়েট। ছোট্ট গাড়ির ভেতর ঠাসাঠাসি ভিড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল সন্দীপের।

কাল রাত্তিরে বিমান-সেবিকাদের পটিয়ে প্রচুর শ্যাম্পেন খেয়েছিল সন্দীপ। সেই ঘোর নিয়েই আজ দমদমে নেমেছিল। তারপর বাবা আর তার বিপুল বাহিনীকে দেখে এবং দাদার আত্মহত্যার খবর শুনে নেশাটা অনেকখানি ছুটে গেছে। বাকিটা ছুটল ট্যাক্সিতে উঠে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিটা বাঁ দিকে ঘুরে নতুন একটা রাস্তায় পড়ল। মসৃণ ঝকঝকে রাজপথ। দু'পাশে গাছপালা, ফাঁকা মাঠ।

সন্দীপের মনে পড়ল দশ বছর আগে এই রাস্তাটা ছাখেনি। দমদমের ঘিঞ্জি বস্তির ভেতর দিয়ে সাপের মতো পাকানো পাকানো গলি পেরিয়ে এয়ারপোর্টে আসতে হয়েছিল সেদিন। ইণ্টারন্যাশনাল টার্মিনাল বিল্ডিং-এর পর এই নতুন রাস্তা। মনে হচ্ছে কলকাতার সত্যিই উন্নতি হয়েছে।

মাঝখানে বসে হাত-পা ঘাড়-মাথা কিছুই নাড়ানো যাচ্ছিল না। তারই মধ্যে বাইরের যতটুকু চোখে পড়ে দেখে নিচ্ছিল সন্দীপ। দেখতে দেখতে বলল, 'এই রাস্তাটা নতুন হয়েছে, না?'

বাবা সামনের সীটে দুই নাতিকে দুই উরুতে চাপিয়ে বসেছিল। বলল, 'হ্যাঁ। এই তো সেদিন এয়ারপোর্ট ট্রাফিকের জন্য খোলা হল—ভি. আই. পি. রোড।'

'ক্যালকাটার তা হলে বেশ ডেভালপমেণ্ট হয়েছে।'

'কোথায়। বিধানবাবু যেটুকু করে গিয়েছিলেন তারপর সব ধামাচাপা পড়ে আছে। এ শহরের আর কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

সন্দীপ উত্তর দিল না।

চাকার তলায় ঝকঝকে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ট্যাক্সি তীরের মতো ছুটছিল। এয়ারপোর্ট থেকে তারা কতদূর চলে এসেছে, সন্দীপ বুঝে উঠতে পারল না। যাই হোক, এই নতুন রাস্তাটা বা তার দু'ধারের দৃশ্য তাকে খুব বেশিক্ষণ অবাক করে রাখতে পারল না। ঘুরে ফিরে আবার দাদার কথা মনে পড়ে গেল।

বাইরে চোখ রেখে সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'দাদা হঠাৎ আত্মহত্যা করল কেন?'

মুখ ফিরিয়ে জড়ানো গলায় বাবা বলল, 'সে কথা এখন থাক। বাড়ি যখন এসেছিস সবই জানতে পারবি।'

পেছনের সীটের ও-মাথায় বসে ছিল বৌদি। চট্ করে একবার তার মুখটা দেখে নিল সন্দীপ। খানিক আগেও বৌদি খুব কাঁদছিল ; এখন একেবারে চুপ। তার উদাস চোখ পলকহীন, স্থির। শুধু গালের ওপর চোখের জলের দাগ শুকিয়ে রয়েছে।

বেশিক্ষণ বৌদির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সন্দীপ। মুখ ফেরাতেই আবার বাবার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল না, তবু নিজের অজান্তেই সে ফস করে বলে ফেলল, 'হারু আজকাল কী করছে?'

'ঘোড়ার ঘাস কাটছে।'

সন্দীপ এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আর পটলা?'

বাবার নাক-মুখ কুঁচকে যেতে লাগল, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, 'পটলা হাজতে।'

'হাজতে কেন?'

'পেটো ছুঁড়ে একজনকে জখম করেছে, তাই।'

সবিস্ময়ে সন্দীপ শুধাল, 'পেটো কী?'

'বোমা।'

বোমার নাম পেটো! পটলা পেটো ছুঁড়ে লোক জখম করেছে!

ঝাঁঝালো গলায় বাবা আবার বলল, 'হারামজাদা দুটো আমার হাড় একেবারে সেঁকে দিলে।'

সন্দীপ চুপ করে রইল। বাবা মুখ ঘুরিয়ে কাচের জানালার ভেতর দিয়ে আবার সামনের রাস্তায় তাকাল।

কিছুক্ষণ দূরমনস্কের মতো বসে থেকে ডাইনে ঘাড় ফেরাতেই সন্দীপ দেখতে পেল, গৌরী আর রমা তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতেই ওরা তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিল। সন্দীপের একবার ইচ্ছে হ'ল জিজ্ঞেস করে, ওরা এখন কী করছে। পড়াশোনা অথবা অন্য কিছু। বিয়ে যে হয়নি, সাদা সিঁথি দেখে তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থমকে গেল সন্দীপ। দাদা, হারু বা পটলার মতো বিপজ্জনক কিছু হয়তো ওদের সম্বন্ধেও বেরিয়ে পড়বে।

দাদা আর তার মাঝখানে দুই দিদি রয়েছে। তাদের সম্পর্কেও কৌতূহল হচ্ছিল সন্দীপের, কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে সে উৎসাহ বোধ করল না।

ভি. আই. পি. রোড পেছনে ফেলে ট্যাক্সি একসময় ডাইনে ঘুরল, তারপর রেল ব্রিজের তলা দিয়ে সেই আজন্মের চেনা পুরোনো কলকাতায়।

সূর্যটাকে এখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শেষ বেলার আলোটুকুও আর নেই। জলে কালি গুলবার মতো আকাশে আবছা আবছা অন্ধকার মিশতে শুরু করছে।

রাস্তার দু'ধারের দৃশ্য এখন বদলে গেছে। সেই সবুজ ঘাস, বিশাল ফাঁকা মাঠ, দূর দিগন্তে আমগাছ কিংবা আকাশ-সাঁতার-ক্লান্ত পাখি, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটু আগে সন্দীপরা যে রাস্তা দিয়ে এসেছে সেটা যেন সত্যি না—কোন অলৌকিক কল্পনার ভেতর দিয়ে পথটা ছুটে গেছে।

দু'ধারে এখন কাঁচা নর্দমা, দুর্গন্ধ, ভনভনে মাছি, নিশ্চল ঢেউয়ের মতো বস্তির পর বস্তি, খোলার চালার তলায় দীন চেহারার দোকান-পাট। এখানে ওখানে স্তূপীকৃত আবর্জনা উঁচু হয়ে আছে। নাইনটিন সিক্সটিতে এই আবর্জনাই দেখে গিয়েছিল, দশ বছর পরও সেগুলো সেইভাবেই পড়ে আছে। সুরেন ব্যানার্জী রোডে কলকাতা কর্পোরেশনের সেই প্রকাণ্ড লাল বাড়িটা কি এখনও আছে, না নীলামে বিক্রি হয়ে গেছে?

দু'পাশে যা-ই থাক, রাস্তাটার অবস্থা আরো ভয়াবহ। মাঝে মাঝেই খানা-খন্দ, বড়ো বড়ো গর্ত। ট্যাক্সিটা কখনও ডাইনে গিয়ে কখনও বাঁয়ে ঘুরে গর্ত বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এগুচ্ছিল। শুধু কি গর্ত—রিক্সা-ঠেলা-লরী-টেম্পো সব ডেলা পাকিয়ে তার পথ আটকাচ্ছিল। টাক্সিওলা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সমানে খিস্তি দিচ্ছিল, 'এ শালে শুয়ারকা বাচ্চা।'

এতক্ষণে কলকাতা তার নিজের স্বরূপে দেখা দিয়েছে।

দশ বছর কলকাতায় নেই সন্দীপ; জন্মভূমির এই শহরকে প্রাণপণে ভুলতেই চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু সাধ্য কি ভুলে যায়। জার্মান টেলিভিশনে প্রতি সপ্তাহে ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে একটা করে ইভেণ্ট থাকত। সেই ইভেণ্টের বেশির ভাগ জুড়ে থাকত কলকাতা। কলকাতার ভিখিরি, কলকাতার ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, কলকাতার আবর্জনা, কলকাতার হকার, কলকাতার বস্তি, কলকাতার মিছিল, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বোমাবাজি, কলকাতার বেশ্যা, সব মিলিয়ে অসহনীয় এই নগর হাজার কয়েক মাইল দূরে জার্মান টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে উঠে সন্দীপের চোখে যেন ছুঁচ ফোটাতে থাকত। অশান্ত উত্তেজিত ক্ষুধার্ত কুৎসিত কলকাতাকে সে ঘৃণা করে, নিদারুণ ঘৃণা।

ট্যাক্সিটা মানিকতলা পার হয়ে বিবেকানন্দ রোড ধরে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে এসে পড়ল। এই রাস্তাটা যেন কলকাতার মেরুদণ্ড। হ্যারিসন রোড আর বউ-বাজারে ট্রাফিক সিগনাল দু'বার পথ আটকালেও চৌরঙ্গী পর্যন্ত মোটামুটি ভালই এল সন্দীপরা। ইতিমধ্যে রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে, উঁচু উঁচু বাড়ির মাথায় নানারঙের নিয়নগুলো একবার জ্বলছে, একবার নিভছে।

ছেলেবেলায় প্রথম যেদিন বাবার হাত ধরে রাতের চৌরঙ্গীতে এসেছিল, সেদিন চারদিকের ঝলমলে আলো-টালো দেখে চোখের তারা কপালে উঠে গিয়েছিল সন্দীপের। দশ বছর পর দেশে ফিরে আজ মনে হচ্ছে কলকাতা কত [illegible], কত মলিন, কত টিমটিমে।

[illegible]পোর্ট থেকে তবু এতটা রাস্তা আসা গেছে কিন্তু চৌরঙ্গীর বেড়া টপকানো



গেল না। সামনের দিকে গাড়ির পর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দূর থেকে স্লোগান ভেসে আসছিল, 'আমাদের দাবী—'

'মানতে হবে।'

'ইনকিলাব—'

'জিন্দাবাদ।'

সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

সামনে চোখ রেখেই ট্যাক্সিওলা জবাব দিল, 'মিছিল সাব। আজ মনুমেণ্টকা গোদমে মীটিং থা। মালুম হোথা কিম্বা মীটিং খতম হো চুকা। আভি মিছিল করকে আদমীলোগ যা রহা।'

একটু ভেবে সন্দীপ বলল, 'কতক্ষণ ট্রাফিক আটকে থাকবে?'

'যব তক মিছিল চলেগি।'

জার্মানী থেকে সবে কলকাতায় পা দিয়েছে। অসীম বিরক্তিতে সন্দীপ উচ্চারণ করল, 'হেল, লাইফ ইজ হেল হিয়ার।'

মিছিল চলেছে তো চলেছেই। মে মাসের অসহ্য গরমে ফিয়েট গাড়ির এইটুকুন খোলে গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে গলগল করে ঘামছিল সন্দীপ। শার্ট ট্রাউজার ভিজে সপসপে হয়ে উঠছে। ঘামের সঙ্গে কতটা সল্ট বেরিয়ে গেল কে জানে। যত ঘামছিল ততই রেগে যাচ্ছিল সন্দীপ। ঐ লোকটা সামান্য ক'টা টাকার জন্য আরেকটা ট্যাক্সি করতে দিল না। এ দেশের লোকের আশ্চর্য মেণ্টালিটি! খরচের ভয়ে আরাম-টারাম করতে চায় না। কত কষ্ট করে বাঁচা যায় তারই একটা প্রতিযোগিতা যেন এখানে চলছে।

মিছিল পার হয়ে রাস্তা পরিষ্কার হতে দেড়টি ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর হুস করে চৌরঙ্গীর জমকালো আলোকোজ্জ্বল অংশটুকু পেরিয়ে যেতে দশ মিনিটও লাগল না। আরো এক ঘণ্টা পর কলকাতা কর্পোরেশনের সীমানা পেছনে ফেলে মিউনিসিপ্যালিটির অন্ধকার ভাঙাচোরা খোয়া-ওঠা রাস্তায় লাট খেতে খেতে শহরতলীর অন্ধকূপে সন্দীপরা তাদের বাড়িতে পৌঁছে গেল।

সরু গলির ওধারে মিউনিসিপ্যালিটির চল্লিশ পাওয়ারের বাল্বটা মিটমিটিয়ে জ্বলছিল। জানলার বাইরে উঁকি মেরে নিচু পাঁচিলের ওপারে তাদের একতলা বাড়িটা এক পলক দেখে নিল সন্দীপ।

দশ বছর আগের মতোই একদিকে হেলে আছে বাড়িটা। আস্তর খসে খসে ভেতরের ইট তখনই বেরিয়ে পড়েছিল। সেই ইঁটে এখন নোনা ধরেছে। কতকাল যে কলি ফেরানো হয়নি! দেয়ালের গা বেয়ে বেয়ে বর্ষার পর বর্ষা যে জল ঝরেছে

তার কাল্‌চে স্থায়ী দাগ লেগে রয়েছে। সদর দরজাটা যে রকম বিপজ্জনক ভাবে ঝুঁকে আছে তাতে যে কোনদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। তার একধারে ছাই গাদা, আরেক ধারে মাছের আঁশ, কাঁটা, তরকারির খোসা এবং হাজার রকম আবর্জনা পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে।

এই বাড়িটা নাকি ঠাকুরদার বাবা, শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে প্রপিতামহ, করে গিয়েছিল। তারপর উত্তরাধিকার সূত্রে ঠাকুরদা এখানে বাস করেছে, ঠাকুরদার পর বাবা। পঁয়ত্রিশ বছর আগে একদা এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিল সন্দীপ। কিন্তু এতকাল পরে জন্মস্থানের দিকে তাকিয়ে তার প্রাণে আনন্দের বান ডাকল না। বরং অদ্ভুত এক বিতৃষ্ণায় মন ভরে যেতে লাগল।

ট্যাক্সির দরজা খুলে বাবাই প্রথম নামল, নেমেই হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, 'আলো, শিগ্‌গির দরজা খোল্‌, আমরা এসে গেছি। বাইরের লাইটটা জেলে দে।' বাবার পর একে একে গৌরী, রমা, বৌদি এবং তার বাচ্চারা নামতে লাগল। সবার শেষে নামল সন্দীপ।

রাস্তার ওধারে ভাঙা একফালি রকে ক'টা ছেলে বসেছিল। ষোল থেকে কুড়ির ভেতর বয়েস। পরনে ড্রেন পাইপ প্যাণ্ট আর বুশ শার্ট, পায়ে চটি, কোমরে বেল্ট। সব ক'টা ছেলেরই চোয়াড়ে মুখ, ভাঙা গাল, চোখের কোণে কালি, মোটা জুলপি, স্বাস্থ্য বলতে কিচ্ছু নেই।

সন্দীপ কাউকেই চিনতে পারল না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও দশ বছর আগের চেনা মুখগুলোর ভেতর থেকে এদের খুঁজে বার করা গেল না। হয়তো তখন ওরা ছোট ছিল, দশ বছরে চেহারা-টেহারা বদলে গেছে। কিংবা সে জার্মানী যাবার পর ওরা এ-পাড়ায় এসেছে।

সন্দীপকে দেখে ছেলেগুলো উঠে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, 'হেরোর দাদা রে।'

'হ্যাঁ। আমেরিকা থেকে এল।'

'ধুস, আমেরিকা না। জার্মান।'

একটা ছোকরা আর সবার থেকে একটু দূরে পা ফাঁক করে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল, কায়দা করে গালের ফাঁক দিয়ে সে বলল, 'জার্মান কা হীরো।'

তার পাশের ছোকরাটা বলল, 'হীরো দেখছি, হীরো-ইন কোথায়?'

'হীরো-ইন আবার কে?'

'হেরোর বৌদি রে, মেমসাহেব বৌদি।'

'হেরোর দাদা বিয়ে করেছে নাকি?'

'কে জানে। হেরো তো সেদিন বলছিল, ওর দাদা দশ বচ্ছর জার্মানে আছে। এ্যাদ্দিন কি আর ব্রহ্মচারী হয়ে ছিল? একটা ফাদার-ইন-ল নিশ্চয়ই জুটিয়ে নিয়েছে।'

হঠাৎ ওধার থেকে আরেকটা ছোকরা জিভের ডগায় চুকচুক আওয়াজ করে বলল, 'ব্রহ্মচারী বইটা দেখেছিস? শাম্মীকাপুর যা করেছে মাইরি—গুরু, গুরু।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে আরেকজন ধমকে উঠল, 'লাও ঠ্যালা, হচ্ছে হেরোর দাদার কথা; ও শ্লা তার ভেতর শাম্মীকাপুরকে পুরে দিলে!'

সেই পা ফাঁক-করা ছোকরাটা চোখের তারায় বারকতক চরকি ঘুরিয়ে বলল, 'ওখানে বিয়ে করতে হয় না, এমনিতেই জুটে যায়।'

'জুটে যায় তুই জানলি কি করে? জার্মান গিয়েছিলি নাকি? শ্লা ধর্মতলার ওপারে ছেড়ে দিলে তো চিনে বাড়ি আসতে পারবি না।'

একটা খিস্তি দিয়ে পা ফাঁক-করা ছেলেটা পাশের ছোকরার চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে চুম্ খাবার মতো শব্দ করল, 'লে বাবা, না গেলে বুঝি জানা যায় না? জন্মাবার সময় কানদুটো নিয়ে আসিনি? না সে-দুটো মায়ের পেটে রেখে এসেছি? বুঝলে চাঁদ, সব খবরই এই কানে আসে।'

একটা ছোকরা বলল, 'হেরোর দাদার চেহারাটা দেখেছিস?

আরেকটা ছোকরা উত্তর দিল, 'যেন টমেটো মাইরি।'

'হবে না! মাল টেনে টেনে—'

ওরা গলা নামিয়ে কথা বলছিল। সন্দীপ কিন্তু সবই শুনতে পাচ্ছিল। তার মোটামুটি মজাও লাগছিল, আবার রাগও হচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল, একেকটাকে ধরে পাছায় লথি কষিয়ে ছায়। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। বার দুই ছোকরাগুলো হারুর নাম করেছে। নিশ্চয়ই ওরা হারুর বন্ধু-টন্ধু হবে। হারুটাও কি তা হলে ওদেরই মতো হয়ে উঠেছে?

আরেকটা ব্যাপার ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিল সন্দীপ—দশ বছর আগে ঐ বয়েসের ছেলে-ছোকরারা ঠিক এভাবে কথা বলত না। বয়স্কদের মোটামুটি তারা মেনে চলত, সমীহ করত। তা ছাড়া যে ভাষায় যে ইডিয়মে এই ছোকরাগুলো কথা বলছে, সন্দীপের কাছে সে-সব একান্তই অপরিচিত এবং বিস্ময়করও। নাঃ, দশ বছরে কলকাতা অনেক বদলে গেছে।

এদিকে সদর দরজা খুলে গিয়েছিল। চৌকাঠের ওপারে বড়দিকে দেখা গেল। বড়দির নাম আলো। বাবা সন্দীপের দিকে ফিরল। সম্মানিত বিদেশী অতিথিকে স্বাগত জানাবার ভঙ্গিতে বলল, 'আয়, ভেতরে চল্।'

উত্তর না দিয়ে সন্দীপ সবার আগে বাড়ি ঢুকল। ঢুকতেই আলো তার একটা হাত ধরে সস্নেহ করুণ গলায় বলল, 'এতদিন পর বাড়ির কথা মনে পড়ল ভাই।' তার কণ্ঠস্বর আবেগে বুজে এল ; চোখ দুটো কেমন যেন ঝাপসা দেখাচ্ছে।

আলোর বয়েস চল্লিশের ওপর। একসময় ভারি সুন্দর ছিল বড়দি। টুকটুকে রঙ, ভাসা-ভাসা বড়ো চোখ, পাতলা ঠোঁট, রাজহাঁসের মতন গ্রীবা, কোঁচকানো কোঁচকানো চুল, সুশ্রী গড়ন। রাস্তায় বেরুলেই ছেলেরা পেছনে লাগত। এক বছর কলেজেও পড়েছিল বড়দি। ক্লাসে ঢুকে ছোকরা প্রফেসাররা তার দিকেই তাকিয়ে থাকত। একজন প্রেমপত্রও লিখেছিল।

সেই বড়দিকে আজ আর চেনা যায় না। চোখ গর্তে ঢুকে গেছে, গায়ের রঙ জ্বলে কাল্‌চে। হাতের নীল নীল শিরাগুলো চামড়ার তলা থেকে ঠেলে উঠেছে। কণ্ঠা গাল আর কাঁধের হাড় স্পষ্ট দেখা যায়। গাল ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে। চুল উঠে উঠে কপালটা বড়ো হয়ে গেছে, ফাঁকা মাঠের মতো দেখায়। সিঁথির ওপর সিঁদুরের শুকনো দাগ।

পরনে লাল-পাড় ময়লা শাড়ি আর মোটা কাপড়ের ছেঁড়া জামা। হাতে সধবার চিহ্ন দু'গাছি শাঁখা ছাড়া ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই। বড়দির এমন দুঃখিনী চেহারা আগে আর কখনও দ্যাখেনি সন্দীপ।

আলো আবার বলল, 'তুই আসবি বলে কতকাল আমরা পথের দিকে তাকিয়ে আছি।' বলতে বলতে তার চোখের তারা জলে ডুবে যেতে লাগল।

কান্নাকাটি ভাল লাগে না সন্দীপের। মনে মনে যদিও বিরক্ত, তবুও সে বলল, 'কেঁদো না বড়দি, কেঁদো না।'

পেছন থেকে বাবা তাড়া দিল, 'রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখবি নাকি, এই আলো?'

আলো ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চল্‌ ভাই—'

বাইরের লাইটটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে বাড়ির সামনের দিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সদর পেরুলেই প্রথমে বাগান। বাগান আর কি, কিছু মানকচু, পেয়ারা আর জামরুল গাছ চোখে পড়ে। ফাঁকে ফাঁকে টগর, সন্ধ্যামালতী বেল আর শিউলি। দরকারী গাছের চাইতে আগাছা আর চীনাঘাসই বেশি।

গাছপালার ভেতর দিয়ে সন্দীপরা সামনের বড়ো রকে এসে উঠল। রকটা আর আস্ত নেই—চারদিক ভেঙেচুরে গেছে। ফাটলের মুখ দিয়ে অশ্বত্থের চারা মাথা তুলেছে। কে জানে তলায় তলায় তাদের শেকড় পঞ্চমবাহিনীর মতো বাড়িটার ধ্বংসের কাজ কতখানি এগিয়ে রেখেছে!

রকটাকে ঘিরে উত্তর-দক্ষিণে পর পর পাঁচখানা ঘর। সন্দীপ মনে করতে

পারল, দক্ষিণের শেষ ঘরখানায় দশ বছর আগে সে থাকত। তার পাশের ঘরটা ছিল দাদা-বৌদির, তার পরেরটা মা-বাবার। বাকি ঘরগুলোতে কারা থাকত, এতকাল পর আর মনে নেই। সে চলে যাবার পর তার ঘরটা কে দখল করেছে, কে জানে।

হঠাৎ উত্তর দিকের একটা ঘর থেকে দুর্বল করুণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আলো —'

সন্দীপ চিনতে পারল, মায়ের গলা। এয়ারপোর্ট থেকে এতটা পথ এসেছে, এই প্রথম মায়ের কথা তার মনে পড়ল। অথচ মাকে দেখবার জন্যই পুরো দশটি বছর পরে তার দেশে ফিরে আসা। আশ্চর্য, সেই মাকেই সে এতক্ষণ ভুলে ছিল!

আলো সাড়া দিল, 'কী বলছ মা?'

'ওরা ফিরেছে?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র।'

'আমার ঘরে নিয়ে আয়।'

সন্দীপ মাকে দেখতে পাচ্ছে না। তবু গলা শুনে মনে হ'ল, তাকে দেখবার জন্য মা অত্যন্ত ব্যাকুল। সন্দীপ বলল, 'চল বড়দি, আগে মা'র কাছে যাই।'

উত্তরের ঘরে এসে দেখা গেল, পুরোনো আমলের প্রকাণ্ড ভারী খাট প্রায় সমস্ত ঘর জুড়ে রয়েছে। ফাঁকা জায়গা নেই বললেই হয়। যেটুকুও বা আছে, হাঁড়ি-কুড়ি বাক্স-প্যাঁটরায় বোঝাই।

খাটের ওপর কোনো এক কালে জাজিম-টাজিম ছিল; এখন ওসবের বালাই নেই। কাঁথার পর কাঁথা আর ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা তোষক সাজিয়ে বিছানা পাতা হয়েছে। বালিশগুলো কবে বানানো হয়েছিল কে বলবে। ওয়াড়-টোয়াড় নেই, খোলের কাপড় মাথার তেলে আর ময়লায় চিটচিটে হয়ে আছে। খাটের ছত্রি ভেঙেচুরে কবেই লোপাট হয়ে গেছে।

খাটের মাঝমধ্যিখানে মা শুয়ে ছিল। এই নাকি তার মা! সন্দীপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল একটা কঙ্কাল ছাড়া মায়ের দেহে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু চোখ দুটোই যা কিছু উজ্জ্বল আর মাঠের মাঝখানে সূর্যোদয়ের মতো কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ; সিঁথি থেকে মাথার মাঝামাঝি পর্যন্ত সিঁদুরের লম্বা টান। জ্ঞান হবার পর থেকেই মাকে ঐভাবে সিঁদুর পরতে দেখেছে সন্দীপ।

মা-ও তাকিয়ে ছিল। ছেলেকে দেখতে দেখতে তার রক্তশূন্য শীর্ণ মুখে কত যে ঢেউ খেলে যেতে লাগল! চোখের পাতা আর ঠোঁট ভীষণ কাঁপছিল।

এক সময় হাতের ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইল মা, আর তখনই সন্দীপ তাড়াতাড়ি খাটের দিকে ছুটে গেল, 'উঠো না মা, উঠো না।'

মা বলল, 'তুই আমার কাছে বোস বাবা।'

খাটের একধারে মায়ের কাছে বসল সন্দীপ। বাবা বড়দি বৌদি গৌরী রমারা চারদিকে ইতস্তত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মা একদৃষ্টে তাকিয়েই ছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যেন দেখছিল, দশ বছর আগে দমদম থেকে যে আকাশে উড়েছিল, সে-ই ফিরে এসেছে কিনা। কিংবা তার কতটুকু ফিরেছে আর কতটুকুই বা সুদূর বিদেশে থেকে গেছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুর্বল হাত তুলে মা সন্দীপের মাথায় রাখল। কাঁপা গলায় বলল, 'ভাল ছিলি তো বাবা ?'

সন্দীপ মাথা নাড়ল, অর্থাৎ ভালই ছিল।

'ওখান থেকে কবে রওনা হয়েছিলি ?'

'কাল দুপুরে।'

'এখানে এসে পেঁাছেছিস কখন ?'

'আজ বিকেলে।'

'মোটে একদিনের রাস্তা, তবু দশ বছর পর তোর আসার সময় হ'ল।'

মায়ের কণ্ঠস্বরে অনুযোগ ছিল, ক্ষোভ ছিল, অভিমান ছিল। সন্দীপ উত্তর দিল না। কেমন এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

একটু নীরবতা। তারপর হঠাৎ সন্দীপের মনে পড়ে গেল, মা-ই তার খোঁজখবর নিচ্ছে অথচ মায়ের সম্বন্ধে একটা কথাও এখন পর্যন্ত সে জিজ্ঞেস করেনি। সন্দীপ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোমার কী হয়েছে মা ?'

মা বুকের ওপর একটা আঙুল রেখে বলল, 'এইখানটায় বড্ড জালা।'

বাবা ওধার থেকে বলে উঠল, 'ছ'মাস বিছানায় পড়ে আছে। কিছুই খেতে পারে না, খেলেও পেটে রাখতে পারে না। বমি হয়ে যায়।'

সন্দীপ শুধাল, 'ডাক্তার কী বলছে ?'

'প্রথম দিকে কিছুই ধরতে পারছিল না, এখন অবশ্য সন্দেহ করছে।'

'কী ?'

বিব্রতভাবে মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে বাবা বলল, 'না, মানে ব্যাপারটা ঠিক স্পষ্ট না। আরো ভাল করে এগজামিন করে নিক। তারপর—'

মা হাসতে লাগল, 'অত লুকোচুরির কী আছে। ডাক্তার যা সন্দেহ করছে, আমি জানি। তুমি আমার সামনেই বলতে পার।'

বাবা তবু ইতস্তত করতে লাগল।

মা এবার খুব সহজ উদ্বেগহীন স্বরে বলল, 'তোমার বলতে যখন আটকাচ্ছে তখন আমিই বলি। আমার ক্যান্সার হয়েছে।'

বাবা প্রবল বেগে দুই হাত আর মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'তোমায় বলেছে, ক্যান্সার হয়েছে! এখনও রিপোর্ট পাওয়া গেল না—'

বাবার কথা গ্রাহ্যও করল না মা। আপন মনে বলে যেতে লাগল, 'আমি আর বাঁচব না রে। মরবার আগে তোকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছিল, তাই তোকে জোর করে বাড়ি ফিরিয়ে আনলাম—তুই রাগ করিসনি তো বাবা?'

সন্দীপ বুকের ভেতর কোথায় যেন ধাক্কা খেল। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। রুদ্ধ গলায় বলল, 'কি যা-তা বলছ মা! তুমি ঠিক সেরে উঠবে।'

মা হাসল; উত্তর দিল না।

সন্দীপ আবার কী বলতে যাচ্ছিল, মা বাধা দিয়ে বলল, 'এখন আর কোনো কথা না। রাস্তায় কত ধকল গেছে। এখন খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়। হ্যাঁ রে চান করবি তো?'

সন্দীপ ঘাড় কাত করল, 'জামা-প্যাণ্ট ঘামে চটচট করছে; চান না করলে ঘুমোতেই পারব না।'

মা এবার বড়দির দিকে তাকাল, 'আলো ওকে নিয়ে যা। দক্ষিণের ঘরে ওর বিছানা-টিছানা করে রেখেছিস তো?'

আলো বলল, 'রেখেছি।'

'সেই ফর্সা নীল চাদরটা পেতে দিয়েছিস?'

'দিয়েছি।'

'ভগবান আমাকে মেরে রেখেছে। এতদিন পর ছেলেটা এল, কোথায় তাকে নিজের হাতে খেতে দেব, বিছানা পেতে দেব, তা না। শুয়েই থাকতে হচ্ছে। যা বাবা, আলোর সঙ্গে যা—'

আরো কিছুক্ষণ মায়ের কাছে বসবার ইচ্ছা ছিল সন্দীপের। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে উঠে পড়ল।

বড়দির সঙ্গে দক্ষিণের ঘরে গিয়ে সন্দীপ দেখল, একধারে তক্তপোষের ওপর ধবধবে বিছানা পাতা রয়েছে। মাথার দিকে সস্তাদামের টেবিলে আয়না চিরুনি পাউডার তেল আর স্নো'র একটা কৌটো। টেবিলটার সামনে খানদুই চেয়ার। দেয়াল আর মেঝের জায়গায় জায়গায় ছাল উঠে গেলেও ঘরটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। সন্দীপ এসে থাকবে বলেই হয়তো চেয়ার-টেবিল স্নো-পাউডারের এই পরিপাটি আয়োজন।

তিন

দক্ষিণের ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে স্নান করতে গেল সন্দীপ। ঝুপসি বাগানের এক কোণে পুরোনো ভাঙা শ্যাওলা-ধরা কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে সস্তাদামের ইণ্ডিয়ান সাবান মেখে স্নান করতে করতে গা ঘিন ঘিন করতে লাগল তার। তবু তাকে মনে মনে স্বীকার করতে হ'ল কুয়োর জলটা ভারি ঠাণ্ডা আর মে মাসের এই অসহ্য গরমে ভারি আরামদায়ক। যত জল ঢালছিল ততই গা জুড়িয়ে যাচ্ছিল।

রক থেকে বাবা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'অনেক দিন অভ্যেস নেই, অত জল ঢালিসনি পচা—ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

সারা দুনিয়া যে চষে বেড়িয়েছে সেই পঁয়ত্রিশ বছরের ঘাঘী ছেলের জন্য বাবার এই দুর্ভাবনাটুকু মোটামুটি মন্দ লাগল না সন্দীপের। পাক্কা দশটি বছর এ-জাতীয় স্নেহস্পর্শের বাইরে ছিল সে। কিন্তু 'পচা' শব্দটা খচ করে কানের ভেতর বিঁধে গেল। তার ডাকনাম 'পচা'ই।

নামের ব্যাপারে একটা কথা মনে পড়ে গেল সন্দীপের। বাবার নাম ব্রজগোপাল—, ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য। নিজের নাম অক্ষয় করে রাখবার জন্য ছেলেদের নামের সঙ্গে একটা করে গোপাল জুড়ে দিয়েছিল বাবা। বংশ তালিকাটি এইভাবে তৈরি হয়েছিল। দাদার নাম নিত্যগোপাল, সন্দীপের আদি নাম নাড়ুগোপাল, হারুর শিশুগোপাল, পটলার ননীগোপাল।

কে যেন লিখে গিয়েছিল, নামে কিবা আসে যায়। তার নামটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না সন্দীপ। তার বয়েস যখন পনেরো, ক্লাস নাইনে পড়ছে, সেই সময় দিব্যদৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। ক্লাসের ছেলেরা কথায় কথায় ছুঁচোর মতো মুখ করে ভ্যাঙচাত, 'বাবা নাড়ুগোপাল, এখানে কেন? মায়ের কোলে বসে থাক না।' তুঘলক বংশ কি খিলজি ডাইন্যাস্টির ঠিকুজি-কুলুজি ঠিকমত বলতে না পারলে ইতিহাসের টিচার সতীকান্তবাবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলত, 'যার নাম নাড়ুগোপাল তার আর কত দূর হবে? মাথায় তোর ষাঁড়ের গোবর। যা যা, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে নাড়ু হাতে করে থাক গে যা।' কোন কথা একবারে বুঝতে না পারলে পাড়ার ছেলেরা বলত, 'তুই বুঝবি কি করে! তোর নাম যে নাড়ুগোপাল। কী নাম, আহা রে—', বলে জিভের ডগায় চুকচুক শব্দ করত।

তখনই সন্দীপ টের পেয়েছিল, নামে যথেষ্টই আসে যায়। আর বুঝতে

পেরেছিল, এই নাড়ুগোপাল নামটা তাকে খুব বেশিদূর এগুতে দেবে না। ক্লাস টেনে উঠেই কোর্টে এফিডেভিট করে নাম বদলে নিয়েছিল সন্দীপ।

এই নাম বদল নিয়ে বাড়িতে কম হুলস্থূল হয়েছে! বাবা, দ্যাট ওল্ড ম্যান, বংশধারা-বিরোধী আধুনিক নাম নেবার জন্য সন্দীপকে প্রায় ত্যাজ্যপুত্র করতে চেয়েছিল। বলেছিল, 'ঐ রকম কাপ্তানী নাম নিয়ে আমার বাড়িতে থাকা চলবে না।'

ঘাড় গোঁজ করে সন্দীপ বলেছিল, 'ঐসব নাড়ুগোপাল ফাড়ুগোপাল চলে না।'

'চলে না! নামটা খারাপ কিসে? ঠাকুর-দেবতার নাম।' একটু থেমে ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির লেজার-কীপার ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, 'চলে না তো আমাদের চলছে কী করে? কায়দা শিখছ? হারামজাদা বদমাইস, জুতিয়ে তোমার কায়দা ছাড়িয়ে দেব।' মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'এই ছেলের পছন্দ-অপছন্দ এখনই এত টনটনে। আরেকটু বড়ো হলে হাড় ভাজা-ভাজা করে দেবে।'

সন্দীপ ঘাড় নোয়ায়নি; নামের জন্য মেরুদণ্ড সোজা রেখে বাবার সঙ্গে তুমুল লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। এবং পিতৃদত্ত পুরোনো নাম খারিজ করে আইনের সাহায্যে পাওয়া নতুন নামটাকে সগৌরবে নিজের সঙ্গে জুড়ে রেখেছিল।

স্নান-টান সেরে দক্ষিণের ঘরে এসে জামা-প্যাণ্ট বদলে সন্দীপ সবে চুলে চিরুনি দিয়েছে, বড়দি এসে দরজায় দাঁড়াল। বলল, 'খাবি চল্—'

'এক্ষুণি?' সন্দীপ ঘুরে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ। আসন পেতে ফেলেছি। ভাত-তরকারি গরম আছে। গরম গরম না খেলে ভাল লাগবে না।'

চুলের ভেতর বারকয়েক দ্রুত চিরুনি টেনে সন্দীপ বলল, 'চল—'

আলোর পিছু পিছু মাঝখানের একটা ঘরে এল সন্দীপ। মেঝেতে ফুলকাটা প্রকাণ্ড আসন—এত বড়ো যে তিন জন একসঙ্গে বসতে পারে। তার সামনে বি াট কাঁসার থালায় গোল করে ভাত সাজানো, ভাতের চারধারে নানা রকমের ভাজা-টাজা, থালাটাকে ঘিরে অনেকগুলো স্টেনলেস স্টীলের বাটি।

ঘরের দু'পাশে দুটো তক্তপোষ। একটা তক্তপোষে বাবা আর দাদার ছেলেমেয়েরা বসে আছে। রমা গৌরী আর বৌদি দরজার কাছে।

একটু ইতস্তত করে সন্দীপ বলল, 'আমি একাই বসব নাকি? আর সবাই?'

'আর সবাই পরে বসবে। তুই আগে খেয়ে নে—' বাবা বলল।

সন্দীপ আর কিছু বলল না। ঝুপ করে আসনে বসে পড়ল।

কত কাল পরে যে আসনে বসে হাত দিয়ে মেখে কাঁসার থালায় ভাত খাচ্ছে

সন্দীপ। জার্মানীতে থাকতে পনের কুড়ি দিনের বেশি সে ভাত খায়নি। তা ছাড়া টেবল্‌-চেয়ারে বসে কাঁটা-চামচ দিয়ে খাদ্য তুলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরো দশটি বছর পরে হাত দিয়ে খেতে তার অসুবিধা হতে লাগল। আনাড়ীর মতো গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে সন্দীপ বিরক্তও হচ্ছিল, আবার কিছুটা মজাও লাগছিল।

তক্তপোষের ওপর থেকে বাবা হাঁক-ডাক চেঁচামেচি করে বড়দিকে সমানে বলে যাচ্ছিল, 'পচাকে আর দু'খানা মাছভাজা দে, আর চাট্টি ভাত, এঁচড়ের তরকারি আরেক বাটি দে—'

বাবার ফরমাশ মতো আলো সন্দীপের পাত বোঝাই করে ফেলতে লাগল। সন্দীপ দু'হাত নেড়ে বিব্রতভাবে বলতে লাগল, 'আর দিও না বড়দি। এত কি মানুষ খেতে পারে!' কিন্তু তার কথা কানেই তুলল না আলো।

খাওয়া যখন আধাআধি হয়ে এসেছে সেইসময় দেয়াল ধরে ধরে মা এ-ঘরে চলে এল। এটুকু আসতে মা দারুণ হাঁপাচ্ছিল। বৌদি তাড়াতাড়ি মাকে ধরে তক্তপোষে শুইয়ে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

সন্দীপ বলল, 'ও কি মা, তুমি আবার দুর্বল শরীর নিয়ে এ-ঘরে উঠে এলে কেন?' বাবাও মায়ের উঠে আসা নিয়ে রাগারাগি করতে লাগল।

মা হাসল। সন্দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এতকাল পরে তুই এলি। প্রথম দিন তোর খাওয়ার কাছে একটু বসব না?'

সন্দীপ আর কিছু বলল না, চুপ করে খেয়ে যেতে লাগল।

তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে মা বলতে লাগল, 'কতকাল পরে তুই বাড়ির ভাত খাচ্ছিস! ও কি, মোচার ঘণ্টটা ফেলে রাখলি কেন? ঐ মাছ দু'খানা খেতেই হবে। পটলের ডালনাটা তো ছুঁসইনি! পটল ভালবাসিস বলে আড়াই টাকা করে কিলো কিনে এনেছে। এ-বছর এই প্রথম বাজারে পটল উঠেছে; কী দাম!'

দশ বছর জার্মান রান্না খেয়ে বাড়ির রান্নার স্বাদ একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সন্দীপ। বহুদিনের অনভ্যস্ত জিভে এই সব বড়িভাজা, মোচার ঘণ্ট, পটলের ডালনা, পোনামাছের ঝোল বেশ ভালই লাগছে, তবে বড্ড ঝাল।

খেতে খেতে হঠাৎ বাঁ-ধারে তাকাল সন্দীপ। বাবার পাশ থেকে দাদার বাচ্চাগুলো লুব্ধ ক্ষুধার্ত চোখে পলকহীন তারই দিকে চেয়ে আছে। ছেলে-মেয়েগুলো যেন কতকাল খায়নি! পাত থেকে ভাত তুলে মুখে দেওয়া পর্যন্ত হাতের প্রতিটি মুদ্রা ওরা লক্ষ করছে। সন্দীপের মনে হতে লাগল, ওদের চোখের তারাগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ পর দরজার দিকে মুখ ফেরাল সন্দীপ। বৌদি রমা আর গৌরীও তার খাওয়া লক্ষ্য করছিল। ওদের চোখও লোভী।

চারদিক দেখতে দেখতে মনে মনে ভীষণ রাগ হতে লাগল সন্দীপের। সারা ঘরে দুর্ভিক্ষের চেহারা সাজিয়ে রেখে তার মধ্যে তাকে খেতে দেবার মানে কী? রাগটা কিছু শান্ত হলে সন্দীপ একবার ভাবল, দাদার ছেলেমেয়েগুলোকে ডেকে পাতের চারধারে বসিয়ে দ্যায়। কিন্তু পরক্ষণেই শূকরের ছানার মতো ওদের জুলজুলে চোখ, নোংরা গা হাত-পা, ভাঙা-ভাঙা নখ, হলদে দাঁত ইত্যাদির কথা ভেবে তার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। সন্দীপ ভাবল, ওদের ডাকবে না। পাতে ভাত-তরকারি মাছ-ডাল ফেলে রেখে যাবে। পরে ওরা খাবে।

মা বলতে লাগল, 'দশ বছর পর জার্মান থেকে এলি—কই চেহারা তো তেমন সারেনি।'

সন্দীপ বলল, 'কী বলছ! দু স্টোন ওজন বেড়ে গেছে—'

'ওজন বেড়েছে না ছাই। আমি তো দেখছি অনেক রোগা হয়ে গেছিস। তা হ্যাঁ রে, ওখানে ভাল খাবার-টাবার পাওয়া যায় তো?'

সন্দীপের ভারি মজা লাগল। রগড়ের গলায় সে বলল, 'তুমি কি মনে কর জার্মানী এই ইণ্ডিয়ার মতো দুর্ভিক্ষের দেশ। সেখানে কত যে খাবার তুমি চিন্তাই করতে পারবে না।'

মা কিছুটা অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'খাবার না হয় অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু তুই পেট ভরে খেতিস তো? সামনে বসে কেউ না খাওয়ালে তো তোর পেট ভরতো না কোনদিন।'

সন্দীপ উত্তর দিল না, শুধু হাসল। মনে মনে ভাবল, দশ বছর আগের ধারণা নিয়ে মা বসে আছে। এর মধ্যে তার ছেলেটি যে কতখানি বদলে গেছে, মা আর কেমন করে জানবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সন্দীপ। আলোর দিকে ফিরে অল্প হেসে বলল, 'আমি দেশে ফিরব বলে তুমি বুঝি আগে-ভাগে বাপের বাড়ি এসে বসে আছ?'

আলো চুপ করে রইল। ওধারের তক্তপোষ থেকে মা বলল, 'বছর তিনেক হ'ল আলো এখানে এসে আছে।'

'তিন বছর!' বলেই সন্দীপ লক্ষ করল, আলোর চোখ নিচের দিকে নামানো। সমস্ত মুখখানা গাঢ় বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেছে।

সন্দীপের কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে

সে বলল, 'জামাইবাবু কেমন আছে ?'

কেউ জবাব দিল না। হঠাৎ অদ্ভুত এক নীরবতা এখানে নেমে এসেছে। ঘরের সব ক'টা মানুষের ওপর দিয়ে একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে গেল সন্দীপ। রমা-গৌরী-বৌদি-মা, দাদার বাচ্চাগুলো—সবার মুখ কঠিন, ঠোঁট শক্তবদ্ধ, চোখের মণিগুলো ঝিকিঝিকি জ্বলছে। শুধু বাবার চোয়াল ভীষণভাবে নড়ছিল; দুই ঠোঁট অসহ্য কোন আক্রোশে থরথর করছিল।

জামাইবাবুর কথা তুলতে হঠাৎ এরকম প্রতিক্রিয়া হ'ল কেন, কে জানে। কিছুটা তীক্ষ্ণ স্বরে সন্দীপ বলল, 'তোমরা চুপচাপ কেন ? জামাইবাবুর কথা জিজ্ঞেস করলাম, কেউ উত্তর দিচ্ছ না যে ?'

বাবা আচমকা চিৎকার করে উঠল, 'আমি যদি এক বাপের ছেলে হই শালা শুয়ারের বাচ্চাকে দেখে নেব।'

বাবার চেঁচামেচির মধ্যেই মা আর আলো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সন্দীপ হকচকিয়ে গিয়েছিল। বিমূঢ়ের মতো সে বলল, 'কী হ'ল ?'

উত্তেজনায় বাবা লাফ দিয়ে তক্তপোষ থেকে নিচে নেমে পড়ল। পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলল, 'জানিস সেই হারামজাদা গু-খেকোর ব্যাটা কী করেছে ? ঐ যে খানকির ছেলে, যার সঙ্গে আলোর বিয়ে দিয়েছিলাম। সেই বজ্জাত বেজন্মা আলোকে ডাইভোর্স করে আবার একটা বিয়ে করেছে।'

নাঃ, কলকাতায় পা দিয়ে সন্দীপ যার সম্বন্ধেই কিছু জিজ্ঞেস করছে, যেখানেই হাত দিচ্ছে, সেখান থেকেই একটা করে সাপ বেরিয়ে পড়ছে। আলোর কথা শুনতে শুনতে তার হাড়ের ভেতর ভয়ানক ধাক্কা লাগল যেন।

সন্দীপ রুক্ষ গলায় জানতে চাইল, 'কবে ডাইভোর্স করেছে ?'

'বছর দুই হ'ল।'

একটু ভেবে সন্দীপ শুধালো, 'হঠাৎ ডাইভোর্স হ'ল কেন ?'

বাবা বলতে লাগল, 'বদমাইস খচ্চরের—'

কথা শেষ হল না। তার আগেই ধরা-ধরা ভাঙা গলায় আলো বলল, 'থাক বাবা, ওসব কথা থাক।'

মা-ও ওধারের তক্তপোষ থেকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে উঠল, 'এতদিন পর ছেলেটা এল। দু'দিন থাকলে সবই তো জানতে পারবে। প্রথম দিনেই খারাপ খবর দিয়ে মন খারাপ করে দেওয়া কেন ?'

যা জানবার মোটামুটি জানা হয়ে গেছে। বিরক্তি, রাগ এবং তিক্ততায় মেজাজ যথেষ্ট বিগড়ে গেছে সন্দীপের।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তার পরেই হঠাৎ দাদার কথা মনে পড়ে গেল সন্দীপের। এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় বাবা জানিয়েছিল, দাদা আত্মহত্যা করেছে। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই যেন সন্দীপ এবার জিজ্ঞেস করল, 'বড়দির কথা তো শুনলাম। এখন দাদার কথা বল—'

বাবা কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়ল। জামাইবাবুর কথায় যতখানি উত্তেজনা আর হাত-পা ছোঁড়া দেখা গিয়েছিল, দাদার প্রসঙ্গ উঠতেই সে-সব বন্ধ হয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, 'পরে শুনিস।'

'তখনও তো বললে পরে শুনতে। পরে না, এখনই বল।'

মা আর বৌদি এবার কেঁদে উঠল। গৌরী রমা আর আলোর চোখও ভেজা ভেজা। তবে তারা শব্দ করে কাঁদছে না।

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে শেষ চেষ্টা করল বাবা, 'সে-সব শুনলে তোর ভাল লাগবে না পচা।'

সন্দীপের কেমন যেন জেদ চেপে গেল। মেজাজ যা খারাপ হবার তা তো হয়েই গেছে। খারাপের যদি কিছু বাকি থাকে, একদিনেই হয়ে যাক। একগুঁয়ে গোঁয়ারের মতো সে বলল, 'ভাল লাগুক, খারাপ লাগুক, তুমি বল।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বিমর্ষ মুখে বাবা বলল, 'নেত্যর অনেক ধার ছিল ; প্রায় হাজার চারেক টাকার মতো। সুদে-আসলে ফুলে-ফেঁপে সেই টাকা আট হাজারে দাঁড়িয়েছিল। পাওনাদাররা শাসাচ্ছিল, টাকা না পেলে কোর্টে যাবে। অপমান তো করছিলই। কেউ কেউ আবার গুণ্ডাও লাগিয়েছিল। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাবে নেত্য যে শোধ করবে—'

'ধার করেছিল কেন ?'

একটু চুপ করে থেকে জোরে শ্বাস টানার মতন শব্দ করে বাবা বলল, 'তোর জন্যে।'

'মানে—' সন্দীপ ভীষণভাবে চমকে উঠল, 'আ-আমার জন্যে ?'

'হ্যাঁ—' বাবার সরু গলা নড়ে উঠল। মাথা একদিকে হেলিয়ে দম বন্ধ করে সে বলতে লাগল, 'তুই যখন জার্মান গেলি তখন তো কারো হাতে টাকা ছিল না। নেত্য ধার-ধোর করে তোকে দিলে। সেই টাকা—'

সন্দীপ আর কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। তার মাথার ভেতরটা দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। জার্মানীতে তাদের কারখানায় একদিন ডিউটির সময় বারো টনের প্রকাণ্ড একটা ক্রেন ছিঁড়ে একজন শ্রমিকের মাথায় পড়েছিল। পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছিল সন্দীপ। এই মুহূর্তে বাবার কথা শুনতে শুনতে

মনে হতে লাগল সেই ক্রেনটার মতো ভারী এবং মারাত্মক কিছু তার মাথাটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। শরীরের শিরা-স্নায়ু-পেশী, সব যেন আলগা হয়ে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেতে লাগল। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগল সন্দীপ।

অনেকক্ষণ পর খানিকটা সুস্থ হলে কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল সন্দীপের। সজ্ঞানে না, খুব যন্ত্রণাদায়ক সম্মোহের ঘোরে সে সময়ের উজান ঠেলে পেছনে হাঁটতে লাগল।

সন্দীপের মনে পড়ল, দশটি ভাইবোনের মধ্যে সে ছিল একেবারে আলাদা। অন্য ভাইবোনরা যখন ছেঁড়া ইজের আর ময়লা জামা পরে দিন কাটিয়ে দিত তখন ইস্তিরি-করা হাফ প্যাণ্ট আর শার্ট ছাড়া চলত না সন্দীপের। সকাল-বিকেল অন্য ভাইবোনরা হাসিমুখে যখন শুকনো মুড়ি চিবোতো তখন পাঁউরুটি-মাখন-কলা-টলা না হলে তার জলখাবারই হ'ত না। দাদা, দুই দিদি, হারু-টারুরা, নিজেরাই যা পারত পড়ত ; ওদের চেঁচামেচিতে বাড়িতে হাট বসে যেত যেন। সন্দীপের জন্য কিন্তু প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয়েছিল। তার থাকবার জন্য, পড়বার জন্য আলাদা একখানা ঘর ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

সন্দীপের পেছনে এত পয়সা ঢালার ইচ্ছা বাবার একেবারেই ছিল না। এত খরচ করতে হচ্ছে বলে বাবা তাকে পছন্দ করত না। ভুরু-টুরু কুঁচকে ভ্যাংচানোর মতো করে প্রায়ই বলত, 'বাবু হে, ভুল করে তুমি আমার ঘরে এসে পড়েছ। আগা খাঁ প্যালেসে তোমার জন্মানো উচিত ছিল।'

সন্দীপ উত্তর দিত না।

কোন কোন দিন বাবা বলত, 'তুমি দেখছি এ সংসারের গুরুঠাকুর। আমার আর সব ছেলেমেয়ে বানের জলে ভেসে এসেছে। লবাবনন্দন, এ সব চলবে না।'

সন্দীপ এবারও নিরুত্তর।

বাবা বলতে থাকত, 'তোর কি চোখের চামড়া নেই রে পচা? নিজেরটা ছাড়া আর কোনোদিকে তোর নজর নেই। ভাইবোনগুলো কী খাচ্ছে কী পরছে, একবারও সেদিকে তাকিয়ে দেখিস না। তোর হাতীর খরচ আমি আর টানতে পারব না, পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। আরামে থাকবার যখন এতই ইচ্ছে তখন একটা পয়সাওলা বাপ যোগাড় করলেই পারতিস।'

মোদ্দা কথাটা হ'ল, সেই ছেলে বয়েস থেকেই সন্দীপ পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপরও। অন্যে কী খেল, কী পরল, সে দিকে ফিরেও তাকাত না। নিজেরটা ষোল আনার ওপর আঠার আনা বুঝে নিতে পারলেই খুশী।

তবে একটা ব্যাপারে কেউ তার খুঁত ধরতে পারত না। লেখাপড়ার প্রথম দিকে মাঝারি ছিল সন্দীপ। তারপর যত উঁচু ক্লাসে উঠছিল ততই উজ্জ্বল হচ্ছিল। ক্লাস নাইনে উঠবার পর কোন পরীক্ষাতেই সন্দীপ আর সেকেণ্ড হয়নি। বাবার মেজাজ ভাল থাকলে মাঝে মাঝে মাকে বলত, 'পচাটারই যা একটু লেখাপড়া হবে। আর সবগুলোর মাথায় গোবর ঠাসা। ওদের স্কুলে পাঠিয়ে পয়সার ছাদ্দ করছি।'

মনে পড়ে তার ঠিক তিন বছর আগে কম্পার্টমেণ্টালে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল দাদা। রেজাল্ট বেরুবার পর দাদা নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'কি করে যে পাশ করলাম ভগবানই জানে। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে একবারই ছিঁড়েছে—আর না বাবা। কলেজে পড়ালে নির্ঘাত ফেল মারব।'

বাবা দাদাকে বলেছিল, 'আমার পক্ষে আর পড়া চালানো সম্ভবও না। ম্যাট্রিকের বৈতরণীটা যখন পার হয়েছ তখন আমার পেছনে দাঁড়াও। আরেকজন কেউ রোজগার-পত্তর না করলে এই রাবণের সংসার চালাতে পারব না।'

বাবাই দাদার চাকরির জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল। প্রথমে নিজের অফিসে ঢোকাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আগের স্বর্গরাজ্য আর ছিল না। আগে আগে সেই ইংরেজ আমলে বড়ো সাহেবদের হাতে-পায়ে ধরলে ছেলে-ভাগনে কি জামাইয়ের চাকরি হয়ে যেত। কোনরকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করে আসতে পারলেই হ'ল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর চাকরির বাজার ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ভাল রেজাল্ট না করতে পারলে চাকরির আশা নেহাতই দুরাশা। দাদার মতো কম্পার্টমেণ্টালে পাশ-করা ছেলের পক্ষে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি যোগাড় করা অকল্পনীয় ব্যাপার। বাবার অফিসে দু-দু'বার পরীক্ষা দিয়ে ডাহা ফেল করে গিয়েছিল দাদা। শেষ পর্যন্ত বাবা শহরতলীর এই এলাকায় মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যানকে ধরে, প্রায় মাস ছয়েক তাঁর বাড়ি হাঁটাহাঁটি করে মিউনিসিপ্যাল অফিসে কেরানীর একটা চাকরিতে দাদাকে ঢোকাতে পেরেছিল। মাইনে এক শো চার টাকা বাইশ পয়সা; বছর বছর পাঁচ টাকা করে বেড়ে দু'শ সাতাশ টাকায় শেষ। দাদা কিন্তু তাতেই খুশী। চাকরি পাবার পর দিনই পান আর সিগারেট ধরেছিল। বেলা সাড়ে ন'টার সময় ভাত খেয়ে মোড়ের দোকান থেকে এক খিলি পান মুখে পুরে একটা সিগারেট ধরিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে যেত দাদা।

দাদা যেবার চাকরি পেল সেবারই মেজদি রেখার বিয়ে হয়েছিল। আলোর বিয়ে হয়েছিল তার অনেক আগে।

সন্দীপের মনে আছে, দাদার তিন বছর পর ম্যাট্রিক পাশ করেছিল সে। ফার্স্ট

ডিভিসন আর তিনটে লেটার পেয়েছিল।

বাড়ির সবগুলো লোকের মধ্যে দাদাই তাকে সবচাইতে বেশি ভালবাসত। রেজাল্ট বেরুবার পর হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছিল সে। ছুটে গিয়ে দুটো ইলিশ মাছ আর আড়াই সের মাংস কিনে এনেছিল। দিদিদের জামাইবাবুদের এবং ক'জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিয়েছিল। সারা বাড়ি জুড়ে সেদিন যেন উৎসব।

বাবাও কম খুশী হয়নি। লুঙ্গিটি পরে, একটা বিড়ি নিয়ে রান্নাঘরের সামনে উবু হয়ে বসে মাকে বলেছিল, 'পচাটা বংশের মুখোজ্জ্বল করল।'

উৎসবের রেশ রইল সপ্তাখানেক। তারপর একদিন রাত্রিবেলা সবাই যখন খেতে বসেছে সেই সময় বাবা বোমা ফাটানোর মতো করে কথাটা বলেছিল, 'এত ভাল রেজাল্ট করেছিস পচা, তোকে আরো পড়ানো উচিত। কিন্তু সংসারের অবস্থা তো জানিস। কিছুতেই আর চলতে চাইছে না।'

সন্দীপ উত্তর দ্যায়নি। কিছু একটা আন্দাজ করে তার চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছিল।

বাবা আবার বলেছিল, 'আমাদের অফিসে শিগগিরই ক'টা ভ্যাকান্সি হচ্ছে। নেত্যটা তো দু-বার পরীক্ষা দিয়ে ফেল করল। তুই বসলেই পাশ করবি। এত-দিনের ব্রিটিশ ফার্ম—একবার ঢুকতে পারলে তিন শ' টাকা স্ট্যার্টিং পাবি।'

সন্দীপের উচ্চাশা আকাশ-সমান। তিন শ' টাকার স্ট্যার্টিং তাকে লুব্ধ বা চমৎকৃত করতে পারেনি। বরং বাবার কথা শুনতে শুনতে তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। পাতের ওপর হাতটা থমকে গিয়েছিল। আধফোটা নীরস গলায় সে বলেছিল, 'না'।

বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী না?'

'আমি এখন চাকরি করব না। পড়ব।'

বাবা এবার বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, 'চাকরি-বাকরির অবস্থা খুব খারাপ। আমাদের অফিসে এ-বছর লোক নিচ্ছে। তারপর আবার কবে নেবে ঠিক-ঠিকানা নেই। এই সুযোগটা হাতছাড়া করা কাজের কথা নয়। হারু, পটলা, গৌরী, সবাই বড়ো হয়ে উঠছে। ওদের খাওয়ার খরচা, পড়ার খরচা, জামা-কাপড়ের খরচা দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। আর বাজারখানা কী পড়েছে!'

সন্দীপ চুপ করে ছিল। একটু দম নিয়ে বাবা আবার বলেছিল, 'আর দু'বছর আমার চাকরি আছে। তারপরেই তো রিটায়ার। রিটায়ার করার পর সংসার চলবে কি করে? নেত্যর যা মাইনে তাতে এত লোক টানতে পারবে না। এখন যদি তুই চাকরিতে না ঢুকিস সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে।'

সন্দীপ এবারও নিরুত্তর। ঘাড় গোঁজ করে নিঃশব্দে বসেছিল সে।

বাবা আবার বলেছিল, 'কী হ'ল, আমার কথা কানে ঢুকছে ?'

সন্দীপ সেই কথাটা আরেক বার বলেছিল, 'আমি চাকরি করব না, পড়ব।'

বাবা এবার স্বমূর্তি ধরেছিল, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'পড়ব ! পড়ে আমার চিতেয় মঠ তুলবে ! পড়াশোনা যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের ঘরে এর চাইতে বেশি দরকার নেই। যা বলছি ভালয় ভালয় কর, নইলে আমার ঘরে জায়গা হবে না। এই সাফ বলে রাখলাম।'

এই সময় দাদা বলে উঠেছিল, 'আহা, পচা যখন পড়তে চাইছে তখন পড়ুক না। এত ভাল রেজাল্ট করবার পর না পড়তে পেলে সত্যি মন দমে যায়।'

বাবা তীক্ষ্ণ গলায় শুধিয়েছিল, 'পড়বে তো, কিন্তু খরচা চালাবে কে ?'

'সে একরকম করে চলে যাবে।'

'না, ও রকম ভাসা-ভাসা জবাবে চলবে না। কোত্থেকে চলবে, পরিষ্কার করে বল।'

দাদা ঝোঁকের মাথায় বলেছিল, 'আমি চালাব।'

বাবা হাল ছাড়ার মতো করে বলেছিল, 'চালাতে পারলে চালাও, আমার আপত্তি নেই। সংসার গোল্লায় যাক। একটা কথা বলে রাখছি, মনে রেখো। চাকরির এই সুযোগ ছেড়ে দিলে পরে পচাকে কাঁদতে হবে।'

মনে পড়ছে, দাদাই তাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিল। তারপর একে একে সায়েন্স নিয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে সন্দীপ, কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বি. এস-সি. পাস করেছে।

কলেজে যে চারটে বছর কেটেছিল তার ভেতর সন্দীপদের পরিবারে ছোটবড়ো কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে। ছোট বোন মীনা তিন দিনের জ্বরে দুম করে মারা গেছে। দাদার বিয়ে হয়েছে। বৌদি এসে মীনার শূন্য স্থান পূরণ করেছে।

বাবা রিটায়ার করবার পর সংসারের অবস্থা দ্রুত খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটি বাবদ যে ক'টা টাকা পাওয়া গিয়েছিল ভবিষ্যতের কথা ভেবে তা খুব চেপে চেপে খরচ করতে হচ্ছিল। বাবার সব আক্রোশ তখন এসে পড়েছিল সন্দীপের ওপর। দিনরাত সে চেঁচাতো, 'পড়ছেন ! পড়ে পড়ে বিদ্যেসাগর হবেন। হারামজাদা বদমাশ।'

সন্দীপ বাবার গজগজানি কানে তোলেনি। কোনদিনই বাবার কোনো কথা সে গ্রাহ্য করত না।

বি. এস-সি. পাস করবার পর আরো পড়বার ইচ্ছা ছিল সন্দীপের, পড়তও

হয়তো। কিন্তু হঠাৎ ওয়েস্ট জার্মানীর একটা স্কলারশিপ জুটে গিয়েছিল। 'প্যাসেজ মানি'র ওপর আরো কিছু টাকা পেলেই জার্মানী চলে যাওয়া যায়। সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কয়েক বছর পড়তে পারা যাবে। বছরখানেক পড়ার পর ওরাই কোন কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিসশিপ যোগাড় করে দেবে। বাড়িতে স্কলারশিপের খবর এলে তুলকালাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাবা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল, 'কিছুতেই না। কভী নেহী, জার্মান-ফার্মান যাওয়া চলবে না।'

সন্দীপ ঠাণ্ডা মাথায় বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। আর মাত্র ক'টা বছর। বিদেশ থেকে একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী জোটাতে পারলে বড়ো চাকরি পাওয়া যাবে। তাতে সংসারের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। ইত্যাদি—

বাবা ঘাড় বাঁকিয়ে রেখেছিল 'ওসব বড়ো বড়ো কথা থাক। অনেক টাকা তোমার পেছনে ঢালা হয়েছে। এবার একটা চাকরি-বাকরিতে ঢোক। আমার অফিসে এ-বছর কিছু লোকজন নেবে। সেখানেই চেষ্টা কর।'

সন্দীপের পেছনে ছেলেবেলা থেকে যে টাকা লগ্নী করা হয়েছে সেটা সুদে আসলে আদায় না করা পর্যন্ত বাবার যেন ঘুম হচ্ছিল না।

সন্দীপ বলেছিল, 'জার্মানী আমি যাবই।'

'যাবি তো, এই সংসার দেখবে কে?'

রুক্ষ নিষ্ঠুর গলায় সন্দীপ বলেছিল, 'এ সংসার আমার না। যে এত বড়ো সংসার করেছে সে দেখবে।

দুঃখে অভিমানে রাগে বাবার গলা এবার কাঁপতে শুরু করেছিল, 'কী বললি?'

তখন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না সন্দীপের। লজ্জা, সঙ্কোচ, বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক, সব কিছু ঝেড়ে ফেলে একগুঁয়ে গোঁয়ারের মতো উগ্র গলায় সে বলেছিল, 'যা বলেছি তা তো শুনেছই।'

'এত বড়ো কথা তোর! এ সংসারে তোর কোন দায়দায়িত্ব নেই? এই জন্যই খাইয়ে পরিয়ে তোকে মানুষ করেছিলাম!'

'মানুষ করতে, খাওয়াতে-পরাতে তুমি বাধ্য।'

'কেন, কেন বাধ্য?'

'নিজেই ভেবে দেখ।'

এরপর বাবা কথা বন্ধ করে দিয়েছিল। মা এবং ভাইবোনেরা কান্নাকাটি শুরু করেছিল। সমস্ত বাড়িটায় তখন এক অস্বাভাবিক দমবন্ধ অবস্থা। তার মধ্যেই বাবার সঙ্গে অদ্ভুত এক যুদ্ধ চলছিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। সন্দীপের ঘাড় বাঁকানো গেল না। সে যে জেদ ধরেছিল জার্মানী যাবে, সেখান থেকে কেউ তাকে ফেরাতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত দাদাই বলেছিল, 'বেশ, তোর যখন এতই ইচ্ছে তখন জার্মানী যাবি।'

বাবা তীব্র কটু গলায় বলেছিল, 'যাবে তো, কিন্তু কিভাবে? টাকা কোথায়?'

'তার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'কোত্থেকে হবে?'

দাদার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা চিরদিন অসীম। সে বলেছিল, 'দেখি কোত্থেকে হয়।'

বাবা চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েছিল, 'তুই কি এই স্বার্থপর ছ্যাঁচড়াটার জন্যে লোকের গলায় ছুরি দিবি নেত্য?'

দাদা হেসেছিল, 'ছুরি না দিয়েও কিছু করা যায় কিনা দেখি।'

সত্যি সত্যিই দিন কয়েকের ভেতর কিছু টাকা যোগাড় করে ফেলেছিল দাদা, কিন্তু তাতেও কুলোচ্ছিল না। তখন বৌদি গলা থেকে বিয়ের হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি খুলে দিয়েছিল।

বাবা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই টাকা তুই কোথায় পেলি নেত্য? শেষে কোন বিপদে পড়বি না তো?'

'না-না, সে জন্যে তোমার চিন্তা করতে হবে না।'

বাবা হঠাৎ রেগে উঠেছিল, 'তুই-ই আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথাটা খেলি নেত্য। ম্যাট্রিকের পর আর যদি না পড়াতিস তা হ'লে এই ঝঞ্ঝাটটা আর হ'ত না। সংসারের চেহারাটাও বদলে যেত।' তারপর গলা নামিয়ে বলেছিল, 'ঐ বদমাইশ স্বার্থপরটার জন্যে তুই এত করলি, ও কিন্তু তার মর্যাদা দেবে না।'

বাবার মুখ থেকে সেদিন যেন দৈববাণী বেরিয়েছিল। সত্যিই সন্দীপ দাদার এত মহত্ব উদারতার মর্যাদা দেয়নি। জার্মানীতে গিয়েই এ-দেশকে ভুলে গেছে সে, তাদের দীন হতশ্রী সংসার, বাবা-মা-ভাই-বোনদের ভুলেছে।

প্রথম দু-এক বছর তবু বাড়ির চিঠি খুলে দেখত সন্দীপ। কিন্তু যেদিন বাবা লিখল টাকার অভাবে কলেজ থেকে হারুর নাম কাটা গেছে, রমা আর গৌরীর বিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার, সেদিন থেকে চিঠির মুখ খোলা বন্ধ করে দিয়েছিল সে।

জার্মানীতে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি পেতেই ভাল চাকরি জুটে গিয়েছিল। প্রচুর মাইনে, প্রচুর আরাম। সেই সঙ্গে অঢেল মদ, অজস্র বান্ধবী। ক'দিনের ছুটি পেলেই মেয়ে জুটিয়ে কখনও সে পাড়ি জমাত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, কখনও বেলজিয়াম,

কখনও অস্ট্রিয়া, কখনও ফিনল্যাণ্ড। খাও-দাও, ফুর্তি কর—জার্মানীতে গিয়ে এই জীবনদর্শনটির খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল সে।

দশ বছর পর দেশে ফিরে এক বায়ুহীন দমবন্ধ ঘরে ভাত খেতে বসে বার বার সন্দীপের মনে হচ্ছিল, ডেটিং করে, মদ খেয়ে, লণ্ডন ভিয়েনায় উড়ে উড়ে যত টাকা উড়িয়েছে, তার থেকে সামান্য একটা অংশ যদি দেশে পাঠাত—দাদাকে এমনভাবে আত্মহত্যা করতে হ'ত না।

দাদার কথা ভাবতে গিয়ে আর একজনের কথা মনে পড়ে গেল। অশোকের বোন মল্লিকা। আশ্চর্য, মল্লিকার কথা কবেই ভুলে গিয়েছিল সে!

অথচ দাদা আর বৌদির মতো মল্লিকারাও জার্মানী যাবার ব্যাপারে কম সাহায্য করেনি। দাদা ধার করে যা এনেছিল আর বৌদির গয়না বিক্রি করে যা পাওয়া গিয়েছিল, সব যোগ করেও আরো কিছু টাকার টান থেকে গিয়েছিল। সেই টাকাটা দিয়েছিল মল্লিকারা।

তার জার্মানী যাবার রসদ যোগাতে দাদাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে—বৌদি বিধবা হয়েছে। মল্লিকাদের কী অবস্থা হয়েছে, কে জানে। সন্দীপের মনে হ'ল, তার মাথার ভেতর নতুন করে আগুনের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে।

মল্লিকার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ কবে?

কিন্তু না, মল্লিকার কথা আর ভাবা গেল না। বাঁ দিকের তক্তপোষ থেকে বাবা ঘড়েঘড়ে গলায় ডাকল, 'পচা—'

সন্দীপ চমকে উঠল। তারপরেই তার খেয়াল হ'ল সমস্ত ঘরটা আশ্চর্য রকমের স্তব্ধ। মনে হচ্ছে, কবরখানা কি শ্মশান। শুধু সেই স্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে চিড় ধরিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে কান্নার সরু তীক্ষ্ণ শব্দ উঠেছে। মা আর বৌদি মুখে আঁচল দিয়ে কাঁদছে।

অসহ্য, অসহ্য। সন্দীপ বাবার দিকে ফিরে বলল, 'কী বলছ?'

'তুই তো কিছুই খাচ্ছিস না। খা—'

মা-ও ধরা ধরা ভাঙা গলায় বলল, 'খা বাবা, খা—'

'আমার পেট ভরে গেছে।' সন্দীপ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

চার

কোনরকমে আঁচিয়ে বাইরের বারান্দা থেকেই সন্দীপ চেঁচিয়ে বলল, 'মা, আমার খুব ঘুম পেয়েছে। শুতে গেলাম।' বলেই দক্ষিণ দিকে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানায় চলে গেল। আলো আর বাবাও তার সঙ্গে সঙ্গে এল।

বাবা শুধলো, 'এখুনি শুয়ে পড়বি ?'

এখন কারো সঙ্গই ভাল লাগছিল না সন্দীপের ; কথা বলতেও ইচ্ছে করছিল না। মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ছিল তার। সংক্ষেপে শুধু বলল, 'হ্যাঁ।'

আলো বলল, 'মাথার কাছে ঐ টেবিলটায় জল আছে, হাত-পাখা আছে, ডিসে এলাচ-সুপরি-পান আছে। আর কিছু দরকার হয় ডাকিস, রাত্তিরে আমি পাশের ঘরে থাকি।'

'আর কিছু দরকার হবে না। তোমরা খেতে চলে যাও।'

বাবা আর আলো চলে গেল।

মে মাসের গরমে সমস্ত ঘরটা যেন আগুনের কুণ্ড হয়ে রয়েছে। সারা দিনে চারদিকের দেওয়ালগুলো যত তাপ শুষেছিল, এই মুহূর্তে তা যেন গলগল করে বার করে দিচ্ছে। ঘরে সিলিং ফ্যান নেই। দু' আনা দামের একটা হাত-পাখা আলো রেখে গেছে বটে, কিন্তু সন্দীপের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিছানায় বসে ঘেমে ঘেমে সে নেয়ে উঠতে লাগল।

এই ঘরে গোটা একটা রাত কাটাবার পর কারো চামড়াই অক্ষত থাকার কথা নয় ; সারা গায়ে নির্ঘাত ফোস্কা উঠে যাবে।

সন্দীপ কিন্তু গরমের কথা ভাবছিল না। দাদার আত্মহত্যার সমস্ত দায়িত্ব কায়দা করে বাবা-মা-বৌদিরা তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। বিচিত্র এক অপরাধ-বোধ কয়েক মণ ওজনের মতো তার অস্তিত্বের ওপর যেন অনড় হয়ে আছে। যেভাবেই হোক এই ভারটাকে সরাতেই হবে।

সন্দীপের মনে পড়ল, কাল রাত্তিরে এয়ারলাইনসের ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বরাদ্দের বেশি শ্যাম্পেন আদায় করেছিল। দমদমে নেমে ট্যাক্সিতে উঠতেই নেশা ছুটে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টা পার হতে চলল পাকস্থলীতে এক ফোঁটা জিন রাম কিংবা বোতলবাহিনী অন্য কোন ঝাঁঝালো পানীয় পড়েনি। হঠাৎ হুঁশ হল, তার স্যুটকেশে হুইস্কির আস্ত একটা বোতল রয়েছে।

স্যুটকেশটা ঘরেই তক্তপোষের তলায় আছে। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে বার করতে যাবে, সেই সময় বাইরে একটা মেয়ে-গলা শোনা গেল, 'কাকাবাবু—'

খুট করে বাইরের আলো জ্বলে উঠল এবং বাবার সস্নেহ উৎসুক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এস মা, এস। তোমার কথাই ভাবছিলাম। এত দেরি হ'ল যে?'

'দেরি কোথায় কাকাবাবু; সবে তো সাড়ে আটটা। থানা-টানা আর উকিলবাড়ি হয়ে এলাম। ট্রামে-বাসে আজকাল কিরকম ভিড়, জানেনই তো। দু'চারটে না ছাড়লে ওঠাই যায় না। সাড়ে আটটার ভেতর যে আসতে পেরেছি, এই না কত।'

বাবা অনুমোদনের স্বরে বলল, 'তা ঠিক।'

এই ঘর থেকে মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছে না সন্দীপ। কণ্ঠস্বর শুনেও তাকে চেনা গেল না। তবে টের পাওয়া গেল, বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঝুপসি জঙ্গল ঠেলে সামনের রকে এসে উঠল সে।

বাবা তো ঠাকুরদার একমাত্র ছেলে। সে আবার কাকাবাবু হয়ে কোত্থেকে একটি ভাইঝি জোটাল? যাই হোক, রকে উঠবাব পর বাবা কিংবা অচেনা মেয়েটার সব কথা বোঝা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে থানা-পুলিশ, জামিন আর পটলা, এইরকম দু'চারটে টুকরো টুকরো শব্দ কানে আসতে লাগল।

একসময় মেয়েটি হঠাৎ উঁচু গলায় বলে উঠল, 'এসে গেছে?'

আলোর গলা এবার শোনা গেল, 'হ্যাঁ।'

'কই, দেখছি না তো—'

'দক্ষিণের ঘরে আছে।'

তারপর আর কিছু শুনতে পেল না সন্দীপ। তবে বুঝতে পারল, শেষ কথাগুলো তার সম্বন্ধেই হয়েছে।

হুইস্কির বোতলটা বার করা হয়নি। মেয়েটা আসতে সন্দীপ থমকে গিয়েছিল। তক্তপোষের তলা থেকে স্যুটকেশটা টানবার জন্য আবার ঝুঁকল সে। কিন্তু এবারও বাধা পড়ল। হঠাৎ মৃদু নরম গলায় খুব কাছ থেকে আলো ডাকল, 'পচা—'

চমকে মুখ তুলতেই সন্দীপ দেখতে পেল, দরজার ফ্রেমে পাশাপাশি আলো আর—আর হ্যাঁ, সেই মেয়েটাই তো, সেই মল্লিকা, তার স্মৃতির ভেতর থেকে উঠে এসে যেন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পেছনে বাবা। আশ্চর্য, খেতে বসে মল্লিকার কথাই ভেবেছিল সন্দীপ।

একটু আগে তা হলে মল্লিকাই এসেছে! বাবা তার সঙ্গেই কথা বলছিল। সন্দীপের মনে পড়ল, দশ বছর আগে বাবাকে কাকাবাবু বলেই ডাকত মল্লিকা।

বাবা ওধার থেকে কি যেন বলল, সন্দীপ বুঝতে পারল না। মল্লিকার দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে সে।

আলো একবার যেন বলল, 'যাক, তুই তা হলে এখনও ঘুমোসনি? শুয়ে পড়লে আজ আর মল্লিকার সঙ্গে দেখা হত না।'

সন্দীপ দেখছিল ; চেহারা প্রায় একই রকম আছে মল্লিকার। সেই ভাসা-ভাসা দীর্ঘ চোখ, লম্বা টানের পাতলা নাক, কুচকুচে কালো ভুরু, ছোট্ট কপালের ওপর থেকে ঘন চুলের ঘের। চাপ চাপ চুলের ভেতর সিঁথিটা প্রায় চোখেই পড়ে না। সরু চিবুকের কাছে একটা বড় লাল তিল। [একদিন ঐ তিলটা সন্দীপকে মুগ্ধ করেছিল] গলায় শাঁখের মতো তিনটে ভাঁজ। গায়ের রঙ একদিন রৌদ্রঝলকের মতো ছিল। পালিশ-করা চকচকে আয়নার ওপর ধুলোবালি জমলে যেমন দেখায় রঙটা এখন তেমন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরনে খুব সাধারণ একটা শাড়ি আর হাতায় সুতোর ফুল তোলা সাদা ব্লাউজ। কাঁধে শ্রীনিকেতনী ঝোলা। কানে মাকড়ি, হাতে দু'গাছা দু'গাছা চার গাছা ব্রোঞ্জের চুড়ি, গলায় সরু হার। কত বয়েস হবে মল্লিকার? দশ বছর আগে সে ছিল আঠারো-উনিশ। তা হলে এখন দাঁড়াচ্ছে আটাশ-উনত্রিশের মতো। কিন্তু অতটা দেখায় না। বয়সের ভার তেমন পড়েনি তার ওপর। তবু বোঝা যায়, রীতিমত যুদ্ধ করে মল্লিকাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

মল্লিকা অল্প হাসল। বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

সন্দীপ কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। ইউরোপের রাজ্যে রাজ্যে টহল দিয়ে কম করে কয়েক শ' নীলাক্ষী বিড়ালাক্ষীর সঙ্গলাভ করেছে। অন্তত মেয়েদের সামনে স্নায়ুভীতি থাকার কথা নয় সন্দীপের। কিন্তু এতকাল পর মল্লিকাকে দেখে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। মাথাটা একধারে হেলিয়ে কোনরকমে জানিয়ে দিল, চিনতে পেরেছে।

বাবা বলল, 'তোরা তা হলে গল্প-টল্প কর পচা। আমরা যাচ্ছি। আয় আলো, খেতে দিবি। বড্ড খিদে পেয়েছে।'

আলো-কে নিয়ে বাবা চলে গেল।

মল্লিকা বলল, 'দাঁড় করিয়ে রাখবেন নাকি? ভেতরে যেতে বলবেন না?'

সন্দীপ বিব্রতভাবে বলে উঠল, 'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, এস। ঐ চেয়ারটায়, নাকি বিছানায় বসবে?'

দূরে একটা চেয়ারে বসতে বসতে ঠোঁট টিপে হাসল মল্লিকা. 'বাবা. যেরকম করছেন তাতে মনে হয় এই প্রথম মেয়ে দেখলেন। অথচ—'

'কী ?'

একপলক তার দিকে তাকিয়ে থেকে মল্লিকা বলল, 'না, কিছু না।'

সন্দীপের মনে পড়ল, এই মেয়েটা একদিন কি লাজুকই না ছিল। কথায় কথায় তার মুখ লাল হয়ে উঠত। আর এখন ? এখন তার চোখে-মুখে খই ফুটতে দেখছে সন্দীপ। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি।'

'কী ভেবেছিলেন, আমি মরে গেছি ?' কৌতুকে মল্লিকার চোখ এবং কণ্ঠস্বর ঝকমক করতে লাগল।

বিপন্ন স্বরে সন্দীপ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না-না, কি আশ্চর্য !'

মল্লিকা বলল, 'একেবারে মরার কথা না ভাবলেও, হয়তো ভেবেছিলেন বিয়ে করে দেশান্তরী হয়ে গেছি, তাই না ?' একটু থেমে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে আবার বলল, 'আমাকে দেখে খুব খারাপ লাগছে নিশ্চয়ই ?'

মেয়েটা কি অন্তর্যামী ? সন্দীপ ভাবল। তার অস্বস্তি কি মল্লিকার চোখে ধরা পড়ে গেছে ? সন্দীপ তাড়াতাড়ি বলল, 'না-না, খারাপ লাগবে কেন ?'

'খারাপ লাগার কি কোন কারণই নেই ?' সোজা সন্দীপের চোখের দিকে তাকাল মল্লিকা !

সন্দীপ উত্তর দিল না।

মল্লিকা আবার বলল, 'ভেবেছিলাম কাকাবাবুদের সঙ্গে আপনাকে এগিয়ে আনতে এয়ারপোর্টে যাব।'

আবছা গলায় সন্দীপ বলল, 'গেলে না যে ?'

'একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম।'

মল্লিকা কথা বলে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার দৃষ্টি সন্দীপের ওপর স্থির নিবদ্ধ। এমন করে কেউ তাকিয়ে থাকলে আরাম বোধ করবার কথা নয়। সন্দীপ বলল, 'কী দেখছ ?'

'আপনাকে।' মল্লিকা বলতে লাগল, 'দশ বছর এদেশে ছিলেন না। তার মধ্যে কতটা বদলেছেন, কতটা আগের মতন আছেন, দেখছি।'

'তোমার কি ধারণা সারা গায়ে অদল-বদলের ছাপ মেরে এসেছি, দেখলেই যাতে বুঝতে পার ?'

মল্লিকা উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর হঠাৎ সন্দীপ বলে উঠল, 'তোমরা এখন কোথায় আছ ?'

মল্লিকা বলল, 'সেইখানেই।'

'মানে তোমাদের সেই জবরদখল কলোনিতে?'

'আপনার মনে আছে তা হলে—'

মল্লিকার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ অথবা সরলতা, কী আছে সন্দীপ বুঝতে পারল না। বলল, 'মনে থাকবে না কেন? আমার স্মৃতিশক্তি কি এতই খারাপ?'

'না, খুব ভাল।' মল্লিকা হাসল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে সন্দীপ বলল, 'আরে অশোকের কী খবর?'

'যাক, দাদার খুব সৌভাগ্য। এতক্ষণে তবু তাকে মনে পড়ল!'

'না, মানে—অশোক এখন কী করছে?'

'আগে যা করত। পলিটিকস্—রাজনীতি।'

'আর কিছু করে না?'

'না। সময় কোথায়? তা ছাড়া রাজনীতি করাও তো একটা কাজই।'

'নিশ্চয়ই।' সন্দীপ বলতে লাগল, 'চিরকাল অশোকটা একরকমই থেকে গেল। ওকে কাল আসতে বোলো তো—'

'দাদা এখানে নেই। ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্স হচ্ছে মাদ্রাজে; ডেলিগেট হয়ে গেছে।'

একটা সিগারেট ধরাল সন্দীপ। বলল, 'তোমার মা কেমন আছে?'

'খুব ভাল।'

'তোমার বাবা?'

'আপনার জন্যে এখনও বেঁচে আছে।'

'আমার জন্যে?' সন্দীপ চমকে উঠল।

মাথাটা একপাশে হেলিয়ে দিল মল্লিকা, 'হ্যাঁ। বাবা প্রতিজ্ঞা করেছে, আপনার সঙ্গে একবার দেখা না করে মরবে না।'

সন্দীপ অনুভব করল, তার মাথার ভেতর কোথায় যেন একটা শিরা কট করে কেটে গেল। জড়ানো গলায় বলল, 'একদিন তোমাদের বাড়ি গিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসব।'

'বাবা আপনার আসার খবর পেয়ে গেছে। আপনি না গেলে বাবাই একদিন এসে হাজির হবে; নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

মুখের ভেতর থেকে ধোঁয়ার আংটি ছাড়তে ছাড়তে এবার সন্দীপ বলল, 'সবার কথাই তো হচ্ছে। এবার তোমার খবর বল।'

ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মল্লিকা বলল, 'আমার কোনো খবর নেই।'

'তাই কখনো হয়!'

'তাই-ই হয়। আমাদের মতো মেয়েদের খবর থাকে না।'

হঠাৎ সন্দীপ চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি! তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন?'

'তবে কী বলব?'

'জার্মানী যাবার আগে যেমন তুমি-টুমি করে বলতে।'

'বলতাম নাকি?' বলেই একটু চুপ করে থেকে ঘাড়খানা বাঁকিয়ে গালে একটা হাত রাখল মল্লিকা। ঝকমকে গলায় বলল, 'সত্যি আপনার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। দশ বছর আগের কথা এমন মনে করে রাখতে আমি আর কারোকে দেখিনি।'

মল্লিকার কথায় কৌতুক অথবা বিদ্রূপ যা-ই থাক, সন্দীপ গায়ে মাখল না। বলল, 'আমাকে আগের মতো তুমি করে বলতে পার।'

'আপনি দিয়ে শুরু করে ফেলেছি। চট করে কি আর মুখ দিয়ে তুমি বেরুবে? তা ছাড়া একদিন যাকে তুমি বলতাম, আগে দেখি, দশ বছর পর সে-ই ফিরে এসেছে কিনা। তারপর না হয় ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে।'

সন্দীপ চুপ। হাতের সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে আঙুলের কাছে আগুন চলে এসেছিল; সেই আগুন থেকে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, না?'

'তা হ'ল—' কেমন করে যেন বলল মল্লিকা। তারপর মাথাটা অন্য দিকে হেলিয়ে আরেক গালে হাত রাখল। তার চোখে পলক পড়ছে না; দুই ঠোঁটের মাঝখানে বিচিত্র সংকেতের মতো একটুখানি হাসি।

সন্দীপ অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, 'জার্মানী থাকতে প্রায়ই আশা করতাম তোমার চিঠি পাব।'

'সত্যি!'

সন্দীপ বিব্রত। এখান থেকে যাবার পর প্রথম কিছুদিন মল্লিকার কথা নিশ্চয়ই তার মনে পড়েছে। কিন্তু খুব দ্রুত সে তাকে ভুলে গিয়েছিল। প্রচুর আরাম, অজস্র পানীয়, সহজলভ্য যুবতী আর প্রতি মুহূর্তের উত্তেজক ফেনিল জীবন কয়েক হাজার মাইল দূরের এক উদ্বাস্তু মেয়ের মুখ ক্রমশ ঝাপসা করে দিয়েছিল। নেহাত বলতে হয় তাই চিঠির কথা বলল সন্দীপ। নইলে মল্লিকার কথা তার মনেও পড়ত না।

সন্দীপ বলল, 'সত্যি ছাড়া কী?'

'আপনি না এমন বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারেন!' মল্লিকা শরীর বাঁকিয়ে-

চুরিয়ে হাসতে হাসতেই দুম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অনেক রাত হ'ল, আর আপনাকে জ্বালাব না। আজ যাই।'

সন্দীপের মুখ কিন্তু আগেই লাল হয়ে উঠেছিল। আগের কথার সুতো ধরে ডুবন্ত গলায় সে বলল, 'তোমার কি ধারণা চিঠির ব্যাপারে মিথ্যে বলছি?'

মল্লিকা বলল, 'আপনার এ কথাটার উত্তর আজ না, পরে দেব। আপনি টায়ার্ড; এবার শুয়ে পড়ুন।' বলে মল্লিকা দরজার দিকে ক'পা এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলল, 'আমি কিন্তু আবার আসব।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবে।'

'শুধু শুধু নয় কিন্তু, আপনার সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়া আছে।'

শিথিল গলায় সন্দীপ বলল, 'কিসের বোঝাপড়া?'

'পরে জানতে পারবেন।' মল্লিকা আর দাঁড়াল না; বারান্দায় বেরিয়ে বাঁ দিকে চলে গেল।

মল্লিকা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল সন্দীপ। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগল। তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মেয়েটা যে ধনুর্ভাঙা পণ করে দশটি বছর বসে আছে, কে ভাবতে পেরেছিল! মল্লিকার বাবা হেরম্ববাবুও তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ভাবতে গিয়ে সন্দীপের মাথায় জট পাকিয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ সেই হুইস্কির বোতলটার কথা আবার মনে পড়ে গেল সন্দীপের। ঝুঁকে তক্তপোষের তলা থেকে স্যুটকেশটা টেনে এনে বোতল বার করল সে। টিনের ঢাকনিটা খুলে—না জল, না সোডা, কিছুই না মিশিয়ে ঢকঢক করে খানিকটা 'র'ই খেয়ে ফেলল। তারপর বোতলটা মাথার কাছে টেবিলের ওপর রেখে, আলো নিভিয়ে টান টান শুয়ে চোখ বুজল। দরজাটা বন্ধ করার কথা খেয়াল রইল না।

চোখ বুজল কিন্তু ঘুম এল না। মাথার ভেতর সেই আগুনের চাকাটা ঘুরছে; চোখের পাতায় পিন ফোটার মতন কিছু বিঁধছে।

মে মাসের অসহ্য গরমে ফার্নেসের মতো একটা ঘরে শুয়ে গলগল করে ঘামতে ঘামতে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করতে লাগল সন্দীপ। জার্মানীতে যে শহরটায় সে থাকত তার ঝকঝকে রাস্তাঘাট, চমৎকার চমৎকার বাড়ি, মোড়ে মোড়ে ফোয়ারা, পার্ক, সাব-ওয়ে, ফ্লাইওভার, টিউব-ট্রেন ভাবতে চেষ্টা করল! সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ারের সময় রুশ বোমায় শহরটা চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ধ্বংসস্তূপের ওপর আবার কি সুচারু জনপদই না গড়ে তুলেছে জার্মানরা। শহরটাই শুধু না, জীলার-হ্যান্‌স্‌-এরিকা-সেলিঞ্জার-পাউলা-আনাক্লারা-সিসিঙ্গার—অসংখ্য বন্ধু আর বান্ধবীর মুখ মনে

আনতে চেষ্টা করল। কিন্তু না, কয়েক হাজার মাইল দূরের সব দৃশ্য, সব সৌন্দর্য, চমৎকারিত্ব আর ভিড় ঠেলে বার বার মল্লিকা সামনে এগিয়ে আসতে লাগল।

মল্লিকার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কবে ?

উঁহু, মল্লিকা না, তার আগে হেরম্ববাবুর কথা।

ষোল-সতের বছর আগে অর্থাৎ নাইনটিন ফিফটি থ্রি ফিফটি ফোরে শহরতলীর এই অঞ্চলটায় ভিড় ছিল না। বাড়ি-টাড়ি কমই চোখে পড়ত। সামান্য যে ক'টা ছিল, সেগুলোও ছাড়া-ছাড়া। অচেনা বিদেশীর মতো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকত। মানুষজনের চাইতে এখানে নির্জনতা ছিল বেশি ; বাড়ি ঘরের তুলনায় বেশি ছিল ফাঁকা জায়গা।

তখন হাইস্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ত সন্দীপ। হঠাৎ একদিন তার চোখে পড়ল, পুব বাঙলার লোকেরা এসে ফাঁকা জায়গা কিনে কিনে বাড়ি তুলছে।

সেই ফিফটি থ্রি ফিফটি ফোর থেকেই নির্জন শহরতলী সরগরম হয়ে উঠতে লাগল। যত দিন যেতে লাগল ততই ভিড় বেড়ে চলল।

পার্টিসানের পর পাকিস্তান থেকে যারা কিছু আনতে পেরেছিল তারা জমি-টমি কিনে বাড়ি-টাড়ি তুলছিল। আর যারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে চলে এসেছে তারা কলকাতার চারপাশে জায়গা দখল করে কলোনি বসাচ্ছিল।

একবার পর পর তিন দিন ছুটি ছিল সন্দীপদের। তারপর স্কুলে গিয়ে সে অবাক। তিন দিন আগেও স্কুলবাড়ির পেছনে হোগলাবন দেখে গেছে সে। রাতারাতি বন সাফ করে টালি, টিন, বাঁশ-টাশ দিয়ে সেখানে অনেকগুলো চালা-টালা উঠেছে। সামনে এক টুকরো বাঁশ পুঁতে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে—'নবপল্লী'।

উদ্বাস্তদের ঐ নতুন উপনিবেশ থেকেই হেরম্ববাবু আসত ; সন্দীপদের স্কুলবাড়ির সামনে দিয়ে দূরে বড় রাস্তার দিকে চলে যেত।

হেরম্বর চেহারায় এমন কিছু বিশেষত্ব নেই যে মনে করে রাখতে হবে। রোগা শরীর, রেখাময় মুখ, বিড়ির ধোঁয়ায় কাল্‌চে ঠোঁট, তামাটে চামড়া। রাস্তা দিয়ে সহজভাবে হাঁটত না সে ; চোখ বুজে ঘুমোতে ঘুমোতে আর টাল খেতে খেতে যেত। এভাবে হাঁটার জন্য লোকটাকে ভোলা যায়নি।

সন্দীপের বন্ধুদের ভেতর তাপসটা ছিল মহা হারামজাদা। টাল খেতে খেতে হাঁটত বলে হেরম্বর মজাদার নামকরণ করেছিল সে। দূর থেকে হেরম্বকে দেখলেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলত, 'টালমাটাল বাবু আসছে।' কোনদিন বলত, চিরনিদ্রিত-বাবু আসছে—'

অন্য বন্ধুরা হাসতে হাসতে হুল্লোড় বাধিয়ে দিত। একদিন ভারি রগড়ের গলায় তাপস বলেছিল, 'মাইরি, লোকটা ঘোড়াকেও হার মানিয়ে দিয়েছে রে—'

'কি রকম?'

'ঘোড়া শুনেছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়; এ দেখছি ঘুমোতে ঘুমোতে হাঁটে।'

আরেকদিন এক কাণ্ডই করেছিল তাপস। হেরম্ব কাছাকাছি এলে হঠাৎ ডেকেছিল, 'ও মশাই শুনছেন?'

হেরম্ববাবু ফিরেও তাকায়নি; অন্য দিনের মতো চোখ বুজে বুজেই সন্দীপদের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

তাপস করেছিল কি, হেরম্ববাবুর হাঁটা নকল করে তার পিছুপিছু খানিক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে বলেছিল, 'সারারাত নিশ্চয়ই ওর বউ ওকে ঘুমোতে দ্যায় না; সেই জন্যে রাস্তায় ঘুম লাগিয়ে পুষিয়ে নেয়।'

হেরম্বকে নিয়ে তাপসরা যখন মজা করছে সেই সময় অশোক সন্দীপদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। ছেলেটা অদ্ভুত, বয়েসের তুলনায় অনেক লম্বা।

অশোকের চেহারা ছিল আশ্চর্য ধারাল। নাকটা সোজা কপাল থেকে নেমে এসেছে। চোখ দুটো বড়ো বড়ো আর উজ্জ্বল। হাত এত দীর্ঘ যে উরু ছাপিয়ে হাঁটু ছুঁই ছুঁই করত।

নিজের সম্বন্ধে অশোক ছিল উদাসীন এবং অন্যমনস্ক। মাথায় কদাচিৎ তেল দিত। যেদিন দিত, এত প্রচুর দিত যে জুলপি আর কপাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামত। চিরুনির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না; ফলে চুলগুলো কপালের ওপর দিয়ে চোখের কাছে এসে ঝুলতে থাকত।

ছাত্র হিসেবে অশোক ছিল অসাধারণ। তবে ক্লাসের বইগুলোর দিকে তার খুব মনোযোগ ছিল না। সেই বয়সেই নানারকমের ইংরেজি বাঙলা বই তার হাতে হাতে ঘুরত।

সন্দীপদের ক্লাসে বিমল বলে একটা চালিয়াত ছোকরা ছিল, ইংলিশ রীডারেও একদিনও পড়া পারত না অথচ মোটা ইংরেজি বই নিয়ে তার ঘুরে বেড়ানো চাই। সন্দীপরা জানত সে সব বইয়ে দাঁত ফোটানো বিমলের কাজ না।

অশোককে দেখে কিন্তু মনে হ'ত, চালিয়াতি করবার জন্য সে মোটা মোটা বই নিয়ে বেড়ায় না। রীতিমত ওগুলো পড়ে সে, পড়ে মানেও বোঝে।

দু-চার দিন ক্লাস করেই সবাইকে চমকে দিয়েছিল অশোক। তার মধ্যে আকর্ষণের এমন একটা শক্তি ছিল যে কাছে না গিয়ে উপায় নেই। সন্দীপ নিজেই সেধে গিয়ে একদিন আলাপ করেছিল; তার দেখাদেখি তাপসরাও।

সন্দীপ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমারা আগে কোথায় ছিলে ভাই ?'

অশোক বলেছিল, 'ঢাকায়।'

'দেশ ছেড়ে চলে এলে যে ?'

'ওখানে থাকা গেল না, তাই।' পাকিস্তানে কী অবস্থা চলছে তার ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছিল অশোক।

একটু চুপ করে থেকে সন্দীপ বলেছিল, 'এখানে তোমরা কোথায় থাক ?'

'জবরদখল কলোনিতে। ঐ যে নবপল্লী—ওখানে।' স্কুলবাড়ির পিছন দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছিল সন্দীপ।

'কিন্তু ওটা তো সরকারদের জায়গা। সরকাররা লোক খুব খারাপ ; গোলমাল করতে পারে।'

অশোক বলেছিল, 'করলে করবে ; আমরাও তার জন্যে তৈরি আছি। জায়গাটা ফাঁকা পড়ে ছিল ; সাপ আর শুয়োর চরে বেড়াত। জন্তু জানোয়ারের বদলে না হয় আমরা আছি। হাজার হলেও মানুষ তো।' অশোকের অন্যমনস্ক উদাসীন চোখের ভেতর থেকে হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুৎ বেরিয়ে এসেছিল, দেশভাগ হবে, আর আমরা বিনা দোষে এখানে এসে রাস্তায়-ঘাটে শিয়ালদা স্টেশনে পচে মরব, সেটি হবে না।'

সন্দীপ চমকে উঠেছিল। অশোককে বাইরে থেকে যেমন দেখা যায় আসলে সে ঠিক তেমনটি না। তার ভেতরে একটা সজীব আগ্নেয়গিরি আছে ; একটু খোঁচা দিলেই আগুন বেরিয়ে আসবে।

আলাপের কিছুদিন পর অশোকের মুখ থেকে নতুন নতুন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শোনা যেতে লাগল। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রবাদ, রাশিয়া, ভিয়েৎনাম, দিয়েন বিয়েন ফু ইত্যাদি। খবরের কাগজের পাতায় এই সব শব্দ চোখে পড়ে।

সন্দীপ অবাক হয়ে বলত, 'বাবা, তুমি খবরের কাগজ মুখস্থ কর নাকি ?'

অশোক বলত, 'নিশ্চয়ই করি। সারা পৃথিবীতে কোথায় কী হচ্ছে, জানতে হবে না ?' একটু চুপ করে থেকে আবার বলত, 'খবরের কাগজে কতটুকুই বা থাকে। তোমাকে বই দেব, পড়ে দেখো। অনেক কিছু জানতে পারবে।'

নানা রাজ্যের খবর ঠেসে ঠেসে মস্তিষ্ককে গুদামঘর বানিয়ে তুলবার ইচ্ছা সন্দীপের ছিল না। পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করতে হলে যেটুকু দরকার তার বেশি একটা অক্ষরও মাথায় পুরতে সে রাজী না। বই পড়ার কথায় সে চুপ।

একটা ব্যাপার সন্দীপ লক্ষ্য করেছে, দেশভাগ কি পাকিস্তানের কথা উঠলে উত্তেজিত হয়ে উঠত অশোক। লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্দশার জন্য সে দায়ী করত পার্টিসানকে।

মনে পড়ে সে সময় উদ্বাস্তুদের নিয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কলকাতায় একটা করে মিছিল বেরুত কি মীটিং হত। যেদিনই মিছিল বেরুত কি মীটিং হত, অশোককে সেদিন ক্লাসে দেখা যেত না। শুধু উদ্বাস্তুদের ব্যাপারেই না, রাজনৈতিক দলগুলি মীটিং ডাকলেও অশোক চলে যেত। রাজনীতি তখন থেকেই তার মাথা খেতে শুরু করেছে।

তার সঙ্গে অশোকের স্বভাবের অনেক অমিল, তবু সবার থেকে অন্যরকম এই অদ্ভুত ছেলেটা যত দিন যাচ্ছিল ততই সন্দীপকে আরো বেশি করে আকর্ষণ করছিল। সন্দীপকেই শুধু না, তাপসদেরও।

বন্ধুত্বটা গাঢ় হবার পর অশোক সন্দীপদের ধরে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি আর কি, টালির চাল আর বাঁশের বেড়ার খান তিনেক ঘর।

রাস্তা থেকে বাড়িতে পা দিয়েই থমকে গিয়েছিল সন্দীপ। সামনের বারান্দায় সেই লোকটা—যাকে ঘুমোতে ঘুমোতে আর টাল খেতে খেতে যেতে দেখা যায়—বসে বসে চোখ বুজে বিড়ি ফুঁকছে। সন্দীপ আর তাপস চট করে অশোকের পেছনে চলে গিয়েছিল। ভয়ে ভয়ে ফিস ফিস গলায় তাপস জিজ্ঞেস করেছিল, ঐ ভদ্রলোক কে ভাই?

অশোক বলেছিল, 'আমার বাবা।'

ঐ লোকটা যে অশোকের বাবা হয়ে বসে আছে, কে জানত। তাপস বলেছিল, 'আজ আমরা যাই, আরেকদিন আসব। সন্দীপকে বলেছিল, 'চল্ পালাই—'

অশোক কিন্তু তাদের যেতে দ্যায়নি; বাড়ির দরজায় এনে কে-ই বা ছাড়ে। সেই লোকটা ততক্ষণে সন্দীপদের দেখতে পেয়েছে। ঘুমন্ত চোখ অল্প ফাঁক করে বলেছিল, 'ওরা কারা রে অশোক?'

অশোক বলেছিল, 'আমার বন্ধু বাবা; এক ক্লাসে পড়ি।'

অশোকের বাবা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তাপসের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমাকে চিনতে পারছ?'

তাপসের মতো তুখোড় শয়তান ছেলেরও ঘাম ছুটে গিয়েছিল। মুখ নামিয়ে সে তোতলাতে শুরু করেছিল, 'আজ্ঞে আজ্ঞে—'

অশোক বলেছিল, 'তুমি ওদের চেন নাকি বাবা?'

লোকটা ছেলের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাপসকে আবার বলেছিল, 'আমি টালমাটালবাবু হে। আরেকটা কী নাম যেন দিয়েছ? চিরনিদ্রিতবাবু, না?'

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চললেও লোকটার চোখ-কান যে খোলা থাকে তার প্রমাণ পেয়ে সন্দীপরা কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

অশোকের বাবা তারিফের গলায় বলে যাচ্ছিল, 'বেশ বেশ, খাসা নামকরণ করেছ!' বলতে বলতেই গলা তুলে ডেকেছিল, 'কোথায় গেলে, শুনছ?'

সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের ঘরের বারান্দা থেকে কেউ সাড়া দিয়েছিল 'এই তো—'

চমকে সন্দীপরা ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেয়েছিল, গোলগাল আহ্লাদী পুতুলের মতো এক মহিলা সেখানে দাঁড়িয়ে। বয়েস বোঝা যায় না। কোঁচকানো কোঁচকানো ঘন চুলের মাঝখানে সরু সিঁথি। কপালে তামার পয়সার মতো মস্ত সিঁদুরের টিপ। মুখখানি স্নেহের রসে ভাসো-ভাসো। সন্দীপরা দেখেই বুঝেছিল, অশোকের মা। তার ঠিক পাশেই বারো তেরো বছরের একটি মেয়ে। গাছকোমর করে শাড়ি পরা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মুখের ওপর এসে পড়েছে। চুলের ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টে সন্দীপদের দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

অশোকের বাবা বলেছিল, 'তোমাকে বলেছিলাম না, ক'টা ছেলে আমাকে দুটো নাম দিয়েছে? এরাই সেই ধনুর্ধর।' সন্দীপদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছিল অশোকের বাবা, 'ওরা আবার তোমার ছেলের বন্ধু। রাস্তা দিয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে যাই বলে ওরা কী বলে জানো?'

'কী?'

'তুমি নাকি রাত্তিরে আমাকে ঘুমোতে দাও না।'

হেসে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল অশোকের মা। হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'পাকা ছেলে সব।'

সন্দীপরা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না; ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়ে দিয়েছিল।

সেই দিনই বিকেলবেলা অশোক তাদের বাড়ি এসে হাজির। সঙ্গে সেই চুলের ফাঁক-দিয়ে চেয়ে-থাকা মেয়েটা। সন্দীপদের বাড়ি অশোকের সেই প্রথম আসা। অশোকের স্বভাবের মধ্যে সঙ্কোচ-টঙ্কোচ কম। এসেই সে বাড়ির সবার সঙ্গে আলাপ-টালাপ করে জমিয়ে নিয়েছিল। সেই মেয়েটার সঙ্গেও মা-বাবা-বড়দি-বৌদিদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটা তার বোন। ভাল নাম মল্লিকা, ডাক নাম মনু।

মল্লিকাকে নিয়ে বাড়িতে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। একবার মা, একবার বড়দি, একবার বৌদি তাকে টানাটানি করছিল। মা তো কোলে বসিয়ে নিজের হাতে দুটো সন্দেশই খাইয়ে দিয়েছিল। খাওয়াতে খাওয়াতে বলেছিল, 'কি সুন্দর দেখতে! আর চুলের ভেতর দিয়ে কেমন তাকায়!' হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে মা জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁ রে আলো, তোর ঠাকুমা এই সব মেয়েদের নিয়ে কী যেন একটা ছড়া কাটত?'

বড়দি বলেছিল, 'চুলের তলা দিয়ে আঁখি ঠারে, মনখানি অমনি কাড়ে।'

ঠাকুমা বুড়ি বেঁচে থাকতে বাইরের বারান্দায় বসে সত্যিসত্যিই এই ছড়াটা কাটত। চুলের তলা দিয়ে তাকিয়ে কে কবে কার মন কেড়ে নিয়েছিল, কে জানে।

সবার সঙ্গে গল্প-টল্প করে অশোক সন্দীপকে বলেছিল, 'চল—'

সন্দীপ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায়?'

'আমাদের বাড়ি। মা তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।'

জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে সন্দীপ বলেছিল, 'না ভাই, তোমাদের বাড়ি আর যাচ্ছি না। ওবেলা যা বিপদে পড়েছিলাম। তাপসটার জন্যে তোমার মা-বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না।'

অশোক বলেছিল, 'বাবা-মা কিছু মনে করেনি। বরং তাদের খুব মজা লেগেছে। বিশ্বাস না হয় আমার বোনকে জিজ্ঞেস কর।

সেই মেয়েটা, যার নাম মল্লিকা, চুলের আলো-আঁধারির ভেতর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেছিল, 'দাদা সত্যি কথা বলেছে।'

একরকম জোর করেই অশোক তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় মা মল্লিকাকে বলেছিল, 'আবার এস মনু।' সেই প্রথম দিন থেকেই মল্লিকাকে মনু বলতে শুরু করেছিল মা।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে অশোক বলেছিল, 'চল, তাপসদের বাড়ি হয়ে যাই। মা ওকেও নিয়ে যেতে বলেছে।'

'ওকেও নিয়ে যেতে বলেছে!'

তাপস কিন্তু যায়নি। বলেছিল, 'বাপস্, মেরে ফেললেও যাচ্ছি না। বাঘের গুহায় যেতে বল, তাতেও রাজী আছি। কিন্তু তোমাদের বাড়ি আর না।'

হাজার বুঝিয়েও যখন কাজ হ'ল না তখন সন্দীপকে নিয়েই অশোক তাদের বাড়ি গিয়েছিল। অশোকের বাবা সেই সময়টা ছিল না। অশোকের মা, সেই আহ্লাদী পুতুলের মতো মহিলা, ছুটে এসে সন্দীপের একটা হাত ধরেছিল। বলেছিল, 'অমন করে তখন ছুটে পালালে কেন, অ্যাঁ?'

সন্দীপ চুপ।

অশোকের মা বলে যাচ্ছিল, 'আরে বাপু, আমরা রাগ-টাগ কিছুই করিনি। মজার কথায় রাগ করবার কী আছে। আমি তো তোমার মেসোমশাইকে এখন থেকে টালমাটালবাবু বলে ডাকতেই শুরু করে দিয়েছি।'

সন্দীপ এবার মুখ খুলেছিল, 'আমি না মাসিমা, তাপসটা ঐসব নাম দিয়েছিল।'

'নাম দিয়েছিল, বেশ করেছিল। মেসোমশায়কে নিয়ে ওর হয়তো একটু

আনন্দ করতে ইচ্ছে হয়েছিল। ভাল কথা, ঐ ছেলেটার নাম কী বললে—তাপস?'

'হ্যাঁ—'

'সে কোথায়?'

মল্লিকা বলল, 'তাপসদা এল না। বলল, বাঘের গুহায় ঢুকবে তবু আমাদের বাড়ি আসবে না।'

সেই শুরু। তারপর থেকে অশোকদের বাড়ি যেতে লাগল সন্দীপ। অশোকই অবশ্য নিয়ে যেত। মল্লিকাকে নিয়ে অশোক মাঝে মধ্যে তাদের বাড়িতেও আসত। একদিন ওর মা-ও এসেছিল।

যাতায়াতের ফলে অশোকদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা গিয়েছিল। দেশে থাকতে ওদের পাটের বিজনেস ছিল। ইণ্ডিয়ায় এসে কালিঘাটের দিকে ফুটপাথে ছোটোখাটো একটা কাপড়ের দোকান দিয়েছিল অশোকের বাবা। ক্যাপিটাল নেই, থাকলে হারানো ঐশ্বর্য এখানেই তৈরি করে নিতে পারত ওরা। অশোকের বাবা অবশ্য সেই সময় একটা বিজনেস লোনের জন্য চেষ্টা করছিল। পেলে ব্যবসাটা ভাল করে ফেঁদে বসবে, এই আশা। কিন্তু সরকারী দপ্তরে-দপ্তরে ঘুরে লোনটা কিছুতেই আর বার করা যাচ্ছিল না।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেছে। এর ভেতর সন্দীপরা ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। সন্দীপ আর অশোক গিয়ে ভর্তি হয়েছিল ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজে। তাপসরা গিয়েছিল অন্য কলেজে। কলেজ আলাদা হবার পর থেকে তাপসদের সঙ্গে সম্পর্কটা আলগা হয়ে যেতে শুরু করেছিল।

অশোক আর সন্দীপ, ম্যাট্রিকটা দু'জনেই ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছিল। সন্দীপ পেয়েছিল স্কলারশিপ, কিন্তু কলেজে ঢুকে রাজনীতি নিয়ে অশোক এমন মেতে উঠেছিল যে ইণ্টারমিডিয়েটের রেজাল্টটা ঝপ্ করে একেবারে থার্ড ডিভিসনে নেমে গিয়েছিল। ইণ্টারমিডিয়েটেও স্কলারশিপ পেয়েছিল সন্দীপ। আর থার্ড ইয়ারে উঠে দিনকতক ক্লাস করে পড়াই ছেড়ে দিয়েছিল অশোক।

পড়া ছাড়ার কথা প্রথম দিকে জানতে পারেনি সন্দীপ। মাস দুয়েকের মতো অশোককে ক্লাসে না দেখে একদিন ওদের বাড়ি চলে গিয়েছিল সে। একা একা অশোকদের বাড়ি সেই তার প্রথম যাওয়া।

বাইরে থেকে ডাকতেই মল্লিকা বেরিয়ে এসেছিল। ততদিনে অশোকদের বাড়িটার চেহারা কিছু বদলে গেছে। মেঝে পাকা হয়েছে, বাঁশের জায়গায় ইটের দেওয়াল উঠেছে।

মল্লিকা বলেছিল, 'দাদা তো বাড়ি নেই।'

'তা হলে আজ আমি যাই।'

'সে কি ! বন্ধু নেই বলে চলে যেতে হবে ? আমি তো আছি।'

সন্দীপ ইতস্তত করছিল।

মল্লিকা আবার বলেছিল, 'সেধে সেধে আর পারা যায় না। আসুন বলছি। দেখবেন, আমার সঙ্গে গল্প করতে খুব খারাপ লাগবে না।'

মল্লিকার বলার মধ্যে ঢেউয়ের মতো এমন কিছু ছিল যা সন্দীপকে চমকে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি মুখ তুলতেই সে অবাক। কি আশ্চর্য, চুলের ফাঁক দিয়ে চেয়ে-থাকা সেদিনের সেই কিশোরী মেয়েটাকে মল্লিকার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার সামনে কিছুটা চেনা, বেশিটা অচেনা এক যুবতী সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। এতকাল এ বাড়িতে আসছে যাচ্ছে কিন্তু কখন কোন্ ফাঁকে মল্লিকা এমন যুবতী এমন রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে, সন্দীপ লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ শীত লাগার মতো তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। এদিক সেদিক তাকিয়ে দুর্বল গলায় সন্দীপ বলেছিল, 'বাড়িতে আর কারোকে দেখছি না তো। মাসিমা কোথায় ?'

কেমন করে যেন হেসেছিল মল্লিকা, 'মা পাশের বাড়ি গেছে। ভয় নেই এক্ষুণি আসবে—'

একরকম জোর করেই মল্লিকা তাকে ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। বেতের মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'স্কলারশিপ পেয়ে আপনার খুব গর্ব হয়েছে। আজকাল আর আমাদের বাড়ি আসেনই না। রোজই ভাবি, আসবেন।'

'না, মানে অশোকের সঙ্গে দেখা হয় না কিনা। তাই—'

চোখের তারা স্থির করে সন্দীপের দিকে তাকিয়েছিল মল্লিকা, 'আপনি একেবারে নাবালক—'

বিমূঢ়ের মতো সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন ? কেন ?'

'দাদাকে ছাড়া এ বাড়িতে আসতে পারেন না।'

ধীরে ধীরে হকচকানো নার্ভাস ভাবটা কাটিয়ে উঠেছিল সন্দীপ। হেসে ফেলেছিল সে। তারপর একটু ভেবে বলেছিল, 'তুমি কী পড়ছ ?'

'আমার কি ভাগ্য, এতদিনে তবু খোঁজ নিলেন !'

'সত্যি খেয়াল ছিল না।'

মল্লিকা বলেছিল, 'নিজেকে ছাড়া আপনার কি কোন দিকে খেয়াল থাকে ?'

বাবাও এই কথাই বলত। সে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। খানিকটা আপসের স্বরে সন্দীপ বলেছিল, 'বেশ, অন্যায় হয়ে গেছে। এখন বল কী পড়ছ ?'

'এবার প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল দিয়েছি।'

'আরে তাই নাকি ?'

মল্লিকা কি বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় তার মা ফিরে এসেছিল। সন্দীপ-কে দেখে ভারি খুশী মহিলা ! বলেছিল, 'তুমি কেমন ছেলে বল তো ? এত দিন আমাদের ভুলে থাকতে হয় ?'

অপরিষ্কার গলায় কিছু একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছিল সন্দীপ ; সেটা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

অশোকের মা আবার বলেছিল, 'আমি তো ভেবেছিলাম আজ-কালের ভেতর তোমাদের বাড়ি যাব। তারপর বল, হঠাৎ কী মনে করে ? কিছু দরকার আছে ?'

'হ্যাঁ, দরকার একটু আছে। আমি অশোকের খোঁজে এসেছিলাম। অনেক-দিন কলেজেও যাচ্ছে না। কী ব্যাপার মাসিমা ?

অমন হাসিখুশি গোলগাল মহিলা, সবসময় যার চোখে আনন্দ ছলকাতে থাকে, হঠাৎ তার মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল। বিষণ্ন স্বরে বলেছিল, 'তিলু কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। আর পড়বে না।'

সন্দীপ চমকে উঠেছিল, 'কেন ?'

'কি সব পার্টি-টার্টি করছে। এই তো পনেরো দিন হল জলপাইগুড়ি গেছে, কবে ফিরবে ঠিক-ঠিকানা নেই।'

ঘরের ভেতরটা মুহূর্তে গুমোট হয়ে গিয়েছিল। অশোকের মা থামেনি, 'ওর ওপর কত আশা আমাদের। কিন্তু দেখ, কি ভাবে ছেলেটা আমাদের কষ্ট দিচ্ছে। তুমি তিলুকে একটু বুঝিয়ে বলবে বাবা ?'

'নিশ্চয়ই বলব। ' আমার সঙ্গে একবার দেখা হোক না।'

'ওর কাছে কিছুই চাই না সন্দীপ ; শুধু লেখাপড়াটা করুক।'

আরো কিছুক্ষণ কথা-টথা বলে চা আর নারকোল নাড়ু খেয়ে সন্দীপ উঠে পড়েছিল। মল্লিকা ও তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের রাস্তা পর্যন্ত এসেছিল।

রাস্তার কাছে এসে মল্লিকা বলেছিল, 'আবার আসবেন।'

সন্দীপ মাথা নেড়েছিল 'আসব।'

'তাড়াতাড়ি আসবেন। না এলে দেখবেন আমিই একদিন আপনাদের বাড়ি চলে গেছি।'

অসীম বিস্ময় নিয়ে সেদিন অশোকদের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিল সন্দীপ।

এই মেয়েটার ভেতর এতখানি চমক লুকিয়ে আছে, কে ভাবতে পেরেছিল। এতদিন অশোকদের বাড়ি এসেছে কিন্তু মল্লিকা এমন করে কোনদিন নিজেকে উন্মোচিত করেনি ; সে কি অশোক সামনে থাকত বলে ?

সন্দীপ কথা দিয়ে এসেছিল তাড়াতাড়ি একদিন অশোকদের বাড়ি যাবে। কী একটা ব্যাপারে আটকে যাওয়ায় যেতে পারেনি। হঠাৎ একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে সে অবাক, বড়দি আর মা'র সঙ্গে গল্প করছে মল্লিকা।

একপলক তার দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল সন্দীপ। কিছুক্ষণ পরে মল্লিকা তার কাছে এসেছিল। বলেছিল, 'দেখুন সত্যি সত্যিই এলাম।'

সন্দীপ হেসেছিল, 'কার সঙ্গে এসেছ ?'

'একলাই। আপনার মতো আমি নাবালিকা নাকি ?'

এরপর থেকে প্রায়ই আসতে লাগল মল্লিকা। সন্দীপও ওদের বাড়ি যেত। কখনো-সখনো অশোকের বাবা হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সেদিনটা আর মল্লিকার সঙ্গে গল্প করা হ'ত না। হেরম্ববাবু নিজের কাছে বসিয়ে সমানে বকবক করে যেত। তার বক্তব্যের প্রায় সবটুকু জুড়েই সেই বিজনেস লোনটার কথা। লোনটা তখনও পাওয়া যায়নি। সরকারী দপ্তরে হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি চলছিলই। এ-নিয়ে হেরম্ববাবুর মনে প্রচুর অসন্তোষ আর রাগ। মনোভাবটা গোপন রাখতেন না তিনি, প্রতিটি কথায় জ্বলন্ত বারুদের মতো আগুনের ফুলকি কাটতে কাটতে বেরিয়ে আসত।

হেরম্ববাবুর সঙ্গে তবু দেখা হ'ত কিন্তু অশোকের পাত্তাই পাওয়া যেত না। রাজনীতি তখন তাকে একেবারে হজম করে ফেলেছে। পার্টির কাজে প্রায়ই কলকাতার বাইরে বাইরে থাকতে হ'ত অশোককে। ক্বচিৎ কখনো দেখা হলে সন্দীপ বলত, 'এমন করে নিজের ক্ষতি করছ কেন ?'

অশোক হেসে হেসে বলত, 'ক্ষতি করছি, তোমায় কে বললে ?'

'রাজনীতি-টাজনীতি পরে কোরো, আগে পড়াশোনাটা শেষ করে নাও।'

'অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা আমার আর হবে না সন্দীপ। পলিটিক্স ছাড়া আজকাল আমি আর কিছু ভাবতেই পারি না।'

অশোক আর হেরম্ববাবুর সঙ্গে ক'দিন আর দেখা হ'ত, বেশির ভাগ দিনই মল্লিকা আর অশোকের মায়ের সঙ্গে গল্প করত সন্দীপ। অশোকের মায়ের আবার ঘর-সংসারের কাজ ছিল ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার সময় কোথায় তার ? অতএব মল্লিকাকে একলাই পাওয়া যেত।

মল্লিকাকে ঘিরে সেই দিনগুলো অদ্ভুত এক নেশার মতো লাগছিল। এতকাল নিজের সুখ আরাম স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া আর কিছুই ভাবত না সন্দীপ। নিজেকে নিয়ে একটা দুর্গে যেন বসে ছিল সে, মল্লিকাই প্রথম সেই দুর্গটার ভেতর থেকে তাকে কিছুদিনের জন্য হলেও বাইরে নিয়ে এসেছিল।

এর মধ্যে একদিন মল্লিকার রেজাল্ট বেরিয়ে গিয়েছিল—সেকেণ্ড ডিভিসনে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে সে। পাশ করেই কলেজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। কলেজে ভর্তি হবার পর সুবিধে হয়েছিল—ক্লাস পালিয়ে ছুট ছুট সন্দীপদের বাড়ি চলে আসত মল্লিকা।

সন্দীপ বলেছিল, 'এভাবে তুমি আমাদের বাড়ি চলে আসো, কি আমি তোমাদের বাড়ি যাই, এটা বোধ হয় ঠিক না।'

মল্লিকা হকচকিয়ে গিয়েছিল, 'কেন?'

'মনে হয় বাড়ির লোকেরা কিছু ভাবতে শুরু করেছে।'

'তা হলে?'

একটু ভেবে সন্দীপ বলেছিল, 'এখন থেকে আমরা বাইরে দেখা করব। আমাদের কলেজের উল্টোদিকের ফুটপাথে যে ট্রাম স্টপেজটা আছে তুমি সেখানে এসে দাঁড়াবে—আমি কলেজ থেকে চলে যাব।'

মল্লিকা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল, 'সেই ভাল।'

এরপর আগে থেকে সময় ঠিক করে দু'জনে ট্রাম স্টপেজে দেখা করত। সেখান থেকে কোনদিন চলে যেত ময়দানে, কোনদিন গঙ্গার পাড়ে, কোনদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। পয়সা-টয়সা জোটাতে পারলে এক আধদিন সিনেমাও দেখত।

মনে পড়ে একদিন ইডেন গার্ডেনে পা ছড়িয়ে বসে ঘাসের শিস ছিঁড়তে ছিঁড়তে মল্লিকা বলেছিল, 'একটা কথা বলব?'

'কী?' সন্দীপ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল।

এক পলক তার দিকে তাকিয়ে থেকে খুব দ্রুত মুখ নামিয়ে নিয়েছিল মল্লিকা। আঙুলের ফাঁকে আলতো করে ঘাসের শিস ঘোরাতে ঘোরাতে আধফোটা গলায় বলেছিল, 'আমার আর 'আপনি' করে বলতে ইচ্ছে করে না।'

চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল সন্দীপ—তার বুকের ভেতর আচমকা ঢেউ খেলে গিয়েছিল। আঙুলের ডগায় মল্লিকার চিবুকটা ঠেলে ওপর দিকে তুলতে তুলতে বলেছিল, 'কী বলতে ইচ্ছে করে?'

মল্লিকা চুপ।

সন্দীপ বলেছিল, 'এতই যখন ইচ্ছে তখন তুমি করেই বোলো।' বলেই চার-দিক দেখে টুক করে মল্লিকাকে চুমু খেয়েছিল।

সেই থেকে তুমি করেই বলত মল্লিকা। আশ্চর্য! এতকাল পরে আজ কলকাতায় এসে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে সন্দীপের, প্রায় অপরিচিতের মতো ব্যবহার করেছে মল্লিকা। সে তাকে আপনি করে বলেছে।

তারপর আরো দুটো বছর কেটে গেছে। এর ভেতরে সন্দীপ বি. এস-সি. পাশ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী যাবার সুযোগটা এসে গিয়েছিল। যাবার খরচ তো আর একটা-দুটো পয়সা না। দাদা কিছু টাকা যোগাড় করেছিল, বৌদি গা থেকে গয়নাগাটি খুলে দিয়েছিল। তারপরও দু-তিন হাজার টাকা কম পড়ে যাচ্ছিল।

সন্দীপের জার্মানী যাবার কথায় কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। সন্দীপের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না; অনেক দূরের এক দেশ এবং উচ্চাশা তখন তাকে অস্থির করে তুলেছে। সন্দীপ বলত 'বুঝলে, মাত্র ক'টা টাকার জন্যে আমার আর জার্মানী যাওয়া হ'ল না।'

রোজই চুপচাপ পলকহীন স্থির চোখে তাকিয়ে শুনে যেত মল্লিকা। একদিন সে বলেছিল, 'কত টাকা হলে তোমার যাওয়া হয়?'

'তুমি কোথায় টাকা পাবে?'

'ওটা কি আমার প্রশ্নের উত্তর হ'ল? বলো কত লাগবে?'

'দু-তিন হাজারের মতো।'

চার-পাঁচ দিন পর হঠাৎ হেরম্ববাবু সন্দীপদের বাড়ি এসে হাজির। সঙ্গে অশোকের মা। হেরম্ববাবু সেই প্রথম তাদের বাড়ি এসেছিল।

অশোকের মায়ের সঙ্গে বাড়ির সবার আলাপ ছিল, হেরম্ববাবুর সঙ্গেও হ'ল। খানিকক্ষণ এলোমেলো গল্পের পর ফতুয়ার পকেট থেকে তিনটি হাজার টাকা বার করে গুনে গুনে বাবার হাতে দিয়েছিল হেরম্ববাবু। হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আমার মেয়েকে তো চেনেন—আপনাদের বাড়ি প্রায়ই আসে। ক'দিন আগে মেয়ে কেঁদে পড়ল, সন্দীপকে জার্মান যাবার টাকা দিতে হবে। আমি তো বুঝলাম, ব্যাপারখানা কী। ভাগ্যি ভাল, বিজনেস লোনটা এই সময় পেয়ে গেলাম। টাকাটা ব্যবসাতে খাটাবো ভেবেছিলাম। তা না-হয় সন্দীপের ওপরেই লগ্নী করলাম; ব্যবসাদার মানুষ তো। জার্মান থেকে ফিরে এলে সন্দীপের সঙ্গে আমার মনুর কিন্তু বিয়ে দিতে হবে।'

সন্দীপের বাবা বিশেষ কিছু বলেনি। মা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। মনুকে কত দিন ধরে দেখছি, লক্ষ্মী মেয়ে। ও এলে আমার ঘর আলো হয়ে যাবে।'

আরো অনেকক্ষণ থেকে সন্দীপের মা-বাবাকে বেয়াই-বেয়ান ডেকে এবং মিষ্টি খেয়ে তবে উঠেছিল হেরম্ববাবুরা।

পরদিন মল্লিকার সঙ্গে দেখা। তার দুটো হাত ধরে গাঢ় আবেগের গলায় সন্দীপ বলেছিল, 'তোমার জন্যে আমার জার্মানী যাওয়া সম্ভব হ'ল।'

বিষণ্ণ স্বরে মল্লিকা বলেছিল, 'তুমি ফিরে আসবে তো ?'

'আর কারো জন্যে না হোক, তোমার জন্যে আমাকে ফিরে আসতেই হবে।'

কিন্তু তারপর ? অজস্র মদ, প্রচুর টাকা, অঢেল আরাম এবং ঝাঁক ঝাঁক বান্ধবী কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের ছ্যাৎস্টি ডার্টি দুর্গন্ধময় কলকাতার শহরতলীতে জবর-দখল কলোনির একটি মেয়েকে দ্রুত স্মৃতি থেকে মুছে দিয়েছিল।

কতক্ষণ পর কে জানে, সন্দীপের চোখ এক সময় আঠার মতো জুড়ে এল। তার স্নায়ু, তার ভাবনার শক্তি টুপ টুপ করে গাঢ় ঘুমের আরকে ডুবে যেতে লাগল।

পাঁচ

অনেকক্ষণ ধরে কেউ ডাকছিল। কণ্ঠস্বরটা প্রথমে ছিল আবছা-আবছা, তারপর ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে কানের পর্দায় ধাক্কা দিতে লাগল। চোখ মেলতেই সন্দীপ দেখতে পেল সকাল হয়ে গেছে। এক ঝলক ঝকঝকে ধারাল রোদ চোখে ছুরির মতো বিঁধে গেল। কিছুক্ষণ অন্ধ হয়ে থাকল সন্দীপ। তারপর আলোটা সয়ে এলে ইঁট-বার-করা দেওয়াল, এবড়ো-খেবড়ো মেঝে, কোণে কোণে ঝুল, ভাঙাচোরা ছাদ চোখে পড়ল। প্রথমটা সে বুঝতে পারল না, কোথায় আছে। পরক্ষণেই দেখতে পেল, পায়ের কাছে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে, হাতে চায়ের কাপ। সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে সব মনে পড়ে গেল।

চোখাচোখি হতেই ভীরু গলায় গৌরী বলল, 'মেজদা, তোমার চা—' বলতে বলতেই তার দৃষ্টি পড়ল হুইস্কির বোতলটার দিকে। তক্ষুণি গৌরীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

হাই তুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে জড়ানো গলায় সন্দীপ বলল, 'ওখানে ঐ টেবিলটার ওপর রাখ না—'

গৌরী উত্তর দিল না—কাঠ হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। গৌরীর সাড়াশব্দ না পেয়ে সন্দীপ ভাল করে তাকাল। দেখল, গৌরী ভীত বিস্ফারিত চোখে হুইস্কির বোতলটা দেখছে। কট করে জিভে একটা কামড় পড়ল যেন। এ হেঃ, কাল রাত্তিরে বোতলটা সরিয়ে রাখতে একেবারে ভুল হয়ে গেছে। মনে যাই থাক, খুব সহজভাবে সন্দীপ বলল, 'চায়ের কাপটা রাখ না টেবিলে—'

কাঁপা পায়ে এগিয়ে গিয়ে চায়ের কাপটা রাখল গৌরী, তারপর পিছু হেঁটে

হেঁটে হঠাৎ ছুট লাগাল। একটু পরে বাইরে গৌরী আর বাবার গলা শুনতে পাওয়া গেল। গৌরীর গলাটা নীচু বলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না। তবে বাবার গলা খুব স্পষ্ট। বাবা বলছিল, 'আরে বাপু, বিলেত-ফিলেত থাকলে একটু আধটু ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করতে হয়। এ-সব দোষের কিছু না। আজকাল তো কলকাতাতেই মদের বান ডেকে গেছে।'

সন্দীপ অবাক। মনে পড়ল, খুব ছেলেবেলায় একটা আধপোড়া বিড়ি তুলে টান লাগিয়েছিল বলে বাবা তাকে চ্যালা কাঠ দিয়ে বেদম পিটেছিল। আর ভট্‌চায্যি বংশের সুসন্তান হয়ে সেই বাবাই আজ কেমন জার্মানী-ফেরত ছেলের হুইস্কি-টানার ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ করে ফেলল!

গৌরী আবার কি একটা বলল। তারপরেই বাবার গলা কানে এল, 'সবে এসেছে, কিছুদিন থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

শুনতে শুনতে সন্দীপের ভুরু কুঁচকে গেল। ওল্ড ফেলা ভেবেছে কী? এখানে চিরকাল থাকতে এসেছে সন্দীপ? কথায় কথায় বুঝিয়ে দিতে হবে, খুব তাড়া-তাড়িই সে এ-দেশ থেকে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

চা খেয়ে আরো কিছুক্ষণ গড়াল সন্দীপ। তারপর হুইস্কির বোতলটা স্যুটকেশে পুরে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে ঘরের বাইরে এল। বারান্দার এক ধারে দাদার বাচ্চারা কাড়াকাড়ি মারামারি করে একবাটি মুড়ি খাচ্ছিল। দাঁত মাজতে মাজতে তাদের পাশ দিয়ে কুয়োতলায় চলে গেল সন্দীপ। একটু পরে মুখ ধুয়ে ফিরে আসতে আসতে ডানদিকের রান্নাঘরে তার নজর গেল। বড়দি আর বৌদি সেখানে কি সব করছে, খুব সম্ভব রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। একপলক তাদের দেখে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সন্দীপ। তারপর চটপট ট্রাউজার-ফাউজার বদলে, চুল আঁচড়ে, মুখে তেল-তেলে স্কিনটনিক লোশন মেখে সোজা মায়ের ঘরে চলে এল।

বাবা এখানেই আছে। মায়ের বুকের কাছটায় হট ওয়াটার বট্‌ল্ দিয়ে সেঁক দিচ্ছে। সন্দীপকে দেখে মা বলল, 'আয়। মুখ ধুয়েছিস?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল সন্দীপ। মা আবার বলল, 'জলখাবার খেয়েছিস?'

সন্দীপ চুপ করে রইল।

মা ব্যস্ত হয়ে উঠল। ক্ষীণ দুর্বল শরীরে যতটা সম্ভব চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'আলো আলো, পচাকে এখানে খাবার দিয়ে যা।'

একটু পরে বড় কাঁসার থালায় এক গোছা লুচি তরকারি আর হালুয়া এনে সন্দীপের হাতে দিল আলো। এই সব খাদ্যে ফুডভ্যালু কতখানি আছে, কে জানে। লুচি-টুচি দেখতে দেখতে বিদ্যুৎ-চমকের মতো দাদার বাচ্চাদের মারা-

মা'র করে মুড়ি খাবার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। দৃশ্যটা প্রাণপণে দূরে ঠেলে দিয়ে লুচি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে দিত লাগল সন্দীপ।

মা বলল, 'কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়েছিল তো বাবা?'

সন্দীপ ঘাড় কাত করল, অর্থাৎ ঘুম হয়েছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে সে খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। হুইস্কির কথাটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়িময় জানাজানি হয়ে গেছে। মা কি বাবা সে প্রসঙ্গ তুলতে পারে। পরক্ষণেই আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল তার। বাবার দিকে তাকিয়ে সন্দীপ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কাল মা'র মেডিক্যাল চেক-আপের কথা বলছিলে। রিপোর্টটা কবে পাওয়া যাবে?'

বাবা বলল, 'আজ কি কাল। মনু নিয়ে আসবে।'

'মনু কে?'

'মল্লিকা।'

জিভে যেন পিন ফুটল সন্দীপের। মল্লিকার আদর বা অবহেলার নাম যে মনু, সেই কথাটা এ ক'বছরে সে ভুলে গেল কেমন করে?

একটু চুপ। তারপর সন্দীপের গলার ভেতর থেকে আচমকা কেউ যেন বলিয়ে দিল, 'মল্লিকা এখানে প্রায়ই আসে না কি?'

বাবা বলল, 'রোজই আসে।'

মা বলল, 'মেয়েটা আমাদের জন্যে যে কত করে, বলে বোঝানো যায় না।'

মল্লিকা সম্বন্ধে অনেক কথা জানবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু সন্দীপ আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'কাল সন্ধ্যেবেলা বাড়ি এলাম, সবার সঙ্গে দেখা হ'ল—হারুটাই শুধু বাদ। সে কোথায় গেছে?'

'কোথায় যায়, তা কি বলে যায়? মাঝে মাঝেই দু-চারদিন করে কোন্ চুলোয় যে থেকে আসে। তার জন্যে চিন্তা নেই, হুট করে একসময় উদয় হবে'খন।'

মা নির্জীব গলায় সন্দীপকে বলল, 'রুগীর ঘরে আর বসে থাকতে হবে না। একটু ঘুরে-টুরে আয় বাবা।'

বাবা বলল, 'না না, এখন পচা বেরুবে না। আটটা নাগাদ আমার এক বন্ধু আসবে। পচার সঙ্গে কি কথা-টথা আছে।'

সন্দীপ বলল, 'তোমার কোন্ বন্ধু?'

'গিরিজাপতি—গিরিজাকে তো তুই চিনতিস?'

তা আর চিনত না? সন্দীপের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। বাবার বন্ধু ঐ লোকটা, গিরিজাপতি চাটুজ্যে কি কম শয়তান? ম্যাট্রিক পাশ করবার পর

সন্দীপকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবার জন্য সে-ই তো বাবাকে তাতিয়ে তুলেছিল। ইণ্টারমিডিয়েটের পর আবার একবার চাকরির ধুয়ো তুলেছিল। তারপর জার্মানী যাবার সময় বাবা যখন রাগে আক্ষেপে হাত-পা ছুঁড়ছিল তখন তাতে ধুনো ছিটিয়েছিল গিরিজাপতি। বাবাকে বুঝিয়েছিল, বিদেশে যেতে দিলে ছেলেকে চিরদিনের জন্য হারাবে। ছেলে গোল্লায় যাবে।

ঘরে বসে থাকতে থাকতেই গিরিজাপতি এসে পড়ল। পোশাক-টোশাক অবিকল বাবার মতো। দু'জনকে পাশাপাশি দেখলে মনে হবে একই ছাঁচের চন্দ্রপুলি। তবে বাবার চাইতে লোকটা বেশ ঢ্যাঙা। জিরাফের মতো লম্বা গলা, চৌকো মুখে গোল চোখ। মাথার সামনের দিকে টাক, পেছন থেকে চুল টেনে এনে টাকটা ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে।

মা'র স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করল গিরিজাপতি। তারপর বাবা তাকে আর সন্দীপকে নিয়ে সন্দীপের ঘরে গিয়ে বসল।

গিরিজাপতি অনেকটা তোশামোদের গলায় বলল, 'ক'দিন আগে ব্রজ বলছিল তুমি আসবে। ভেবেছিলাম, তোমার বাবার সঙ্গে এয়ারপোর্টে যাব। কিন্তু বাতের ব্যথাটা এমন চাগিয়ে উঠল যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলাম না।'

সন্দীপ চুপ করে রইল। লোকটার সঙ্গ তার অসহ্য লাগছে।

বাবা এই সময় বলল, 'তোমরা কথাবার্তা বল হে গিরিজা। আমি ও-ঘরে তোমার বৌদির কাছে যাই। সেঁক দিতে দিতে উঠে এসেছিলাম।'

গিরিজাপতি বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমি যাও।' বাবা চলে গেলে সন্দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তারপর বাবাজী, বল দিকি জার্মান দেশখানা কেমন দেখলে—'

সংক্ষেপে উত্তর দিল সন্দীপ, 'ঐ একরকম।'

কিন্তু ঐ-ভাবে উত্তর দিয়ে পার পাওয়া গেল না। গোপন সামরিক তথ্য আদায় করার মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জার্মানী সম্বন্ধে অনেক খবর যোগাড় করল গিরিজাপতি। তারপর বলল, 'তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি বাবাজী।'

'কী?'

'আমার সেজ ছেলে ন্যাপলাকে দেখেছ হয়তো। তুমি জার্মানী যাবার সময় খুব ছোট ছিল। আই. টি. আই. থেকে পাশ করে তিন বছর বসে আছে, চাকরি বাকরি পাচ্ছে না।' দম নিয়ে নিয়ে গিরিজাপতি বলতে লাগল, 'দেশটা অতি ছ্যাঁচড়া হয়ে উঠেছে। পপুলেসন হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। সেই তুলনায় কল-কারখানা বাড়ছে না। যেগুলো আছে ঝপাঝপ দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এ

দেশের আর ফিউচার নেই। তাই বলছিলাম কি বাবাজী, হ্যাপলাটা বেকার বসে বসে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাতদিন চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়, বোমাবাজি করে। শুনছি ওয়াগন ব্রেকারদের দলে নাম লেখাবে। তুমি যদি জার্মানীতে নিয়ে গিয়ে ওর হিল্লে করে দাও, আমি বেঁচে যাই।'

মনে মনে সন্দীপ উচ্চারণ করল, ব্লাডি বাগার। ভাবল বুড়োকে এক পাক মুরগী নাচিয়ে দেবে। বলল, 'বিদেশে গেলে ছেলে যে আপনার গোল্লায় যাবে।'

গিরিজাপতি হেসেই সারা, 'হ্যা-হ্যা, কী যে বল বাবাজী—'

সন্দীপ দুম করে বলে বসল, 'আপনার ছেলে মাল-টাল খেতে পারে?'

গিরিজাপতির হাসি থমকে গেল। চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'কী বলছ?'

সন্দীপ আবার বলল, 'মেয়ে বন্ধু জোটাবার ক্ষমতা আছে তো?'

হঠাৎ খাড়া উঠে দাঁড়াল গিরিজাপতি। তার চোখের ভেতর আগুন জ্বলছে। চাপা তীব্র গলায় সে বলল, 'কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয়, জানো না। ক'বছর বাইরে থেকে লায়েক হয়ে এসেছ হে ছোকরা, অ্যাঁ—'

'তা যা বলেছেন—'

গিরিজাপতি আর দাঁড়াল না। ওল্ড বাগার জাম্বো জেটের গতিতে বেরিয়ে মা'র ঘরের দিকে চলে গেল। একটু পর বাবা আর গিরিজাপতির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তারপরেই বোঝা গেল, গিরিজাপতি চলে যাচ্ছে।

গিরিজাপতি চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসে রইল সন্দীপ। তারপর বাইরের বারান্দায় এল।

এখন আর মা'র ঘরে যাবে না সে। বাবা ওখানে বসে আছে। গিরিজাপতির সঙ্গে ওভাবে কথা বলার জন্য বাবা হয়তো চটে-মটে গেছে। অন্যমনস্কের মতো কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল সন্দীপ। আলো আর বৌদি এখনও রান্নাঘরে, দাদার বাচ্চাগুলো নোংরা ঝুপসি বাগানে ছুটোপাটি করে বেড়াচ্ছে। এক সময় বারান্দা থেকে মা'র ঘরটা বাদ দিয়ে অন্য ঘরগুলোতে ঘুরে বেড়াতে লাগল সন্দীপ। ঘুরতে ঘুরতে মাঝখানের ঘরটায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একধারে কাঁড়ি কাঁড়ি রাজনীতির বই, প্যামফ্লেট, পত্র-পত্রিকা। তার পাশে ময়দা-আঠার হাঁড়ি, তুলি, কালির বোতল আর নানারকম স্লোগান-লেখা খবর-কাগজের স্তূপ। ঝুঁকে একটা প্যামফ্লেট তুলতে গিয়েই থেমে গেল। পেছন থেকে কেউ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ধোরো না, ধোরো না। বকবে।'

ঘুরে দাঁড়াতেই দাদার বড়ো ছেলেটাকে দেখতে পেল সন্দীপ। বাগান থেকে কখন উঠে এসেছে, কে জানে। সন্দীপ শুধলো, 'কে বকবে?'

'হারু কাকা।'

হারু তা হলে পলিটিক্স করছে। বাবা অবশ্য এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় বলেছিল, ঘোড়ার ঘাস কাটছে।

সন্দীপ বলল, 'তোমার নাম কী?'

'বালু।'

দাদার এই ছেলেটাকে কালও দেখেছে, আজও দেখছে। অথচ এই প্রথম তার সঙ্গে কথা বলল সন্দীপ। সে বলতে লাগল, 'কোন্ ক্লাশে পড়?'

'আমি পড়ি না। দাদু বলেছে তুমি এলে আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে।'

সন্দীপ চমকে উঠল। বাবা ভেবেছে কী? তাকে ফাঁদে ফেলবে? কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে একেবারে অন্য কথায় চলে গেল সে, 'বালু, মল্লিকাকে চেন?'

'হুঁ। মনু পিসিকে চিনব না কেন?' বালু বলতে লাগল, 'মনু পিসি কি ভাল, পুজোর সময় আমাদের জামা-প্যাণ্ট কিনে দেয়। কত খাবার নিয়ে আসে।'

'মনু পিসি রোজ আসে?'

'হুঁ, রোজ। মা কী বলে জানো? বলে মনু পিসি না থাকলে আমরা মরে যেতাম।'

কালকের মতো আজও দুপুরবেলা আলোই সন্দীপকে খেতে দিল, বৌদি এটা-সেটা হাতের কাছে যুগিয়ে সাহায্য করতে লাগল। বাবা-মা কালকের মতো কাছে বসে জোর করে খাওয়াতে লাগল।

খেতে খেতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'গৌরী আর রমাকে তো দেখছি না। ওরা কোথায়?

বাবা বলল, 'ডিউটিতে গেছে।'

'কিসের ডিউটি?'

'বিড়লাদের একটা ফ্যাক্টরি হয়েছে আমাদের এদিকে; ইলেক্ট্রিকের নানা-রকম পার্টস তৈরি হয়। গৌরী রমা ওখানেই কাজ করে।'

'ওরা চাকরি করছে কেন?'

'হেরো আর পটলা কিছুই করে না। এই বয়েসে আমাকেই বা কে চাকরি দেবে? ওরা কাজ না করলে ডান হাত মুখে তোলা কবে বন্ধ হয়ে যেত।'

সন্দীপ চুপ। নাঃ, যেখানে হাত দিচ্ছে সেখানেই একটা করে ঝঞ্ঝাট।

মা বলল, 'অনেক ধরাধরি করে রমা আর গৌরীকে ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে মনু। নইলে কী যে হত!'

আবার মল্লিকা! দেখা যাচ্ছে এ-সংসারের জীয়নকাঠি তারই হাতে। সন্দীপ এবারও কিছু বলল না।

ছয়

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর টানা একটা ঘুম লাগাল সন্দীপ। বিকেলে উঠে স্নান-টান করে জামা-জুতো পরে বাইরে বেরুতেই দেখা গেল বারান্দার দু-ধারে বৌদি আর বড়দি বিষণ্ণ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে। বৌদিকে দেখতে দেখতে দাদার আত্মহত্যার কথা মনে পড়ে গেল। অনেকখানি অপরাধ-বোধ নিয়ে সে এবার তাকাল বড়দির দিকে। আলোকে কোনদিন এভাবে বসে থাকতে দেখেনি সন্দীপ। মেয়েটা ছিল আনন্দের খনি। সারাদিন এর-ওর পেছনে লেগে, সবাইকে হাসিয়ে মাতিয়ে বাড়িময় হুল্লোড় বাধিয়ে রাখত। বড়দিকে দেখতে দেখতে ভীষণ রাগ হতে লাগল সন্দীপের। ডাইর্ভোস হয়ে গেছে তবু সেই শালা শুয়ারের বাচ্চাটার জন্য কপালে সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে রাখার কোন মানে হয়? সন্দীপ ভাবল, একদিন বড়ো জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করে ব্লাডি বাগারের ঘাড়ে দশ বারোটা লাথি কষিয়ে আসবে। ভাবনাটা সম্পূর্ণ হবার পর টকাটক সিঁড়ি বেয়ে বাগানে নেমে গেল সন্দীপ।

পেছন থেকে আলো ডাকল, 'বেরুচ্ছিস? চা খেয়ে যা।'

হাঁটতে হাঁটতে সন্দীপ বলল, 'ফিরে এসে খাব।'

সদর দরজায় এসে বাধা পড়ল। সন্দীপ দেখতে পেল, সাইকেল-রিক্শা থেকে মেজ জামাইবাবু আর মেজদি নামছে। তাকে দেখে মেজ জামাইবাবু হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, 'আরে শালাবাবু, তোমার জন্যে আমরা বরানগর থেকে পনেরো মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে আসছি। আর তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ!'

সন্দীপ বলল, 'না-না, এখন আর বেরুব না। আসুন।'

মেজদিটা এ ক'বছরে প্রচণ্ড মুটিয়েছে। নাক-মুখ-গলা এবং কোমরের রেখা-গুলো চর্বির তলায় ঢাকা পড়ে গেছে। জামাইবাবু আগের মতোই ভারী থলথলে আছে, চোখের তলায় তিনটে কাল্চে থাক। দৃষ্টি ঘোলাটে। সন্দীপ জানে, মার্চেণ্ট অফিসের হেড ক্লার্ক মেজ জামাইবাবু পাঁড় মাতাল। লোকটা আমুদে ধরনের। খাও-দাও এবং ফুর্তি করে দিন কাটিয়ে দাও—মেজ জামাইবাবুর জীবন-দর্শন মোটামুটি এইরকম। লোকটাকে ভালই লাগে সন্দীপের।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে মেজদিকে ঠাট্টা করল সন্দীপ, 'তুই একেবারে ফুটবল হয়ে উঠেছিস।'

মেজদি হাসল, 'যা বলেছিস ভাই। একটু হাঁটলেই আজকাল হাঁসফাঁস করি।'

বাড়িতে ঢুকে প্রথমে যাওয়া হ'ল মা'র ঘরে। তারপর বাইরে এসে বড়দি আর বৌদিকে টানাটানি করে এনে মেজ জামাইবাবু আসর জমিয়ে ফেলল। সন্দীপকে টোকা দিয়ে দিয়ে জার্মানীর প্রচুর গল্প শুনল, নিজেও মজার মজার অনেক গল্প বলল। কিছুক্ষণ আগে যে বৌদি আর বড়দি বিষাদের প্রতিমা হয়ে বসে ছিল, তারাও হাসতে লাগল।

তারপর সন্ধ্যে হলে বৌদি আর বড়দি রান্নাঘরে চলে গেল। মেজদিও ওদের সঙ্গে গেল। তখন মেজ জামাইবাবু বলল, 'চলো, তোমার ঘরে গিয়ে বসি।'

সন্দীপ বলল, 'চলুন।'

তার ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসল মেজ জামাইবাবু। চোখের তারা নাচিয়ে নাচিয়ে হেসে হেসে রগড়ের গলায় বলল, 'জার্মানীর অনেক কেচ্ছা তো শোনালে। এবার আসল খবরটা কও দিকি শালাবাবু। বলি জায়গাটা সুজলাং, না একেবারে মরুভূমির মতো ড্রাই হে?'

'মানে?'

'মানে মাল-ফাল পাওয়া যায়?'

সন্দীপ হেসে ফেলল, বলল, 'প্লেন্টি—প্রচুর।'

'বলি, ড্রিঙ্ক ধরেছিলে? না আগের মতো গুড বয় হয়ে ছিলে?'

'শুধু কি ড্রিঙ্ক জামাইবাবু, একটা দিনও বান্ধবী ছাড়া কাটাইনি। ড্রিঙ্ক আর গার্ল ফ্রেণ্ড ও-দেশের দস্তুর। এসব ছাড়া চলে না।'

লোভী বেড়ালের মতো চোখ চকচক করতে লাগল মেজ জামাইবাবুর। গলার ভেতর থেকে চাপা শিসের মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল। বলল, 'বেশ বেশ, রসে-বশেই ছিলে তা হলে? তা নিজে তো খুব মজা লুটেছ। আমাদের জন্যে কিছু পেসাদ-টেসাদ এনেছ?' দু-হাত দিয়ে বোতলের আকার দেখাল মেজ জামাইবাবু।

সন্দীপ বলল, 'একটা হুইস্কির বোতল এনেছি, কাল একটু খেয়েছিলাম—বাকিটা আছে।'

'অহো কী সুসংবাদ। দাঁড়াও দাঁড়াও, আসছি।' মেজ জামাইবাবু বাইরে বেরিয়ে গেল। আধঘণ্টা পর খানচারেক চিংড়ির কাটলেট, কাজুবাদাম আর দুটো কাঁচের গেলাস নিয়ে ফিরে এসে বলল, 'হুইস্কির জন্যে একটু অনুপান কিনে আনলাম।' একটা কথা মনে পড়তে আবার বলল, 'পূজ্যপাদ শ্বশুরমশায় আর

শাশুড়ি ঠাকরুণ রয়েছেন, দাঁড়াও দরজাটা বন্ধ করে আসি।'

দরজা বন্ধ করে জামাইবাবু বলল, 'এবার সাত রাজার ধন এক মাণিককে বার কর দিকি ব্রাদার-ইন-ল। ছাপোষা কেরাণী। সংসার চালিয়ে তো ভাল জিনিস খেতে পারি না। কালীমার্কা খেয়ে খেয়ে লিভারে কড়া পড়ে গেছে।'

সন্দীপ বোতলটা বার করতেই ছোঁ মেরে কেড়ে নিল মেজ জামাইবাবু। তারপর বোতলটা গালে ঘষতে ঘষতে বলতে লাগল, 'তোমার মেজদির গালের চাইতেও মোলায়েম।'

সন্দীপ বলল, 'কী অসভ্যতা হচ্ছে জামাইবাবু!'

হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বোতল খুলে গেলাসে ঢালতে লাগল মেজ জামাই-বাবু। খেতে খেতে বলল, 'অমৃত—স্বর্গের সুধা।'

সন্দীপ বলল, 'জানেন, হুইস্কি নিয়ে আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে।'

'কী?'

সকালবেলা হুইস্কির বোতল দেখে গৌরীর যা অবস্থা হয়েছিল আর বাবা যা যা মন্তব্য করেছিল, সব বলে গেল সন্দীপ। শুনে মেজ জামাইবাবু হেসে সারা।

কাল বিকেলে দমদমে নামার পর থেকে সন্দীপের ক্রমাগত মনে হচ্ছিল, দম বন্ধ হয়ে আসছে। মেজ জামাইবাবু গুমোট আবহাওয়ায় খানিকটা মৌসুমী বাতাস নিয়ে এসেছে যেন।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া করে মেজদি আর মেজ জামাইবাবু চলে গেল, যাবার সময় সন্দীপকে তাদের বাড়ি যাবার নেমন্তন্ন করল। ওরা গেলে সন্দীপ নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর তখনই মল্লিকার কথা মনে পড়ল তার। আজ সারাদিনে মেয়েটা একবারও আসেনি। অথচ সে নাকি রোজই এ বাড়িতে আসে।

সাত

পরের দিন সকালে গৌরীর বদলে আলো চা দিয়ে গেল। গৌরীর না আসার কারণটা আন্দাজ করে মনে মনে হেসে ফেলল সন্দীপ।

কাল ড্রিঙ্ক করার সময় যথেষ্ট সতর্ক ছিল সে। হুইস্কি শেষ করে বোতলটা আর বাইরে ফেলে রাখেনি—তক্ষুণি স্যুটকেশে পুরে ফেলেছিল। আজ নির্ভয়ে এ-ঘরে আসতে পারত গৌরী।

যাই হোক, চা শেষ করে দাঁত মাজতে মাজতে বাইরে এল সন্দীপ। অনেক বেলা হয়েছে, মে মাসের সূর্য এর মধ্যে গনগনে হয়ে উঠেছে।

বারান্দায় দাদার ছেলেমেয়ে এবং একটি অচেনা যুবককে দেখা গেল। আলো আর বৌদি যথারীতি রান্নাঘরে। সন্দীপকে দেখে যুবকটি উঠে এল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'মেজদা, আমি হারু।'

না বললে চিনতেই পারত না সন্দীপ, দশ বছরে কত বদলে গেছে হারু। একটুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সে। তারপরেই মনে পড়ল, এই হারু রাজনীতি করে অর্থাৎ কিছুই করে না; বাবার ভাষায় ঘোড়ার ঘাস কাটে। হঠাৎ খুব রাগ হ'ল সন্দীপের। বলল, 'পরশুদিন আমি এসেছি; আজ তোর দেখা পেলাম। এ-দু'দিন কোথায় ছিলি?'

'একটা কাজে কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম, কিছুক্ষণ আগে ফিরেছি।'

'শুনলাম তুই নাকি খুব পলিটিক্স করছিস?'

'খুব আর কোথায়, এই একটু আধটু।'

'পলিটিক্স না হয় না হ'ল; রোজগার কিছু করছিস?'

সোজা সন্দীপের চোখের দিকে তাকিয়ে হারু বলল, 'না।'

হঠাৎ মাথার ভেতর কী হয়ে গেল—সন্দীপ চিৎকার করে উঠল, 'কেন? হোয়াই?'

খুব শান্ত অথচ কঠিন গলায় হারু বলল, 'ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি, ঐ বিদ্যেয় চাকরি হয় না।'

'এইট পর্যন্ত পড়েছ কেন?'

আচমকা হারু চেঁচিয়ে উঠল, 'এই প্রশ্নটার উত্তর তো তোমার দেবার কথা।'

ওদের চেঁচামেচি শুনে মা-বাবা-বড়দি-বৌদি ছুটে বেরিয়ে এল। দাদার বাচ্চাগুলো ভয়ে কাঠ। সবাই উদ্বেগের গলায় বলতে লাগল, 'কী হয়েছে?'

কারো কথা শুনতে পাচ্ছিল না সন্দীপ। রাগে অন্ধ হয়ে সে বলতে লাগল, 'এইট পর্যন্ত কেন পড়েছিস, তার উত্তর আমাকে দিতে হবে? আমাকে?'

হারু বলল, 'নিশ্চয়ই। আমাদের ফ্যামিলিকে শুষে ঝাঁঝরা করে তুমি জার্মানী গেছ। কোনদিন ভেবে দেখেছ, তুমি কত স্বার্থপর—'

তার কথা শেষ হবার আগেই বাগানের ওদিক থেকে মল্লিকার গলা শোনা গেল, 'কী হচ্ছে হারু? দাদার সঙ্গে এভাবে কথা বলে? যাও এখান থেকে—' বলতে বলতে বারান্দায় উঠে এল সে।

মল্লিকার কণ্ঠস্বরে আদেশের মতো এমন কিছু ছিল, কঠিন এবং অনমনীয়, যা

অমান্য করা যায় না। একটি কথাও না বলে মাথা নীচু করে হারু চলে গেল। সন্ত্রস্তভাবে সবাই দাঁড়িয়ে ছিল। মল্লিকা সন্দীপের মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ কি কাকিমা, আপনার না বিছানা ছেড়ে ওঠা বারণ ! যান, যান। মেসোমশায় আপনিও যান।' বড়দি আর বৌদিকে বলল, 'আপনারাও আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।' ব্যাগ থেকে ক'টা লবঞ্চুস বার করে দাদার বাচ্চাগুলোকে দিল। বাচ্চা-গুলো ভয়ে দমবন্ধ করে ছিল যেন—এতক্ষণে তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

একধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্দীপের মনে হচ্ছিল, এ বাড়ির প্রতিটি মানুষ মল্লিকার কথায় ওঠে-বসে। মল্লিকার প্রবল এক ব্যক্তিত্ব অনুভব করতে পারছিল সে।

সবাই চলে গেলে মল্লিকা সন্দীপকে বলল, 'মুখ-টুখ ধুয়ে আপনি কাকিমার ঘরে আসুন। একটু দরকার আছে।' বলে সোজা মা'র ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর মা'র ঘরে আসতেই মল্লিকা বলল, 'কাকিমার মেডিকেল রিপোর্ট নিয়ে এসেছি।'

হারুর ব্যাপারটা নিয়ে মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে ছিল। মেডিকেল রিপোর্টের কথায় নার্ভাস হয়ে গেল সন্দীপ। কাঁপা গলায় বলল, 'কী রিপোর্ট দিয়েছে ?'

একটা ভাঁজ-করা কাগজ সন্দীপের হাতে দিতে দিতে মল্লিকা বলল, 'কাকিমাকে কয়েক দিনের ভেতর হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।'

রিপোর্টটা পড়তে পড়তে মাথা টলতে লাগল সন্দীপের। মা'র ক্যান্সার হয়েছে। বাবা এ-ঘরেই ছিল। সন্দীপ দেখতে পেল বাবার আটষট্টি বছরের ধূসর চোখ জলে ডুবে গেছে ; গলার কাছে দুটো শিরা সমানে লাফাচ্ছে। ঘন ঘন ঢোক গিলে কিছু একটা চাপতে চেষ্টা করছে বাবা।

মা একবার বাবার দিকে তাকাচ্ছে, একবার মল্লিকার দিকে। একবার সন্দীপের দিকে। আর ব্যাকুলভাবে বলছে, 'কী হয়েছে আমার ? কী হয়েছে ?'

মল্লিকা বলল, 'বিশেষ কিছুই না। দু-চারদিন হাসপাতালে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে।' বাবার দিকে ফিরে প্রায় ধমকই দিয়ে উঠল, 'আপনি ছেলেমানুষের মতো অবুঝ হবেন না কাকাবাবু, নিজেকে শক্ত করুন।' তারপর সন্দীপকে ডেকে বাইরে নিয়ে গেল।

সন্দীপ বলল, 'আমায় কিছু বলবে ?'

'হ্যাঁ। এখন আপনি বাড়ি থাকুন, কাকিমার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে সবাই কান্নাকাটি করবে—আপনি তাদের একটু সামলাবেন। আর সন্ধ্যেবেলা ছ'টা নাগাদ নিশ্চয়ই একবার হাজরা পার্কের গায়ে যে বাস স্ট্যাণ্ডটা আছে সেখানে অপেক্ষা করবেন। আমিও যাব। বিশেষ দরকার।'

'কী দরকার ?'

'তখনই জানতে পারবেন। এখন আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। চলি—' বড়ো বড়ো পা ফেলে মল্লিকা চলে গেল।

সন্দীপ এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর সোজা নিজের ঘরে চলে এল। কিছুক্ষণ পর বাড়িময় মড়াকান্না উঠল। মা'র ক্যান্সারের খবরটা এতক্ষণে বোধ হয় জানাজানি হয়ে গেছে।

বিকেলে হাজরা পার্কের বাস স্ট্যাণ্ডে আসতেই দেখা গেল, আগে থেকেই মল্লিকা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে মল্লিকা হাসল, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। ভেবেছিলাম, আপনি আর এলেন না।'

সন্দীপ উত্তর দিল না, একদৃষ্টে মল্লিকাকে দেখতে লাগল। মে মাসের শেষ বেলার আলো এসে পড়েছে তার রুক্ষ চুলে, চোখে-মুখে-কপালে, আধময়লা রঙীন শাড়িতে। অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল মেয়েটাকে।

অনেকক্ষণ পর সন্দীপ বলল, 'এখন কোত্থেকে এলে ? বাড়ি থেকে ?'

'না, অফিস থেকে আসছি।

'তুমি চাকরি কর নাকি ? কোথায় ?'

'মার্চেণ্ট অফিসে। চলুন হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।' মল্লিকা ফুটপাথ ধরে আশুতোষ কলেজের দিকে পা চালাল। সন্দীপও পাশাপাশি চলতে লাগল।

আশুতোষ কলেজের কাছাকাছি এসে উল্টোদিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল সন্দীপ, 'মনে আছে, কলেজে পড়বার সময় তুমি আমার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ?'

কৌতুকের গলায় মল্লিকা বলল, 'থাকতাম নাকি ?'

সন্দীপ আপন মনে বলে যেতে লাগল, 'ওখান থেকে কোনদিন আমরা যেতাম আউটরাম ঘাটে, কোনদিন গড়ের মাঠে, কোনদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। মনে পড়ে ?'

মল্লিকা হেসে বলল, 'কত বাজে কথা যে আপনার মনে থাকে।'

সন্দীপ থতিয়ে গেল। তবে কি দশ-বারো বছর আগের রঙীন দিনগুলো ভুলে গেছে মল্লিকা ? নাকি সে-সব দিনের স্মৃতিকে আর প্রশ্রয় দিতে চায় না ?

একটু চুপ করে থেকে আবেগহীন নীরস গলায় সন্দীপ বলল, 'কী একটা দরকারে যেন আমাকে এখানে আসতে বলেছিলে ?'

মল্লিকা বলল, 'আর একটু গেলেই জানতে পারবেন।'

আচমকা অন্য একটা কথা মনে পড়তে সন্দীপ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'পরশু-

দিন বলেছিলে আমার সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া আছে। কিসের বোঝাপড়া?'

'সেটা আজকে না, আরেক দিন হবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর অত্যন্ত রাগ আর ক্ষোভের গলায় সন্দীপ বলল, 'তখন হারু কিরকম করল দেখলে? এত ইনসোলেণ্ট হয়ে উঠেছে!'

হাল্কা গলায় মল্লিকা বলল, 'ছেলেমানুষ কী বলেছে, তা নিয়ে শুধু শুধু কষ্ট পাওয়ার কোন মানে হয় না।'

সন্দীপ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'চব্বিশ-পঁচিশ বছরের দামড়াকে তুমি ছেলেমানুষ বলছ! কত বড়ো হারামজাদা হয়েছে, মুখের ওপর বলে কিনা আমি স্বার্থপর। আমার জন্যে ফ্যামিলির সর্বনাশ হয়েছে।'

একপলক তাকিয়ে থেকে খুব শান্ত গলায় মল্লিকা বলল, 'হারু কি খুব একটা মিথ্যে বলেছে?'

সন্দীপ চমকে উঠল, তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর তার মুখে যোগাল না। এরপর নিঃশব্দে চলতে চলতে ট্রাম রাস্তা থেকে গলি, তস্য গলির ভেতর দিয়ে একটা ব্লাইণ্ড লেনে যে বাড়িটার সামনে এনে মল্লিকা তাকে দাঁড় করাল তার গায়ে নেম-প্লেটে লেখা রয়েছে—রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি. এ., বি. এল। প্লীডার।

রমেশবাবুকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। তার সঙ্গে সন্দীপের পরিচয় করিয়ে দিয়ে মল্লিকা বলল, 'ইনি পটলের কেসটা দেখছেন। পটল বেইল পায়নি। এ মাসের বাইশ তারিখে কেসের ডেট পড়েছে। উকিলবাবু আর তাঁর বাড়িটা চিনে রাখুন, ডেটের আগে আপনাকে আসতে হবে।'

সন্দীপের মনে পড়ল, এয়ারপোর্ট থেকে আসবার সময় বাবা পটলার কথা বলেছিল। পটলা নাকি পেটো ছুঁড়ে কাকে জখম করে জেল-হাজতে আছে। পেটো কথাটার মানে নাকি বোমা।

সন্দীপ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মল্লিকা উকিলবাবুকে বলল, 'ইনি পটলার মেজদা—অনেকদিন পর জার্মানী থেকে দেশে ফিরেছেন। এখন থেকে আমার বদলে উনিই কেসটার ব্যাপারে আপনার কাছে আসবেন।'

উকিলবাবু বলল, 'বেশ তো—'

উকিলের বাড়ি থেকে বেরুতেই সন্দীপ ক্ষেপে উঠল, 'এসবের মানে কী?'

মল্লিকা জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ সবের?'

'পটলার ব্যাপারে আমাকে জড়ালে কেন?'

'বা রে, কারোকে না কারোকে তো জড়াতেই হবে। আমি পরস্য পর, আমি কেন এসবের ভেতর থাকব?'

'তুমি না থাকতে চাও, থাকবে না। ধরো আমি যদি এখন জার্মানী থেকে না আসতাম কী হ'ত?'

'না এলে অন্য ব্যবস্থা হ'ত। কিন্তু এসে যখন পড়েছেন তখন এর মধ্যে না জড়িয়ে উপায় কী?'

'বাড়ি ফিরে দেখছি অন্যায় করে ফেলেছি।'

মল্লিকা উত্তর দিল না।

সন্দীপ একটু ভেবে বলল, 'সে যাক গে, তুমি না থাকতে চাও, বাবা তো আছে। বাবাকে উকিলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। বাবাই কেসটা দেখাশুনো করবে।'

মল্লিকা মাথা নাড়ল, 'না—'

'কেন?'

'কাকাবাবু পটলার ব্যাপারে থাকতে চান না।'

'চাক, না চাক, তাতে আমার কী? আমি এ-সব ঝামেলায় কিছুতেই থাকব না।'

'সেটা আপনি বুঝবেন। সংসারের কোন দায়িত্ব তো কোনোদিন পালন করেননি। পটলার ব্যাপারে না হয় একটু উপকার করলেনই।'

রাগে অন্ধকার দেখছিল সন্দীপ; মাথার ভেতরটা জ্বালা জ্বালা করছিল। কোন উত্তর দল না।

বড়ো রাস্তায় এসে মল্লিকা বলল, 'এখন বাড়ি ফিরবেন তো?'

ঘাড় গোঁজ করে সন্দীপ বলল, 'হ্যাঁ।'

বাসে উঠে দু'জনে পাশাপাশি বসল। কিছুক্ষণ বাইরের লোকজন, দোকান-বাজার দেখবার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মল্লিকা বলল, 'একটা কথা বলব?'

'কী?'

'আপনার দাদার বাচ্চাগুলোকে এখনও স্কুলে দেওয়া হয়নি।'

রূঢ় গলায় সন্দীপ বলল, 'তা আমি কী করব?'

সন্দীপের রূঢ়তা গায়ে মাখল না মল্লিকা! অনেকটা আপন মনে বলতে লাগল, 'ওদের বড়ো আশা আপনি এলে স্কুলে ভর্তি হবে। আপনি যখন এসেই পড়েছেন তখন ভর্তিটা করে দিন। বছরের সাড়ে চারটে মাস অবশ্য কেটে গেছে, তবে ধরাধরি করলে নিশ্চয়ই স্কুলে নিয়ে নেবে।'

এতলোক তার জন্য এত রকম ঝঞ্ঝাট নিয়ে বসে আছে, কে ভাবতে পেরেছিল। সন্দীপ উত্তর দিল না, তার মাথার ভেতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মল্লিকা ভেবেছে

কী? মাকড়সার জালের মতো অদ্ভুত এক জটিলতার মধ্যে তাকে আটকে ফেলবে? কিন্তু সেটি কিছুতেই হচ্ছে না, তার আগেই ফাঁদ কেটে পালাবে সে।

আট

আরো দুটো দিন কেটে গেল।

এর মধ্যে বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোয়নি সন্দীপ। দু-চারদিন কাটিয়েই এ-বাড়ির জীবনযাত্রার মোটামুটি একটা ছক ধরে ফেলেছে সে। সকাল বেলা উঠেই গৌরী আর রমা ফ্যাক্টরিতে চলে যায়। বৌদি এবং বড়দি গিয়ে ঢোকে রান্নাঘরে। সারাদিন কলের মতো সংসারের কাজই করে যায় ওরা—যেটুকু সময় ফাঁক পায় শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে এলোচুল নোংরা কাপড়ে চুপচাপ বসে থাকে। দাদার বাচ্চাগুলোর পড়াশোনা নেই, সমস্ত দিনই হয় খেলছে, নয়তো মারামারি হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে। বাবা বাজার করার সময়টুকু ছাড়া বাকি দিনটা মা'র ঘরেই থাকে।

হারু প্রায় সর্বক্ষণই বাইরে বাইরে কাটায়। কখন আসে কখন যায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। যেটুকু সময় বাড়ি থাকে, হয় পোস্টার লেখে নতুবা রাজনৈতিক বই-টই পড়ে। সেদিনের সেই ব্যাপারটার পর থেকে হারু সন্দীপের সঙ্গে কথা বলে না। বাড়িটাকে ঘিরে সবসময় বিষাদ আর হাতাশা।

মল্লিকাকে প্রায় রোজই এ-বাড়িতে আসতে দেখছে সন্দীপ। সে জানতে পেরেছে তার জার্মানী যাবার পর থেকে নিয়মিত এখানে আসছে মেয়েটা। মল্লিকা এলেই এ-বাড়ির চেহারা বদলে যায়। দাদার বাচ্চাগুলো তাকে ঘিরে তো নাচতেই থাকে। উদাসিনী বড়দি আর বৌদিকে ধমক-ধামক দিয়ে কাপড় বদলাতে পাঠায় মল্লিকা, তারপর নিজেই চিরুনি-ফিতে নিয়ে তাদের চুল বাঁধতে বসে যায়। চুল বাঁধার ফাঁকে-ফাঁকে মজার গল্প করে তাদের হাসাতে থাকে। বাবার কাছে কিছুতেই ওষুধ খেতে চায় না মা, কিন্তু মল্লিকাকে দেখলেই বাধ্য লক্ষ্মী মেয়ের মতো টুক করে ওষুধের পুরিয়া গলায় ঢেলে দেয়।

এ-বাড়িটার জন্য প্রতিদিনই যেন সঞ্জীবনী নিয়ে আসে মল্লিকা। আর সেটুকুর জোরে হতাশ ক্লান্ত বিষণ্ণ মানুষগুলো কোনরকমে টিকে আছে।

এ তো গেল বাড়ির কথা। ক'বছরে তাদের পাড়াটাও কত বদলে গেছে। সদর দরজার বাইরে পা রাখলেই দেখা যাবে সেই ছেলেগুলো রোয়াকে-রোয়াকে

বসে আছে। মোড়ের চায়ের দোকানগুলোও তাদের দখলে। অথচ দশ বছর আগে রোয়াকে বা রেস্টুরেন্টে বসে কমবয়েসী ছেলেদের আড্ডা দেবার রেওয়াজ ছিল না। রাজনৈতিক স্লোগানে-স্লোগানে সব বাড়ির দেওয়াল বোঝাই।

প্রায়ই রাত্রিবেলা বোমার শব্দে চারদিকের বাড়িঘর কাঁপতে থাকে। সন্দীপ হয়তো বাবাকে জিজ্ঞেস করে, 'এ-সব কী?'

বাবা বলে, 'পেটো ফাটাচ্ছে—'

'কারা?'

'মস্তানরা।'

'মস্তান কী?'

'মস্তান' শব্দটার অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দেয় বাবা।

কোনো কোনোদিন বোমা ফাটলে বাবা বলে, 'আজ বোধ হয় শরিকী সংঘর্ষ শুরু হ'ল।' সন্দীপের বিমূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে বাবাকে 'শরিকী লড়াইয়ের' ব্যাপারটাও ব্যাখ্যা করতে হয়।

এরই মধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে সন্দীপ। বাবা প্রায়ই তার কাছে ঘুর ঘুর করে কী বলতে চায়, কিন্তু ঠিক যেন সাহস পেয়ে ওঠে না। মা'র ঘরে গেলে অনেক ভণিতার পর মা বলে, 'সংসারের অবস্থা তো দেখছিস বাবা—'

সন্দীপ জড়ানো গলায় কিছু একটা উত্তর দেয়।

মা আবার বলে, 'সবাই তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তোর ওপর আমাদের বড়ো আশা।'

মা'র এই কথাগুলো মল্লিকার মুখে আগেই অন্যভাবে শুনেছে সন্দীপ। সে চুপ করে থাকে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা মা সোজাসুজিই বলল, 'একটা কথা বলব বাবা?' সন্দীপ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

মা বলল, 'তুই কি জার্মানের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এসেছিস?'

'চাকরি ছাড়ব কেন? এক মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি।'

একটু চুপ করে থেকে মা বলতে লাগল, 'আমি বলি কি, তুই ওখানকার চাকরিটা ছেড়ে এখানেই একটা দেখে নে—'

সন্দীপ চমকে উঠল, 'তার মানে?'

'চিরকাল তো বিদেশে পড়ে থাকা যাবে না। ঘরের ছেলে ঘরে আসতেই হবে। তাই বলছিলাম—'

সন্দীপ মনে মনে ভাবল, এখানে চাকরি নিলে তোমাদের সুবিধে হয় ঠিকই কিন্তু রাবণের গুষ্টিকে গেলাবার দায়িত্ব আমার নয়। তা'ছাড়া এই স্যাঁৎ-ডার্টি পরিবেশে আর কিছুদিন থাকলে মরেই যাব। মুখে অবশ্য বলল, 'দেখি—'

'আরেকটা কথা—'

'বল—'

'মনুর ব্যাপারে কী করবি ?'

সন্দীপ চুপ করে রইল।

মা বলতে লাগল, 'তোর জন্যে মেয়েটা কতকাল অপেক্ষা করে আছে বাবা। এ-ভালবাসা তো তুচ্ছ করবার জিনিস নয়। আমি বেশিদিন বাঁচব না। মরবার আগে তোদের বিয়েটা হলে শান্তি পেতাম।'

সন্দীপ এবারও উত্তর দিল না, খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

মা আবার বলল, 'মনুর মতো মেয়ে হয় না। আমাদের সংসারের জন্যে ও কী করেছে জানিস ?'

নিজের অজান্তেই সন্দীপ ফস করে বলে ফেলল, 'কী করেছে ?'

মা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই খুব কাছ থেকে মল্লিকার গলা শোনা গেল। কখন নিঃশব্দে এ-ঘরে এসেছে, কে জানে। বিব্রতভাবে মল্লিকা বলতে লাগল, 'না-না, আমি কিছুই করিনি। ও-সব কথা থাক কাকিমা। আপনি আজ কেমন আছেন তাই বলুন—'

মা বলল, 'ভালই তো'

'দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না'

মা হাসল, 'কী মনে হয় দেখে ?'

মল্লিকা বলল, 'খুব খারাপ।' একটু থেমে আবার বলল, 'আপনি যে কী—'

'কী আমি ?'

উত্তর না দিয়ে মল্লিকা বলতে লাগল, 'নিজের কষ্ট এত চেপে রাখতে পারেন। সহজে কোনদিন মুখ ফুটে বললেন না, আমার এই অসুবিধাটা হচ্ছে, এই যন্ত্রণাটা হচ্ছে—'

মা হাসতে লাগল।

মল্লিকা ধমকের গলায় বলল, 'হাসবেন না-তো ওরকম করে।'

'তোর কথা শুনে হাসি পায় যে। কষ্ট হলে কেউ চেপে রাখতে পারে ?'

মল্লিকা বলল, 'সেই নতুন ওষুধটা খেয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ—' মা মাথা নাড়ল।

কথায় কথায় সুকৌশলে অন্য দিকে চলে গেছে মল্লিকা। সন্দীপ লক্ষ্য করল, নিজের সম্বন্ধে মাকে একটা কথাও বলতে দিল না মেয়েটা।

আজই না, আগেও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে সন্দীপ। দশ বছর পর দেশে ফিরে প্রায় রোজই মল্লিকার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেনি মেয়েটা ; কেউ বলতে গেলেও থামিয়ে দিয়েছে। পুরনো দিনের কথা তুলে দু-একবার তার স্মৃতিকে উস্কে দিতে চেয়েছিল সন্দীপ, কিন্তু মল্লিকা এমন-ভাবে হেসেছে, এমন সব মন্তব্য করেছে যে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়নি। মল্লিকা তার সঙ্গে এক'দিনে কম কথা বলেনি, কিন্তু সব কথা থেকে সে নিজেকে বাদ দিয়ে রেখেছে। যা কিছু সে বলেছে সবই সন্দীপদের সংসারের কথা। মেরুদেশের সমুদ্রে বরফের পাহাড়ের মতো মল্লিকার মনের কিছুটা স্পষ্ট, অধিকাংশই গোপন।

নয়

আরো দু-একদিন পর এক সকালবেলায় মেজাজ খুব খারাপ লাগছিল সন্দীপের। প্রথম যেদিন সে দেশে ফিরল সেই দিনটা আর তার পরের দিন ছাড়া এক ফোঁটা হুইস্কি, রাম বা জিন পেটে পড়েনি। হুইস্কির একটা বোতল অবশ্য সে জার্মানী থেকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু শালা মেজো জামাইবাবুটার পেট না তো চৌবাচ্চা। বোতলটা একদিনেই সাবাড় করে গেছে।

মেজাজটাই শুধু খারাপ লাগছিল না, নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গও মনে হচ্ছিল সন্দীপের। মা'র ক্যান্সার, পটলার লক-আপে পড়ে থাকা, দাদার আত্মহত্যা, বড়দির ডাইভোর্স ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তাকে বিরক্ত ক্ষিপ্ত করে তুললেও, মনে মনে এই ভবিষ্যৎহীন হতাশ ডুবন্ত মানুষগুলোর অনেকখানি কাছাকাছি চলে এসেছিল সে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল ততই ঐ ঘটনাগুলোর চমক ফিকে হয়ে আসছিল।

বাড়ি-ভর্তি লোকজন গিসগিস করছে, তবু সন্দীপ একা। ওদের সঙ্গে কোনদিনই সে সুর মেলাতে পারেনি। দশ বছর পর জার্মানী থেকে ফিরে এসে তেমন চেষ্টা করতে যাওয়াও বৃথা। বরং তার আর ওদের মাঝখানে দূরত্বটা এ ক'বছরে আরো অনেক বেড়ে গেছে।

যাই হোক, সকাল বেলাতেই চান-টান সেরে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে

পড়ল সন্দীপ। খানিকটা ঘুরে-টুরে এলে যদি মেজাজ ভাল হয়।

সদরের বাইরে পা দিতেই সেই ছেলেগুলোকে দেখা গেল, সামনের দুটো রোয়াক দখল করে ওরা বসে আছে। তাকে দেখে ছেলেগুলো নীচু গলায় কিছু একটা মন্তব্য করল। কী বলল অবশ্য দূর থেকে বোঝা গেল না। তবে ওদের চাপা হাসি এবং উত্তেজনা দেখে মনে হ'ল বেশ রসালো রগরগে মন্তব্য।

ছেলেগুলোকে পেছনে রেখে সরু গলি থেকে অন্য একটা রাস্তায় এসে পড়ল সন্দীপ। অন্যমনস্কের মতো ভাবতে লাগল বেরিয়ে তো পড়া গেছে, এখন কোথায় যাওয়া যায়? আচমকা মল্লিকার মুখটা মনে পড়ে গেল। যাবে নাকি একবার নবপল্লীতে? তক্ষুণি ভেতরে ভেতরে কেমন যেন গুটিয়ে গেল সন্দীপ। ঠিক করল আজ থাক, আরেকদিন মল্লিকাদের বাড়ি যাওয়া যাবে।

এখন তবে কোথায় যাবে? সন্দীপ এক মুহূর্ত থমকে থেকে ভাবল পুরনো বন্ধুদের বাড়ি যাওয়া যেতে পারে। আট-দশ দিন হ'ল কলকাতায় এসেছে, ছেলেবেলার বন্ধুদের একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।

তাপস-বিমল-আনন্দ, ওরা এখন কোথায় আছে, কে জানে। আনন্দের বাড়িটা এ-পাড়াতেই। প্রথমে সেখানেই এল সন্দীপ।

আনন্দকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। খালি গা, লুঙ্গি পরা, ওদের পুরনো দোতলা বাড়ির সামনের রকে বসে ডাঁটি-ভাঙা কাপে চা খেতে-খেতে খবর-কাগজ পড়ছিল। ক'বছরে চেহারা থলথলে হয়ে গেছে। মুখ চাকার মতো গোল। তবু তাকে চেনা যাচ্ছিল। স্কুল কলেজে পড়বার সময় কি সুন্দর দেখতে ছিল আনন্দ। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ছিল—চুল উঠে উঠে মাথাটা এখন ফাঁকা মাঠ। গলার কাছে চামড়া ঝুলে পড়েছে—শালার গলকম্বল গজিয়ে গেল নাকি? ছেলেবেলার ঢুলু ঢুলু স্বপ্নালু চোখ—এখন গাঁজাখোরের চোখের মতো ঘোলাটে। ক'বছরে ব্যাটার হয়ে গেছে।

আনন্দও তাকে চিনতে পেরেছিল। অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে একটা মোড়া এনে বলল, 'বোসো ভাই, বোসো। তারপর কবে এলে?'

সন্দীপ অবাক, 'বাঃ বেশ—'

'কী হ'ল?'

'আমি তুমি হয়ে গেছি নাকি?'

'হাজার হোক জার্মানী-ফেরত লোক—ঝট করে তুই-টুই বলি কি করে?'

আনন্দ'র বিনয় এবং আপ্যায়নের ভঙ্গিটুকু ভালোই লাগল সন্দীপের। তার

কাঁধে একটা চাপড় বসিয়ে বলল, 'ব্লাডি বাগার, আমাকে 'তুই'ই বলবি। আমি না তোর ওল্ড ফ্রেণ্ড!'

অযাচিত বখশিস পাওয়ার মতো প্রথমটা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকল আনন্দ। তারপর খুশিতে ছেলেমানুষের মতো ফেটে পড়ল, 'পচা, তুই মাইরি সেইরকমই আছিস। জার্মানী তোর গায়ে দাঁত বসাতে পারেনি।'

দশ বছর পর মোটে একবার দেখেই আনন্দ ধরে ফেলেছে, সে বদলায়নি। ব্লাডি ফুল! যাই হোক সন্দীপ কিছু বলল না।

আনন্দ আবার বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে, বোস্ বোস্—' সন্দীপ বসলে বলল, 'ক'দিন আগে ফিরেছিস—বললি না তো?'

'সাত আট দিন হবে।'

'এতদিন এসেছিস; আর আজকে আমাদের বাড়ি আসার সময় হ'ল!'

'আসব আসব ভাবছিলাম—' সন্দীপ ডাহা মিথ্যে বলে গেল, 'নানারকম ঝঞ্ঝাটে আসতে পারছিলাম না।'

আনন্দ বলল 'তুই একটু বোস, আমি চা'র কথা বলে আসি।'

সন্দীপ বাধা দিতে গেল কিন্তু তার আগেই আবার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল আনন্দ। কিছুক্ষণ পর রোগা এ্যানিমিক চেহারার একটি মহিলা, একগাদা কাচ্চা-বাচ্চা এবং চা মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে ফিরে এল। মহিলাকে দেখিয়ে আনন্দ বলল, 'আয় আলাপ করিয়ে দিই—'

সন্দীপ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—'

আনন্দ বলল, 'এ আমার ওয়াইফ, এরা ছেলেমেয়ে।' স্ত্রীকে বলল, 'ও আমার বন্ধু সন্দীপ—একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। সন্দীপ দশ বছর জার্মানী ছিল, ক'দিন হ'ল ফিরেছে।'

আনন্দর স্ত্রী আর সন্দীপ হাত জোড় করে পরস্পরকে নমস্কার করল। সন্দীপ বলল, 'আপনাদের বিয়ের সময় আমি ক্যালকাটায় ছিলাম না। থাকলে আগেই আলাপ হয়ে যেত।'

আনন্দর বৌটা জড়সড় পুঁটুলির মতো। বিড়বিড় করে জড়ানো গলায় কি বলল বোঝা গেল না।

হ্যা হ্যা করে হেসে আনন্দ বলল, 'আমার ভাই পাঁচটা ছেলেমেয়ে। ন'বছরে এই প্রোডাকসান দিয়েছি।'

আনন্দর মুখ একেবারে পালিশ-করা, সেখানে কিছুই আটকায় না। স্কুলে থাকতেই এমন এমন সব সেক্সের গল্প করত যাতে কান গরম হয়ে উঠত। সন্দীপ

লক্ষ করল, আনন্দর বউ মুখ নীচু করে মরমে মরে যাচ্ছে।

সন্দীপ চাপা ধমকের গলায় বলল, 'এই, কী হচ্ছে!'

আনন্দ থামল না, 'তুই অনেককাল দেশ ছাড়া, তাই জানিস না। আমাদের দেশে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কর্তারা তিনটে পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছে। দো আউর তিন বচ্চে। কিন্তু তারপরেও দু-দুবার এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে গেল।'

আনন্দর বউ'র ঘাড় ভেঙে মাথাটা আরো নুয়ে পড়েছে। সন্দীপের করুণাই হ'ল। বলল, 'আপনি বোধহয় রান্নাবান্না করতে করতে উঠে এসেছেন—'

'হ্যাঁ—' আধফোটা কাঁপা গলায় উত্তর দিল আনন্দর বউ।

'আমি আনন্দর সঙ্গে গল্প করছি, আপনি ভেতরে যান।'

আনন্দর বউ যেন বেঁচে গেল। আবছা গলায় বলল, 'আপনি মিষ্টি-টিষ্টি খান, আমি যাচ্ছি।' সে চলে গেল, তার পিছু পিছু বাচ্চাগুলোও ছুটল।

ওরা বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হলে সন্দীপ বলল, 'তুই একটা যাচ্ছেতাই। ভদ্রমহিলাকে আমার সামনে ওরকম লজ্জা দেবার মানে হয়?'

আনন্দ হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল, 'ভদ্রমহিলা কোথায় পেলি? ও আমার বউ তো—'

'স্টুপিড বাগার, তোর বউ হতে পারে। আমার তো অচেনা—'

'তা বটে, তা বটে—' আনন্দ ঘাড় চুলকোতে লাগল, 'আমি শালা যেন কী, কিছুই খেয়াল থাকে না।'

একটু ভেবে আনন্দ আবার বলল, 'বউ-টউর কথা থাক। এখন তোর খবর বল্—

'কী খবর জানতে চাস?'

'জার্মানীতে কী করিস?

'চাকরি।'

'মাইনে-টাইনে কি রকম?

সন্দীপ বলল, 'ইণ্ডিয়ান কারেন্সিতে হাজার চারেকের মতো।'

আনন্দ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'মাসে মাসে?'

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ—' সন্দীপ হেসে ফেলল।

বিস্ময়টা থিতিয়ে এলে আনন্দ আবার জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ে-টিয়ে করেছিস?'

'না।'

'সে কি! এত ভাল চাকরি করছিস, এখনও বিয়ে করিসনি!'

সন্দীপ একবার ভাবল, বলে, বিয়ের দরকারটা কী। জার্মান ছুঁড়িদের শরীর

থেকে বিয়ের ক্ষতিপূরণটা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনাই তো উশুল করে নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি ভেবে কথাটা আর বলল না।

আনন্দ থামেনি, 'এবার চটপট বিয়েটা সেরে ফ্যাল। আমরা কব্জি ডুবিয়ে একটা নেমতন্ন খাই। অনেকদিন শালা ভাল খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে না।'

'দেখা যাক—'

'বয়েস হচ্ছে, পরে কিন্তু কনে পাবি না।'

দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে রগড়ের গলায় সন্দীপ বলল, 'দারুণ দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে তা'হলে—'

এরপর কথায় কথায় অন্য বন্ধুদের প্রসঙ্গ উঠল। সন্দীপ বলল, 'বিমলের খবর কী ?'

'কোন্ বিমল ? সেই যে ব্যাটা চালিয়াত—সেভেন-এইটে পড়বার সময় বগলে মোটা মোটা ইংরিজি বই নিয়ে ঘুরত ?'

'হ্যাঁ—'

'তার কথা তোর এখনও মনে আছে ?'

'নিশ্চয়ই আছে। কারো কথাই ভুলিনি—'

আনন্দ বলল, 'বিমল একটা কেব্‌ল্ ফ্যাক্টরিতে মোটা মাইনের চাকরি বাগিয়ে হায়দ্রাবাদ আছে। ব্যাটা হামবাগ, এক নম্বরের হারামজাদা—'

সন্দীপ বলল, 'ও কি রে, শুধু শুধু গালাগাল দিচ্ছিস কেন ?'

'গালাগাল দেব না তো কি শালাকে মাথায় তুলে নাচব ! পুরনো বন্ধুদের তো আজকাল চিনতেই পারে না। এই তো লাস্ট মান্‌থে এসেছিল—পার্ক স্ট্রীটের কাছে দেখা, মাল টানবার জন্যে বারে ঢুকছে। আমি ওদিক দিয়ে আসছিলাম। কথা বললে না, এ্যাভয়েড করে গেল।'

'তাই নাকি ? হয়তো তোকে দেখতে পায়নি।'

'কি বলছিস, দেখতে পায়নি ! পরিষ্কার চোখাচোখি হ'ল। ব্যাপারটা কী জানিস ?'

'কী ?'

'ভাল মাইনে পায় কি না—অফিস থেকে গাড়ি আর কোয়ার্টার পেয়েছে। ভেবেছে লাটের বাচ্চা বনে গেছে। আরে ওরকম মাইনে অনেকেই পায়। হুঁ' —নাক কুঁচকে যেতে লাগল আনন্দর।

বিমলটা ছেলেবেলা থেকে চালিয়াত হামবাগ ঠিকই। তবু সন্দীপ বুঝতে পারল, ওর মোটা মাইনে, ফ্ল্যাট, গাড়ি—এ-সবই কাল হয়েছে। ভাল করে

তাকিয়ে দেখল আনন্দর চোখ-মুখ হিংসেয় পুড়ে যাচ্ছে যেন। সে বলল, 'বিমলের কথা থাক, ললিত এখন কোথায় ?

'লণ্ডনে—'

'লণ্ডনে কেন ?'

'জার্নালিজমে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ বাগিয়েছে যে—'

'ও, জানতাম না তো। কদ্দিন আছে লণ্ডনে ?'

'বছর চারেক—'

'আমাদের বন্ধুদের ভেতর অনেকই শাইন করেছে দেখছি।'

সন্দীপের কথা যেন শুনতে পেল না আনন্দ। নিজের মনে বলতে লাগল, কি ভাবে স্কলারশিপটা বাগিয়েছে জানিস ?'

'কি ভাবে ?' সন্দীপ তাকাল।

জরুরী গোপন খবর দেবার মতো সন্দীপের কানের কাছে মুখ এনে আনন্দ ফিসফিস করল, 'পেছনে মামা আছে যে—'

'মামা !'

'ইয়েস মামা। একেবারে আগমার্কা সাচ্চা মামা—মা'র নিজের ভাই—'

অবাক হয়ে সন্দীপ বলল, 'ললিতের মামা কী করেছে ?'

'আরে বাবা—' আনন্দ বলতে লাগল, 'সে-ই তো সব করেছে। ললিতের মামা দিল্লীর ফরেন মিনিস্ট্রিতে বিরাট চাকরি করে। ডেপুটি সেক্রেটারি-টেক্রেটারি কি একটা হবে। সে-ই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

সন্দীপ চুপ করে থাকল।

আনন্দ বলতে লাগল. 'দেশটা একেবারে লঝ্ঝড় হয়ে গেছে, বুঝলি সন্দীপ—'

সন্দীপ বুঝতে পারল না, আনন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আনন্দ থামেনি, 'এখানে কিছু বাগাতে হলে একটা মামা কি জামাইবাবু থাকা চাই, নইলে এইটে—' বলে দু'হাতের বুড়ো আঙুল নাচাতে লাগল।

'তাই নাকি ?' সন্দীপ হাসল।

'দু-দিন থাক, আমার কথা বিশ্বাস হবে।'

একটু ভেবে সন্দীপ বলল, 'তাপসদের কী খবর রে ?'

আনন্দ বলল, 'ওরা এখন বিগ পিপল্ বাবা—একেবারে অন্য ওয়ার্ল্ডের বাসিন্দা হয়ে গেছে। দেখলে চিনতেই পারবি না।'

সন্দীপ ঠিক বুঝতে পারছিল না। বলল, 'ব্যাপারটা কি রে ?'

আনন্দ বুঝিয়ে দিল, 'তাপসের বাবা জিঙ্কের ইমপোর্ট লাইসেন্স পেয়ে এখন

মালটি মিলিওনেয়ার। টিকটিকি ফুলে একেবারে ডাইনোসেরাস হয়ে গেছে।'

'বলিস কি রে?'

আনন্দ উত্তর দিল না, তার চোখ ঝকঝক করতে লাগল। ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছে আনন্দ।

একটু পর আনন্দ বলল, 'এখানেও সেই মামার ব্যাপার।'

'কি রকম?'

'তাপসদের কে এক আত্মীয় আছে, দিল্লীতে তার দারুণ হোল্ড। মন্ত্রী-টন্ত্রীদের শোবার ঘরে পর্যন্ত হুট-হাট ঢুকে পড়তে পারে। তাকে ধরে, বুঝতেই পারছিস, তার যত ভাই-ভাগ্নে-শালা, লতায়-পাতায় যত আত্মীয়—সবার কপাল খুলে গেছে।'

'তাপসরা এ-পাড়াতেই আছে?'

'নাঃ, দশ বছর জার্মানীতে থেকেও তোর কিচ্ছু হ'ল না পচা—'

সন্দীপ হকচকিয়ে গেল, তার মানে?'

আনন্দ দিব্যজ্ঞান দেবার মতো করে বলল, 'আরে বাবা, যাদের হাতে টন্‌স্ অফ মানি, তারা কি আর এই এঁদো পাড়ায় পড়ে থাকে?'

'তবে গেছে কোথায় ওরা?'

'যোধপুর পার্কে বাড়ি করে উঠে গেছে। ওদের বাড়ি দেখলে তোর চোখ স্রেফ লাড্ডু পাকিয়ে যাবে।'

'তোর সঙ্গে দেখা-টেখা হয় তাদের?'

'প্রায়ই। আমাদের অফিসে পেমেণ্টের জন্যে আসে।'

সন্দীপ চুপ করে রইল।

আনন্দ হঠাৎ আবার বলল, 'সবাই চেঞ্জ করেছে কিন্তু অশোকটা সেই রকমই আছে।'

'কোন্ অশোক?' সন্দীপ চমকে উঠল

'অশোককেই চিনতে পারছিস না! বাঃ—' আনন্দ দু'হাতের তালু চিত করে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। গলা নামিয়ে ফিস ফিস করল, 'ওর বোনের সঙ্গে এত লদগা-লদগি করেছিস কলেজে পড়বার সময়, আর তাকেই ভুলে গেলি! জার্মানীর মহিমা আছে মাইরি!'

সন্দীপের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। বিব্রতভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে—ঠিক সেইসময় থানার সাইরেন বেজে উঠল। অর্থাৎ ন'টা বাজে। তখুনি চঞ্চল হয়ে উঠল আনন্দ, 'এতদিন পর তোর সঙ্গে দেখা, একদম ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু ভাই অফিসে একটা দারুণ জরুরী কাজ পড়ে আছে, যেতেই হবে।'

সন্দীপ উঠে দাঁড়াল, নিশ্চয়ই যাবি।'

'কিছু মনে করিস না ভাই।'

'আরে না-না—'

'আবার আসিস—'

'আসব। সময়-টময় পেলে তুইও যাস আমাদের বাড়ি।'

'যাব।'

দশ

আনন্দদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এসপ্ল্যানেডে এল সন্দীপ। নেতাজীর স্ট্যাচুটা ডাইনে রেখে রাজভবনের কাছে এসে নেমে পড়ল। সামনেই কার্জন পার্ক। তাদের ছেলেবেলায় পার্কটার কি গ্ল্যামার ছিল। কলেজ-লাইফে কতদিন মল্লিকাকে নিয়ে ওখানকার ছায়াচ্ছন্ন ঝোপ-ঝাড়ে এসে বসেছে। কাছাকাছি গাছের ডালগুলোতে টুই-টুই করে পাখি নেচেছে। আর মশলামুড়ি খেতে খেতে কিংবা চিনাবাদামের খোলা ভাঙতে ভাঙতে সমানে প্রলাপ বকে গেছে দু'জনে।

ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে রাজভবনের ফুটপাতে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সন্দীপ। তারপরেই অদৃশ্য আকর্ষণ এক টানে তাকে পার্কটার দিকে নিয়ে গেল। উত্তর-পশ্চিমের গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সন্দীপ। দু'ধারে সেই কাঁটাওলা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ক্যাকটাসের ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোর গোড়ায় অসংখ্য গর্ত। কয়েক ডজন মোটা মোটা স্বাস্থ্যবান ইঁদুর নির্ভয়ে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা ছোলা-বাদামওলা উনুন ধরিয়ে বালির খোলায় বাদাম ভাজছিল। ইঁদুরগুলো যেন তার কতকালের বন্ধু। বাদামওলার গা বেয়ে বেয়ে কাঁধে ঘাড়ে চড়ে তারা নাচানাচি করছিল।

উৎসাহী দর্শকের অভাব নেই। একগাদা লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইঁদুরদের লাফালাফি ছুটোছুটি দেখছিল। কেউ কেউ বাদাম-টাদাম কিনে ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

দশ বছর আগে এই ইঁদুরগুলো ছিল কিনা, সন্দীপ মনে করতে পারল না। যাই হোক, ইঁদুর দেখল সে, এক ঠোঙা ছোলা কিনে নিজের হাতে ওদের খাওয়াল। তারপর এলোমেলো পায়ে এগিয়ে চলল।

কিন্তু এ কি! পার্কটা কেটে-কুটে খুঁড়ে-মুড়ে কী দাঁড় করিয়েছে! আধখানারও

বেশি জুড়ে ট্রাম লাইন পাতা হয়েছে। ফুলের বাগান করবার জন্য রেলিং-ঘেরা যে আইল্যাণ্ডগুলো রয়েছে তার গা থেকে মলমূত্রের দুর্গন্ধ উঠে আসছিল। প্যাণ্টপরা ক'টি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিল, এধারের বেঞ্চে একটা লোক প্রায় কোমর পর্যন্ত কাপড় তুলে ঘস ঘস করে উরু চুলকোচ্ছে। সন্দীপ ঘুরে ঘুরে দেখল, এত সুন্দর পার্কটা এ-ক'বছরে একটা বিশাল প্রস্রাবাগারে পরিণত হয়েছে। সামান্য একটু সৌন্দর্যবোধও কি থাকতে নেই? সিভিক সেন্সটুকুও কি এ-শহর থেকে বিদায় নিয়েছে? নাকি অভাব-হতাশা-ফ্রাসট্রেসন, সব একাকার হয়ে এ-শহর একেবারে বিষাক্ত হয়ে গেছে। কলকাতা যেন এক রুগ্ন বিরক্ত অসুস্থ মেণ্টাল পেসেণ্ট। হঠাৎ নিজের মধ্যে অত্যন্ত ক্রোধ অনুভব করতে লাগল সন্দীপ।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মা'র কথাটা মনে পড়ে গেল। মা বলেছিল, এখানেই একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিতে।

সন্দীপ ভাবল, দেখাই যাক না এ-দেশে চাকরির বাজারে তার দর কতখানি। এতে খানিকটা সময়ও কাটবে।

ট্যাক্সির জন্য সন্দীপ চৌরঙ্গীতে এল। কিন্তু এখানে হাঁটবার উপায় আছে? ফুটপাথগুলো হকারদের দখলে, চারদিকে হাট বসে গেছে যেন। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে লক্ষ লোকের জনতা বিপজ্জনকভাবে হাজার হাজার বাস-লরী-প্রাইভেট কারের ফাঁকে ফাঁকে হাঁটছে। যখন তখন এ্যাকসিডেণ্ট ঘটে যেতে পারে—সন্দীপের গা সিরসির করতে লাগল। সে কিন্তু রাস্তায় নেমে ভিড়ের ভেতর মিশে যেতে পারল না। অনভ্যাস আর কি। সন্দীপের মনে হতে লাগল, বিশ বছর এখানে থাকলেও সে ওই রকম নিশ্চিন্তে গা ভাসিয়ে দিতে পারবে না।

যাই হোক এই পীক আওয়ারে ট্যাক্সির আশা নেই। ট্রাম-বাসগুলোর দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস আটকে আসতে লাগল সন্দীপের। ভেতরে দমবন্ধ ভিড় তো রয়েছেই। গাড়িগুলোর পেছনে, ফুটবোর্ডে, চাকার ওপর ভয়াবহভাবে লোক ঝুলছে। জীবনের দাম এখানে দশ বছরে ঝপ করে অনেক নেমে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেড থেকে সোজা ডালহৌসির অফিসপাড়ায় চলে এল সন্দীপ। তার চোখে পড়ল কোনো অফিসের সামনে বিক্ষোভ চলছে, কোথাও ত্রিপল খাটিয়ে কর্মীরা ধর্মঘট করে বসে আছে, কোথাও বা ক্লোজারের নোটিশ টাঙানো।

তারই মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম দেখে দেখে ভেতরে ঢুকে পড়তে লাগল সন্দীপ। প্রথম দুটো কোম্পানি জানিয়ে দিল, তাদের কোন ভ্যাকান্সি নেই।

তৃতীয় অফিসে এসে পার্সোনেল ম্যানেজারের মুখোমুখি বসে নিজের কোয়ালি-ফিকেশন আর এক্সপিরিয়েন্স বলতেই ভদ্রলোক প্রায় আঁতকে উঠল, 'আপনি কি জার্মানীর চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এসেছেন ?'

সন্দীপ বলল, 'না। এখনও ছাড়িনি—'

'কক্ষনো এ ভুল করবেন না মিস্টার ভট্টাচারিয়া। ইণ্ডিয়ায় এমপ্লয়মেণ্টের কোন রকম স্কোপ নেই। যেখানে আছেন সেখানেই ফিরে যান। দেশে এসে কোন লাভ নেই।'

সন্দীপ চুপ করে থাকল।

পার্সোনেল ম্যানেজার আবার বলল, 'আপনি কতদিন ইণ্ডিয়ায় ছিলেন না ?'

'দশ বছর।'

'তাই জানেন না এখানকার অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে।'

'কী দাঁড়িয়েছে ?'

'সব ভালো ভালো ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে চাকরি না পেয়ে ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এরকম ব্রেন-ড্রেন ওয়ার্ল্ডের আর কোন কাণ্ট্রিতে হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।'

শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিল সন্দীপ, কিছুটা নার্ভাসও। বলল, 'ও, তাই নাকি ?'

ম্যানেজার বলল, 'কেন, ওদেশে থাকতে কিছু শোনেননি ?'

'অল্প অল্প কানে এসেছে। কিন্তু অবস্থা যে এত ডিপ্লোরেবল, ভাবতেই পারিনি।'

একটু চুপ। তারপর ম্যানেজার আবার বলল, 'আপনাকে বন্ধু হিসেবে ধরতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তা'হলে একটা কথা বলি ; জার্মানীর চাকরিটা অনুগ্রহ করে ছাড়বেন না। ছাড়লে কিন্তু পরে আপসোস করতে হবে।'

'ধন্যবাদ—'

আরেকটা অফিসে আসতে সেখানকার জেনারেল ম্যানেজার বলল, 'কিছু মনে করবেন না মিস্টার ভট্টাচারিয়া—আপনি ওখানে কিরকম স্যালারি ড্র করতেন ?'

'ইণ্ডিয়ান কারেন্সিতে চার হাজারের মতো। সেই সঙ্গে অন্য ফেসিলিটিজ। যেমন ফ্ল্যাট, কার—এই সব—'

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে খুব কুণ্ঠিতভাবে ম্যানেজার বলল, 'আমাদের এখানে সামান্য একটা ভ্যাকান্সি আছে, মাত্র সাড়ে চার'শ টাকা মাইনে—'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' সন্দীপ উঠে পড়ল।

এগারো

অফিসে অফিসে ঘুরতে ঘুরতে লাঞ্চটাইম হয়ে গেল। সন্দীপ ভাবল এখন আর বাড়ি ফিরবে না ; পার্ক স্ট্রীটের ওদিকে গিয়ে একটা ভাল রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেবে। রাস্তা থেকে হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সি ধরল সে।

পার্ক স্ট্রীটে এসে একটা এয়ার-কণ্ডিসাণ্ড রেস্তোরাঁয় ঢুকল সন্দীপ। এটা শুধু রেস্তোরাঁ না, বার-কাম-রেস্তোরাঁ। দশ বছর আগে কলকাতার এই স্মার্ট ঝকঝকে পাড়ায় আসতে সন্দীপের পা কাঁপত। এ-জাতীয় বারে-টারে ঢোকার কথা ভাবতেও পারত না। আজ কিন্তু অনায়াসেই ঢুকে পড়তে পারল।

কোণের দিকে একটা টেব্‌লে বসে ওয়েটারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সন্দীপ। এই লাঞ্চ-টাইমে রেস্তোরাঁটা বোঝাই—ওয়েটারগুলো এ টেব্‌ল সে টেব্‌ল ছোটাছুটি করছে।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে টোকা পড়তে চমকে ঘুরে বসল সন্দীপ। তারই বয়েসী সুদর্শন চেহারার এক যুবক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে দামী বুশ শার্ট আর ট্রাউজার্স। চোখাচোখি হতেই যুবকটি উল্লাসের গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যালো গায়, চিনতে পারছিস ?'

সন্দীপ চিনতে পারল না, বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল।

যুবকটি আবার বলল, 'তুই সন্দীপ নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ—'

'আমি কে বল্ তো ?'

স্মৃতি তোলপাড় করেও এ-রকম একটা মুখ কিছুতেই খুঁজে পেল না সন্দীপ, সে তাকিয়েই থাকল।

যুবকটি মিটিমিটি হাসছিল। বলল, 'আমি তাপস রে—দ্যাট গ্রেট হারামজাদা তাপস—'

'তুই তাপস !' সন্দীপের গলার ভেতর থেকে বিস্ময় এবং খুশি লাফ দিয়ে উঠে এল যেন। তারপরেই সে উঠে দাঁড়াল, তাপসের একটা হাত নিজের মুঠোর

ভেতর নিয়ে বলল, 'আমি ভাই তোকে চিনতেই পারিনি—'

'তা কেন চিনবে রাসকেল ! আমি কিন্তু দূর থেকে দেখেই তোকে চিনতে পেরেছিলাম। তোর যেন আগে কি একটা নাম ছিল ? ঐ যে যেটা এফিডেভিট করে চেঞ্জ করলি—'

অস্বস্তির গলায় সন্দীপ বলল, 'নাড়ুগোপাল, কেন ?'

তাপস বলল, 'তুই কিন্তু তেমন বদলাসনি, সেইরকম নাড়ুগোপাল মার্কাই হয়ে আছিস।'

'তুই ভাই একেবারে বদলে গেছিস। রোগা তালপাতার সেপাই ছিলি, এখন পাঁচ নম্বরী ফুটবলের মতো ভুঁড়ি গজিয়েছে। চিনব কি করে ?'

পেটে হাত বুলোতে বুলোতে তাপস বলল, 'আমার কোন দোষ নেই। ব্লাডি এ্যালকোহল একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে—'

হঠাৎ খেয়াল হতে সন্দীপ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আরে দাঁড়িয়ে কেন ? বোস্—বোস্—'

'নো—'

'নো মানে ?'

'তুই আমার সঙ্গে চল্—'

'কোথায় ?'

'গেলেই দেখতে পাবি।'

একরকম জোর করেই রেস্তোরাঁর আরেক কোণে সন্দীপকে টেনে নিয়ে গেল তাপস। সেখানে সন্দীপের জন্য আর একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল। একটি তরুণী সেখানে বসে আছে। গায়ের রঙ রৌদ্র ঝলকের মতো, সরু কোমর, তলার দিকটা ভারী, দুই বুক যেন উল্টে দেওয়া সোনার বাটি। রাজহাঁসের মতো লম্বাটে গলা। ঈষৎ পুরু ঠোঁট রঙ-করা, ফাঁপানো রুক্ষ চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। গগল্স্ থাকার জন্যে চোখ দেখা যাচ্ছে না।

মেয়েটাকে দেখিয়ে তাপস বলল, 'ওকে চিনতে পারছিস ?'

'না—' সন্দীপ মাথা নাড়ল

'রাসকেল, ভাল করে দ্যাখ না—'

ভাল করে দেখেও চেনা গেল না ; সন্দীপ বিমূঢ়ের মতো বসে থাকল। তাপস তার পিঠে এক চড় কষিয়ে বলল, 'আমার বোন রে—'

'রিনি ?'

'রাইট। ছেলেবেলায় ওকে কত দেখেছিস—

'এখন কত বড়ো হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় এইটুকুন দেখেছিলাম।'

রিনি বলল, 'বা রে, বড়ো হব না!'

সন্দীপ ঠিক করতে পারল না—রিনিকে আপনি করে বলবে, না তুমি করে। একটু ভেবে দুম করে তুমিই বলল, 'বড়ো হয়েছ বলেই তো চিনতে পারিনি।'

'আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম।'

'তাপসও পেরেছিল। আমিই শুধু পারিনি।' সন্দীপ হাসল।

তাপস বলল, 'তুই একটা ব্লাডি বাগার।

ওয়েটার এসে গিয়েছিল। তাপস বলল, 'কী খাবি?'

'যা খুশি।'

মেনু দেখে দেখে দাগ দিয়ে দিল তাপস। তারপর হাতের মাপে বোতলের আকার দেখিয়ে বলল, 'চলে?'

বিব্রতভাবে একবার রিনির দিকে তাকাল সন্দীপ। চট করে গৌরীর মুখটাও মনে পড়ে গেল তার, হুইস্কির বোতল দেখে গৌরীর যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল রিনিরও যদি তেমন কিছু হয়? আবছা গলায় সন্দীপ বলল, 'মানে, ব্যাপারটা হ'ল—

সন্দীপের মনের কথা পড়ে নিয়েছিল তাপস। হাসতে হাসতে বলল, 'রিনির সামনে ড্রিঙ্ক করবি কিনা ভাবছিস?'

'হ্যাঁ মানে—'

'দুর্ভাবনার কিচ্ছু নেই, রিনিও একটু-আধটু খায়। তবে হুইস্কি-টুইস্কি স্ট্যাণ্ড করতে পারে না। ও খায় বীয়ার।'

চমকে আরেক বার রিনির দিকে তাকাল সন্দীপ। বারে বসে তাপস আর রিনি, দুই ভাইবোন তা হলে ড্রিঙ্ক করে! তাপসরা সত্যিই বড়োলোক হয়েছে। আর এই কলকাতা দশ বছর পরও সেই রকম ডার্টি-ন্যাষ্টি থাকলেও কোন কোন জায়গায় দারুণ বদলে গেছে।

তাপস আবার বলল, 'হুইস্কি আনতে বলব, না জিন?'

সন্দীপ বলল, 'হুইস্কি—'

তাপস উৎসাহের গলায় চেঁচাল, 'দ্যাটস লাইক এ গুড বয়।' যে বয়টা দাঁড়িয়ে ছিল তাকে বলল, 'দো হুইস্কি, এক বীয়ার।'

একটু পর খাবার-দাবার এসে গেল। খেতে-খেতে নানা রকম গল্প হতে লাগল। জার্মানীর গল্প, ইণ্ডিয়ার গল্প, তারই মধ্যে এক ফাঁকে সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'তুই আজকাল কি করছিস?'

তাপস বলল, 'বাবার বিজনেস দেখছি।'

'আনন্দ তা হলে ঠিকই বলেছে।'

'কে আনন্দ?'

'ঐ যে রে, এক সঙ্গে স্কুলে পড়তাম—'

'ও, দ্যাট ব্লাডি। ওর সঙ্গে কোথায় দেখা হ'ল?'

'পুরনো বন্ধুদের খোঁজ করতে করতে আজই ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'আর কী বললে আমাদের সম্বন্ধে?'

'তোরা জিঙ্ক না কিসের একটা ইমপোর্ট লাইসেন্স পেয়েছিস, এই সব—'

একটু চুপ করে থেকে তাপস বলল, 'ঐ রাসকেলটা সম্বন্ধে সাবধানে থাকিস।'

চকিতে আনন্দর ঈর্ষায়-পোড়া হিংস্রক মুখ মনে পড়ে গেল। সন্দীপ বলল, 'কেন রে?'

'ওটা একটা সোয়াইন। ক'দিন থাকলেই টের পাবি।'

'আনন্দ'র কথা থাক। ইমপোর্টের কারবার যখন, তখন তোকে তো মাঝে মাঝেই বাইরে যেতে হয়।'

'ও সিউর। বছরে তিন-চার মাস তো ইংল্যাণ্ড, কানাডা কি জাপান-টাপানে কাটাই।'

'এবার বেরুলে ওয়েস্ট জার্মানীতে আমার ওখানে যাস।'

'যাব।'

রিনির দিকে ফিরল সন্দীপ 'তোমার সঙ্গে কোন কথাই হচ্ছে না। কী করছ এখন? পড়াশোনা নিশ্চয়ই শেষ হয়নি?'

রিনি বলল, 'এ বছর ইকনমিক্স নিয়ে এম. এ. পাশ করেছি।'

তাপস ওধার থেকে বলল, 'রিনি-টার দারুণ লাক, বুঝলি সন্দীপ—'

'কি রকম?'

'এম. এ-টা পাশ করতে না করতেই একটা কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়ে গেছে। শিগ্‌গিরই লণ্ডন যাবে।'

'গ্র্যাণ্ড।' সন্দীপ রিনিকে বলল, 'লণ্ডন যাচ্ছ কবে?'

রিনি বলল, 'পাশপোর্ট-টাশপোর্টের ঝামেলা চলছে। আশা করছি মাসখানেকের ভেতর চলে যেতে পারব।'

'ভেরি গুড।'

রিনি একসময় বলল, 'ক্যালকাটায় আপনি আর কতদিন আছেন?'

সন্দীপ বলল, 'খুব বেশিদিন না, ছুটি ফুরিয়ে এসেছে।'

'আমাদের বাড়ি একদিন আসুন না—'

'যাব একদিন।'

'একদিন না, কালই আসুন। আমাদের বাড়ি চা খাবেন।'

একটু ভেবে সন্দীপ বলল, 'আচ্ছা।'

গল্প করে খেতে খেতে সাড়ে তিনটে বেজে গেল। ওয়েটার বিল নিয়ে এসেছিল। সন্দীপ টাকা বার করে দিতে যাচ্ছিল, তাপস কিছুতেই দিতে দিল না। ধমকের গলায় বলল, 'মাইণ্ড, ইউ আর মাই গেস্ট।'

যাবার নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। সে-কথাটা আর তাপসকে বলল না সন্দীপ। যা বলল তা এই, 'আমি একটু গভর্নর্স হাউসের দিকে যাব।'

'আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে। চল্ তোকে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ক'বছর বাইরে থেকে একেবারে ফর্মালিটির বাবা হয়ে উঠেছিস দেখছি। কথায় কথায় থ্যাঙ্ক ইউ!'

সন্দীপ লজ্জা পেয়ে গেল, উত্তর দিল না।

তাপস আবার বলল, আয়—'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে নতুন মডেলের ঝকঝকে এ্যামব্যাসাডারে উঠল তিনজনে। সামনের সীটটায় ওরা পাশাপাশি বসে ছিল।

তাপস ড্রাইভ করছে। মাঝখানে রিনি, রিনির এ-ধারে দরজার পাশে সন্দীপ।

বেশিদূর যাওয়া গেল না, চৌরঙ্গীর মুখে এসে থমকে যেতে হ'ল। শুধু এই গাড়িটাই না, পেছনে আরো পাঁচ-সাত'শ ট্যাক্সি-লরী-প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে পড়েছে। উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে দেখা গেল, সামনের রাস্তায় অর্থাৎ চৌরঙ্গীতে মিছিল চলেছে। মিছিলকারীরা স্লোগান দিচ্ছিল—

'অফিস বন্ধ করা—'

'চলবে না, চলবে না।'

'আমাদের দাবী—'

'মানতে হবে।'

'জেনারেল ম্যানেজারের—

'অপসারণ চাই।'

'কর্মচারী ঐক্য—'

'জিন্দাবাদ।'

দেখতে দেখতে বিরক্তিতে সন্দীপের ভ্রূ কুঁচকে যেতে লাগল, সেদিন দমদমে নামার পর থেকে রোজই মিছিল দেখছে সে। বড়ো রাস্তায় তো বটেই, এখানে-

সেখানে অলিতে-গলিতে, সব জায়গায় মিছিল। স্লোগানের আওয়াজ ছাড়া এ-শহরের আর সব শব্দ যেন তলিয়ে গেছে।

সন্দীপ বলল, কলকাতাকে তোরা কি করে তুলেছিস রে?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাপস জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছি?'

সন্দীপ কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখ আবার গিয়ে পড়ল মিছিলটার ওপর। তক্ষুণি চমকে উঠল সে। মিছিলের পাশে বড়ো-বড়ো পা ফেলে আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্লোগান দিচ্ছে যে মেয়েটা—সে কে? আরে মল্লিকাই তো।

তাপসও দেখতে পেয়েছিল। আস্তে করে সে বলল, 'মেয়েটা খুব চেনা মনে হচ্ছে।'

সন্দীপ চুপ। তার বিস্ময় কিছুতেই কাটছিল না। মল্লিকাকে এভাবে একটা মিছিলের মধ্যে দেখা যাবে, এ যেন ভাবাই যায় না।

তাপস এবার প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, 'আরে আরে, ও অশোকের বোন না? হ্যাঁ, তাই তো—'

সন্দীপ এবারও উত্তর দিল না।

তাপস বলতে লাগল, 'ভাইয়ের মতো বোনটাও পলিটিকস্ করছে নাকি? স্ট্রেঞ্জ।' একটু থেমে আবার, 'ওর বাবার কথা মনে আছে তোর?'

জড়ানো গলায় কিছু একটা বলল সন্দীপ। তাপস কি বুঝল কে জানে। বলল, 'সেই যে রে, টালমাটালবাবু। আমাদের স্কুলের সামনে দিয়ে ঘুড়ির মতো লাট খেতে খেতে যেত। মনে আছে?'

সন্দীপ আস্তে করে বলল, 'আছে।'

'আরেকটা কি নাম যেন দেওয়া হয়েছিল?' তাপস স্মৃতির ভেতর হাতড়াতে লাগল কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না।

সন্দীপ বলল, 'চিরনিদ্রিতবাবু। ভদ্রলোকের পেছনে তুই খুব লাগতিস।'

'রাইট ইউ আর! চিরনিদ্রিতবাবু। তোর বেশ মনে আছে তো—'

'মনে থাকবে না কেন, এই তো সেদিনের ব্যাপার।'

হঠাৎ কি ভেবে প্রায় লাফিয়েই উঠল তাপস, 'আরে কি আশ্চর্য, অশোকের সঙ্গে তোরই তো সব চাইতে বেশি ইন্টিম্যাসি ছিল। তোর মনে থাকবে না তো আর কার থাকবে। মনে আছে অশোক যেদিন ওদের বাড়ি ফার্স্ট আমাদের নিয়ে গিয়েছিল, যে কি বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম—'

'তা তার মনে নেই?' সন্দীপ হাসতে লাগল, 'ছেলেবেলায় তুই একটা গ্রেট

হারামজাদা ছিলি—'

'যা বলেছিস ভাই—'তাপসও হাসতে লাগল।

রিনি আচমকা তাপসকে বলল, 'তোমাদের বন্ধু অশোক, না কি বললে নামটা —তাদের বাড়ি ফার্স্ট গিয়ে কী হয়েছিল?'

অনেকদিন আগের সেই মজার ঘটনাটা রঙচঙ লাগিয়ে অভিনয় করে দেখাল তাপস। ফলে রিনি তক্ষুণি কচি খুকিটি হয়ে হাসতে হাসতে দম আটকে ফেলতে লাগল।

একসময় তাপস বলল, 'তখন তো ওদের বাড়ি তুই খুব যেতিস—'

সন্দীপ বলল, 'খুব আর কোথায়, মাঝে মাঝে—'

'ওরাও তো তোদের বাড়ি আসত।'

'হ্যাঁ।'

'জার্মানী থেকে ফিরবার পর অশোকের সঙ্গে তোর দেখা-টেখা হয়েছে?'

'না।'

'ওর বোনের সঙ্গে?'

সন্দীপ হঠাৎ খুব নার্ভাস বোধ করল। আবছা গলায় বলল, 'আরে না-না, আমার সঙ্গে দেখা হবে কেন?'

তাপস বলল, 'অশোক আজকাল কি করছে জানিস?'

'আমি কি করে জানব? তুই আচ্ছা ছেলে তো—' সন্দীপকে রুক্ষ বিরক্ত অসন্তুষ্ট দেখাল।

তাপস অবাক, 'আরে তুই চটছিস কেন?'

সন্দীপ উত্তর দিল না।

মিছিলটা পার হতে মিনিট পনেরো কুড়ি লাগল। তারপর রাজভবনের কাছে সন্দীপকে নামিয়ে দিয়ে তাপসরা চলে গেল।

সন্ধ্যে পর্যন্ত এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াল সন্দীপ। হঠাৎ একসময় তার মনে হ'ল জার্মানী থেকে বাবা-মা-রমা-গৌরী বা বৌদির জন্য কিছুই নিয়ে আসেনি। এখানে এসেও কিছু কিনে-টিনে দেয়নি। তা'ছাড়া ক'দিন ধরে আছে। সারা সংসার প্রায় আধপেটা খেয়ে তার পাতের চারপাশে মাছ-মাংস, দই-মিষ্টি সাজিয়ে দিচ্ছে। অন্তত এখানে থাকার দাম হিসেবেও তার কিছু খরচ-টরচ করা দরকার।

কার্জন পার্কের কোণ থেকে মা'র জন্য কিছু ফলটল কিনে ফেলল সন্দীপ। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে এল চৌরঙ্গীর হকার্স কর্ণারে। ভাবল, বাড়ির সবার

জন্য জামা-কাপড়-টাপড় কিনে নিয়ে যাবে। বড়োদের ধুতি শাড়ি-টাড়ি তবু কেনা যায়। কিন্তু দাদার বাচ্চাগুলোর প্যাণ্ট-শার্ট মাপ ছাড়া আন্দাজে কেমন করে কিনবে? সন্দীপ চিন্তা করল, আজ থাক। পরে অন্য একদিন সবাইকে নিয়ে এসে কেনাকাটা করবে। পরক্ষণেই ভাইপো-ভাইঝিগুলোর চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ন্যাষ্টি নোংরা একপাল শুয়োর-ছানা নিয়ে আর যা-ই করুক, কিছুতেই সে রাস্তায় বেরুতে পারবে না। যা হবার আজই হয়ে যাক। মা-বৌদি রমা-গৌরীদের জন্য দু'খানা দু'খানা করে প্রিন্টেড শাড়ি কিনে ফেলল সন্দীপ, আর কিনল ব্লাউজের ছিট। বাবার জন্য একজোড়া তাঁতের ধুতি, দুটো গেঞ্জি এবং শার্টের কাপড়। দাদার বাচ্চাদের জন্যও আন্দাজে-আন্দাজে হাফ প্যাণ্ট আর বুশ শার্ট কিনল। পটলার মাপ জানা নেই, তাই ট্রাউজার্সের কাপড় নিতে হ'ল। হারুর জন্য কিছুই কিনল না সন্দীপ, হারুকে এখনও সে ক্ষমা করতে পারেনি। ইম্পার্টিনেণ্ট, ইনসোলেণ্ট!

জামা-কাপড়ে তিনটে ঢাউস প্যাকেট হয়েছে। তার ওপর ফলের প্রকাণ্ড একটা ঠোঙাও রয়েছে। সে-সব ঘাড়ে করে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে এসে দেখা গেল, একটাও ট্যাক্সি নেই। সেখান থেকে সন্দীপ ছুটল ট্রামের খোঁজে। ট্রাম স্টপেজে গিয়ে মারাত্মক খবরটা পাওয়া গেল। আজ বিকেল থেকে তাদের রুটের ট্রাম বন্ধ। কি একটা গোলমাল-টোলমাল হয়েছে, ফলে রাস্তা থেকে গাড়ি তুলে নেওয়া হয়েছে।

বিরক্ত ক্রুদ্ধ সন্দীপ শেষ পর্যন্ত গেল বাস-স্টপেজে। তার হাতে কয়েক কেজি ওজন ঝুলছে। কেন যে মহানুভবতার অবতার হয়ে এগুলো কিনতে গেল? বাবা-মা-রমা-গৌরীদের ওপর হঠাৎ দারুণ রাগ হতে লাগল তার।

বাস-স্ট্যাণ্ডে হাজার কয়েক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। এই বিশাল জনতা তাদের ও-দিকেই যাবে নাকি? ভাবতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখল সন্দীপ।

হঠাৎ হঠাৎ এক-আধটা স্টেটবাস এসে পড়ছে। সেগুলো এক সেকেণ্ড-ও দাঁড়াচ্ছে না, হুস করে চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

প্রাইভেট বাসগুলো অবশ্য থামছে কিন্তু সেগুলোর অবস্থা ভয়াবহ। সামনে-পেছনে-ফুটবোর্ডে মানুষ ঝুলছে। এমন কি ছাদের ওপরেও সাঙ্ঘাতিক ভিড়। বাসগুলো থামলেই জনতা ছুটে গিয়ে মশার মতো ছেঁকে ধরছে। কিন্তু যেখানে একটা পিন গলাবার জায়গা নেই সেখানে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা চল্লিশ পঞ্চাশ কেজি ওজনের একেকটা শরীর ওরা কোথায় ঢোকাবে, কে জানে। অদ্ভুত কায়দায় ওর মধ্যে কিন্তু কেউ কেউ উঠে পড়ছে।

সন্দীপ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, ওভাবে বাস ধরার অভ্যাস তার নেই। তেমন কৌশলও সে জানে না। অন্ধ আক্রোশে তার মাথায় রক্ত ফুটতে লাগল। একবার ইচ্ছা হ'ল, প্যাকেটগুলো ও-ধারের ড্রেনে ফেলে দিয়ে আজকের রাতটা কোন হোটেলে কাটিয়ে দ্যায়। পরক্ষণেই ভাবল, জামা কাপড়গুলো কিনতে তিন-চার'শো টাকা খরচ হয়ে গেছে।

রাগ আক্রোশ এবং উত্তেজনার মধ্যেও একটা দৃশ্য দেখে তার খুব আমোদ লাগল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, বেশ ঝকঝকে, স্মার্ট, ওয়েল-ড্রেসড, হাতে পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ—তার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখেই টের পাওয়া যায়, ভদ্রলোক চাকরি-বাকরি করেন। বাস এলেই তিনি ছুটে যাচ্ছিলেন।

প্রথম যে বাসটা এল সেটায় উঠতে গিয়ে ভদ্রলোক কনুই'র গুঁতো খেয়ে ফিরে এলেন। আরেকটু হলে চশমাটা যেত। ভদ্রলোকের বিরক্ত অসন্তুষ্ট মুখচোখ দেখে মনে হ'ল গুচ্ছের তেতো গিলেছেন।

দ্বিতীয় বাসটার ফুটবোর্ডে কয়েক ডজন পা দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে তার ভেতর নিজের পা'টি গলাতে না গলাতেই বাস ছেড়ে দিল। ফিরে আসতে আসতে চাপা রাগের গলায় বললেন, 'শালা!'

তৃতীয় বাসটায় উঠতে গিয়ে কোমরের কাছে একটা আস্ত লাথিই খেলেন ভদ্রলোক। ফিরতে ফিরতে হিংস্র স্বরে গলা চড়িয়ে বললেন, 'শুয়ারের বাচ্চা—' চতুর্থ বাসটায় উঠতে গিয়ে তিনি এমন ধাক্কা খেলেন যে হুড়মুড় করে রাস্তায় এসে পড়লেন। জামাটা ফড়ফড় করে অনেকটা ছিঁড়ে গেল। হাত-পা ছড়ে-মড়ে কেটে-কুটে রক্তারক্তি কাণ্ড। হাতের পোর্টফোলিও ব্যাগটা ছিটকে গিয়ে পড়েছে ও-ধারের ড্রেনের কাছাকাছি। দু'চারটে রাস্তার লোক ছুটে গিয়ে তাঁকে টেনে তুলল। পোর্টফোলিও ব্যাগটা কুড়িয়ে রুমাল দিয়ে ধুলো আর রক্ত মুছতে মুছতে এবার চেঁচিয়ে একটা অশ্লীল খিস্তিই আউড়ে ফেললেন। আর তখনই সন্দীপের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল।

ভদ্রলোক পলকের জন্য থতিয়ে গেলেন, খুব সম্ভব ঐরকম একটা খিস্তির জন্য লজ্জা পেলেন। তারপর অনেকটা আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন, 'সারাদিন কাজকর্মের পর এ-সব ভালো লাগে! আজ ট্রাম নেই, কাল বাস নেই, পরশু ট্রেন নেই। ইচ্ছা করে সব জ্বালিয়ে দিই। কলকাতা শহরটা একেবারে বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।'

সন্দীপের কেন যেন মনে হ'ল, এ শহরের বুকের তলায় বারুদ জমছে। যে কোনদিন ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

অনেক রাত্রে কিছুটা হেঁটে, কিছুটা শেয়ারে টেম্পো ভাড়া করে বাড়ি ফিরে এল সন্দীপ।

বারো

জামা কাপড় পেয়ে বাড়িতে আনন্দের বান ডাকল যেন। মা বুকের ওপর নতুন শাড়িদুটো চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই ফেলল। বাবার আটষট্টি বছরের নীরক্ত শুকনো ঠোঁট অসহ্য আবেগে কাঁপতে লাগল, কিছুই বলতে পারল না সে। রমা, গৌরী আর দাদার বাচ্চারা তো প্যাকেট খুলেই নতুন জামা-টামা পরে ফেলল।

দৃশ্যটা মোটামুটি ভালই লাগল সন্দীপের। মাত্র তিন-চারশো টাকা খরচ করলে যে সারা বাড়ি তোলপাড় হয়ে যায়, এ-ধারণা তার ছিল না।

শহরতলীর নোংরা পাড়ায় তাদের এই ধ্বসে-পড়া পুরনো একতলা বাড়িটা ঘিরে আজ শুধু আবেগ আর আনন্দের ছড়াছড়ি। সন্দীপ যতই গা বাঁচিয়ে দূরে থাকতে চাক না, এই আবেগ তাকেও ধাক্কা দিয়ে গেল। বাড়িভর্তি আনন্দের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সে হাত-মুখ ধুয়ে, খেয়েদেয়ে নিল। তারপর বাগানের একধারে কুয়োতলা থেকে আঁচিয়ে সবে বাইরের বারান্দায় উঠেছে, সেই সময় চোখে পড়ল, মল্লিকা ঝুপসি বাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়ল সন্দীপ। বিকেলের কিছু আগে পার্ক স্ট্রীটের মুখে সেই মিছিলটার কথা চট্ করে মনে পড়ে গেল। সে তো মল্লিকাকে হাত ছুঁড়ে স্লোগান দিতে দেখেছে। মল্লিকাও কি তাকে দমবন্ধ জ্যামের ভেতর রিনির পাশে বসে থাকতে দেখেছে?

যদি দেখেই থাকে? পঁয়ত্রিশ বছরের ধাধী সন্দীপ পুরো দশটি বছর জার্মানীতে কাটিয়ে এত ড্রিঙ্ক আর এত বান্ধবী ঘেঁটেও নিজেকে বলতে পারল না, 'দেখে থাকে তো কী হয়েছে? আমি ওসব পরোয়া করি না।'

মল্লিকা সিঁড়ির কাছে এসে পড়েছিল। সন্দীপ বলল, 'এত রাত্তিরে?'

এক পলক তাকিয়ে থাকল মল্লিকা। তারপর বলল, 'এর চাইতে বেশি রাত করেও আমি এ-বাড়িতে আসি।'

'না-না, আমি সেভাবে বলিনি।' সন্দীপ বিব্রতভাবে বলল, 'রাত করে এলে— এখানে কিছুক্ষণ থাকবে, তাতে আরো রাত হবে। শুনেছি তোমাদের ওদিকের রাস্তাঘাটে আজকাল আলো জ্বলে না।

'ঠিকই শুনেছেন। চোরেরা ইলেকট্রিক তার কেটে নিয়ে গেছে।'

'অন্ধকারে এত রাত্তিরে একা একা তোমার চলাফেরা করা ঠিক না। তাই বলছিলাম—'

'ধন্যবাদ। আপনি যে আমার জন্যে এত ভাবেন, জেনেও সুখ।'

একটু চুপ।

তারপর ফস করে নিজের অজান্তেই সন্দীপ বলে ফেলল, 'তোমাকে আজ এক জায়গায় দেখলাম—'

মল্লিকা কিছু বলবার আগেই উত্তর দিকের ঘর থেকে মা'র গলা ভেসে এল, 'কে রে, মনু এসেছিস?'

মল্লিকা গলা তুলে সাড়া দিল, 'হ্যাঁ কাকিমা—'

'এ ঘরে আয়—'

মল্লিকা সন্দীপকে বলল, 'কাকিমা ডাকছে। যাই, একটু কথা বলে আসি।' সন্দীপের পাশ দিয়ে সে মা'র ঘরে চলে গেল।

সন্দীপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর পায়ে পায়ে নিজের ঘরে গেল। গিয়ে কিন্তু শুয়ে পড়তে পারল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্কের মতো ধোঁয়ার রিং ছাড়তে লাগল।

অনেকদিন পর আজ পেটে হুইস্কি পড়েছে। সন্দীপ ভেবেছিল, সারা শরীরে নেশার সুখটুকু জড়িয়ে আজকের রাতটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু মল্লিকা? মেয়েটা হুইস্কির জোরালো ঝাঁঝও ফিকে করে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর মা'র ঘর থেকে সন্দীপের ঘরে এল মল্লিকা। মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, 'তখন কী যেন বলছিলেন?'

সন্দীপ না ভেবেই উত্তর দিল, 'তোমাকে আজ বিকেলে একটা প্রসেশানে দেখেছি।'

'কোথায়?'

'চৌরঙ্গীতে। পার্ক স্ট্রীটের কাছে।'

'ঠিকই দেখেছেন। আপনি ওদিকে গিয়েছিলেন নাকি?' স্থির নিবদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল মল্লিকা।

সন্দীপ উসখুস করে বলল, 'হ্যাঁ, মানে—'

একটু চুপ। তারপর দ্রুত কি ভেবে সন্দীপ আবার শুরু করল, 'কলকাতাটা মিছিলের শহর হয়ে উঠেছে। এ সিটি অফ প্রসেশানস।'

দুম করে মল্লিকা বলে ফেলল, 'অন্য কিছু বলুন—'

'মানে ?' সন্দীপ অবাক।

মল্লিকা বলতে লাগল, 'সিটি অফ প্রসেশানস, সিটি অফ নাইটমেয়ারস—এ-সব কথা আপনি বলবার ঢের আগেই অন্যেরা বলে ফেলেছে। এতদিন পরে এলেন, নতুন কিছু একটা বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিন।'

মল্লিকা কি ঠাট্টা করছে ? অথবা বিদ্রূপ ? সন্দীপ বুঝতে পারল না। হাতের সিগারেটটা ফুরিয়ে এসেছিল, তার আগুন থেকে আরেকটা ধরিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। এলোমেলোভাবে ঘরময় দু-চক্কর ঘুরে বিরক্ত গলায় বলল, 'এরকম মিছিল বার করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাফিক জ্যাম করে রাখার কোন মানে হয় ?'

শান্ত চোখে তাকিয়ে মল্লিকা বলল, 'আপনি ঠিক ব্যাপারটা বুঝবেন না।'

'কেন ?'

'এ-সব বুঝতে হলে অনেকদিন এখানে থাকতে হবে। চট করে এক কথায় বুঝিয়ে দেওয়া যাবে না।'

'ও। সেদিন যখন দেশে ফিরলাম মিছিলের জন্য এক ঘণ্টা আটকে থাকতে হয়েছিল। আজও খানিকক্ষণ পার্ক স্ট্রীটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।'

'খুবই দুঃখের ব্যাপার।'

সন্দীপ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'জানো এ-সব নিয়ে আউট সাইড ইণ্ডিয়ায় কলকাতার দুর্নাম হচ্ছে ?'

মল্লিকা ঘাড় কাত করল, 'জানি। ইণ্ডিয়ার বাইরে কেন, ইণ্ডিয়ার ভেতরেও কলকাতার কত বদনাম। সবাই কলকাতার কুৎসা গাইবার জন্যে গলা শানিয়ে রেখেছে।'

'ফরেনাররা আজকাল আর এখানে আসতে চায় না।'

'তাও জানি।'

'জার্মান টেলিভিসনে কলকাতা সম্বন্ধে রোজ একটা করে কেচ্ছা বেরুচ্ছে।'

'এটা অবশ্য জানি না।'

'এ-ভাবে কলকাতার মুখে চুনকালি লাগিয়ে কী লাভ ?'

'মিছিলে আটকে থাকার জন্যে আপনি ভীষণ চটে গেছেন দেখছি।' মল্লিকা আচমকা হেসে ফেলল।

এ-ভাবে মল্লিকা হেসে উঠবে, সন্দীপ ভাবতে পারেনি। সে হকচকিয়ে গেল, 'না, মানে—'

অনেকটা বিমূঢ়ের মতো সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'কী চায় ওরা ?'

'আমার মুখে শুনে কতটুকু আর বুঝবেন।'

সন্দীপ চুপ করে রইল। একটু পর কি ভেবে বলল, 'তোমাকে মিছিলে দেখলাম। তুমিও আজকাল পলিটিকস্ করছ নাকি?'

'না, আমি কোন পার্টি-টার্টি করি না। তবে আজকের দিনে বাঙলাদেশে বেঁচে থাকতে হলে একটু-আধটু রাজনীতির আঁচ গায়ে এসে লাগবেই।'

'বল কি!' সন্দীপ বিস্ময়ের গলায় বলল।

আস্তে করে ঘাড় কাত করল মল্লিকা।

সন্দীপ এবার জানতে চাইল, 'তোমাদের প্রসেশানটা কিসের ছিল?'

'আমাদের অফিস স্টাফদের।'

'তুমি চাকরি-টাকরি কর নাকি?'

'করি। না করে উপায় কি?'

'কই আমাকে বলনি তো?'

আপনি কখনও জানতে চেয়েছেন?'

'জানতে চাইব কি করে?' সন্দীপ বলতে লাগল, 'তুমি চাকরি করতে পার, এমন ধারণাই আমার ছিল না।'

সোজা সন্দীপের চোখের ভেতর তাকাল মল্লিকা, 'কী ধারণা ছিল আপনার?'

সন্দীপের মতো তুখোড় ছেলেও কয়েক পলক থমকে রইল। অন্ধের মতো সে উত্তর হাতড়াতে লাগল। কিন্তু হাতের কাছে কিছুই পাওয়া গেল না।

মল্লিকা আবার বলল, 'আপনার কি ধারণা, আমাদের কাঁড়ি-কাঁড়ি ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আছে?'

সন্দীপ চুপ। মল্লিকাও আর কিছু বলল না।

একটু ভেবে সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'প্রসেশানটা কি জন্যে বার করেছিলে?'

মল্লিকা বলল, 'আপনি তো পার্ক স্ট্রীটের মুখে ছিলেন, বললেন—'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের স্লোগান শোনেননি?'

'শুনেছি।'

'স্লোগান শুনেও বুঝতে পারেননি?'

'মানে ঠিক—'

'ম্যানেজমেণ্ট হুমকি দিয়েছে বন্ধ করে দেবে। তার প্রতিবাদে আমরা মিছিল নিয়ে বেরিয়েছিলাম।'

'ম্যানেজমেণ্ট অফিস বন্ধ করে দিতে চাইছে কেন?'

'সে অনেক কথা।'

'বল না—'

'এখন বলবার সময় নেই। আর বললেও আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না।'

'বুঝব না কেন?'

তার কারণ আপনি এখনকার বাঙলাদেশকে জানেন না।'

'দশ বছরে বাঙলাদেশ কি এতই বদলে গেছে যে বুঝিয়ে দিলেও বুঝতে পারব না?'

'হ্যাঁ—'

দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠোঁট টিপল সন্দীপ। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টেনে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে মল্লিকা হঠাৎ বলল, 'জানেন আজ এক কাণ্ড হয়েছে।'

'কী?' অন্যমনস্কের মতো তাকাল সন্দীপ।

'প্রসেশান আর মীটিং-এর পর বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম। তখন বাবা আপনার কথা বললে।'

ট্রাউজার্সের তলায় পিঁপড়ে হাঁটার মতো একটা অস্বস্তি সন্দীপকে পেয়ে বসল যেন। মে মাসের গরমে ঘরটা ফার্নেস হয়ে আছে। সন্দীপ ঘামছিলই। আচমকা তার মনে হ'ল শিরদাঁড়া বেয়ে গলগল করে দারুণ স্রোত নেমে যাচ্ছে। তার দেহে এত জল জমা হয়ে ছিল, কে জানত। হঠাৎ শরীরে সব শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল সে। জড়ানো গলায় বলল, 'আমার সম্বন্ধে কী বললেন?'

'বললে আপনি কেমন আছেন?'

'তুমি কী বললে?'

'বললাম খুব খারাপ।'

'তার মানে?' সন্দীপ চমকে উঠল।

মল্লিকা গলাটা অনেকখানি তুলে সরল বালিকার মতো পা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, 'মানে আবার কি, খারাপই তো আছেন। বলুন মিথ্যে কথা?'

গোড়ালিতে চাপ দিয়ে সট করে উঠে পড়ল সন্দীপ। টোকা দিয়ে দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। তারপর ঘরময় লাট্টুর মতো দু-তিনটে পাক দিয়ে পশ্চিমের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকেই ঘাড় বাঁকিয়ে বলল 'খারাপ লাগার কথা কখনো তোমাকে বলেছি?'

'উঁহু—'

'তা' হলে?'

'না বললেও বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই—' তক্ষুণি ঘাড় হেলিয়ে দিল মল্লিকা।

চোখের তারা স্থির করে সন্দীপ বলল, 'কবে?'

'কবে নয়? রোজ, প্রতি মুহূর্তে।' এতক্ষণ মল্লিকার গলায় এবং পা দোলানিতে রগড়ের আভাস ছিল। হঠাৎ স্বরহীন ভারী গলায় সে বলল, 'যাক ও-সব। বাবা আরেকটা কথা বলছিল—'

বিস্বাদ মুখে সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'আপনি তো আর আমাদের বাড়ি গেলেন না, বাবা তাই আজ এখানেই আসতে চাইছিল। আমি কিন্তু—' এইটুকু বলেই থেমে গেল মল্লিকা।

নিজের অজান্তেই ফস করে সন্দীপ বলে বসল, 'তুমি কিন্তু কী?'

'বাবাকে আপনাদের বাড়ি আজ আসতে দিইনি।

ঢোক গিলে মিয়ানো গলায় সন্দীপ জানতে চাইল, 'কেন?'

মল্লিকা বলল, 'অত তাড়াহুড়োয় দরকার কী? আপনাকে আরেকটু দেখি। তারপর না হয় বাবাকে আসতে দেব।'

'মানে?'

'মানে-টানে কিছু নয়।'

সন্দীপ চুপ।

একটু ভেবে মল্লিকা এবার বলল, 'জানেন, সেই তিনটে হাজার টাকা নিয়ে বাবার ভীষণ ভয়—'

বুঝতে না পেরে সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'কোন তিন হাজার টাকা?'

ঐ যে জার্মানী যাবার সময় বাবা আপনাকে দিয়েছিল।'

সন্দীপ ভীষণভাবে চমকে উঠল। মোটে তিন হাজার টাকা—মাসখানেক এক্সট্রা খাটলেই ও-টাকাটা পাওয়া যায়। অথচ হেরম্ববাবুর সামান্য এই ঋণটার কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। ক'হাজার টাকার জন্য দাদাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। হেরম্ববাবু যে এখনও গলায় ফাঁস লাগায়নি, এতেই খানিকটা আরাম বোধ করল সন্দীপ। তবু জুতোর ভেতর কাঁকড় ঢোকার মতো একটা অস্বস্তি কিন্তু থেকেই গেল। তিনটে হাজার টাকার জন্য বিচিত্র এক অপরাধবোধ তাকে অসুস্থ করে তুলল। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল সন্দীপ, কিন্তু কথাগুলো গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে যেতে লাগল।

মল্লিকা বলতে লাগল, 'বাবা ঐ টাকা ক'টার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে

না। বাবার খালি ভয় ব্যাড ইনভেস্টমেণ্ট হয়ে গেল বুঝি, টাকাটা জলেই চলে গেল।'

সন্দীপ উত্তর দিল না।

মল্লিকা থামেনি, 'আমি বাবাকে কী বলেছি জানেন?'

'কী?'

'তুমি ব্যবসাদার মানুষ, লাভ-লোকসান নিয়েই তো তোমার কারবার। সব ইনভেস্টমেণ্টই ডিভিডেণ্ড দেবে, তাই কখনো হয়? শুধু শুধু কষ্ট পেয়ো না। আচ্ছা, আমি আজ উঠি। অনেক রাত হ'ল।'

মল্লিকা চলে গেল। বিমূঢ়ের মতো বসে বসে তার কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করল সন্দীপ।

অনেক দিন পর আজ পেটে হুইস্কি পড়েছে। পার্ক স্ট্রীটের এয়ার কণ্ডিশনড্ রেস্তোরাঁয় রিনি-তাপস, ঝাঁঝালো ড্রিঙ্কস্, সব একাকার হয়ে ঝিম-ঝিম নেশার মধ্যে ওয়েস্ট জার্মানীকে যেন ফিরে পেতে শুরু করেছিল সন্দীপ। মেজাজটা সারাদিন মোটামুটি ভালোই ছিল। ঘন দুধ হঠাৎ ছানা কেটে গেলে যেমন হয়, মল্লিকা চলে যাবার পর মনটা সেই রকম হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ বসে থেকে-থেকে এক সময় উঠে পড়ল সন্দীপ। বাইরে গিয়ে কুয়োতলা থেকে চোখে-মুখে-ঘাড়ে-গলায় জল দিয়ে এল। তারপর বিছানায় গিয়ে হুড়মুড় করে শুয়ে পড়ল।

তেরো

পরের দিনটাও আগের ক'দিনের মতোই। ঢিলেঢালা অলস বিস্বাদ কর্মসূচীতে কোনরকম পরিবর্তন নেই। সকাল বেলায় সেই বেড-টী খাওয়া, তারপর আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে সূর্যটাকে আকাশের সিকি পথ পার করিয়ে বিছানা ছাড়া, শেভ করা, স্নান, তারপর দুপুরের খাওয়া, খাওয়া-দাওয়ার পর মে মাসের অসহ্য গরমে সেদ্ধ হতে হতে একখানা ঘুম। তারও পরে বিকেল থাকে, সন্ধ্যে থাকে, রাত থাকে। সময় আর কাটতে চায় না।

আজ কিন্তু বিকেল হতে না হতেই আরেকবার স্নান-টান সেরে সন্দীপ ঝকঝকে, ফিটফাট হয়ে নিল। কাল রিনিরা নেমন্তন্ন করেছে, বার বার করে তাদের বাড়ি যেতে বলেছে।

রাস্তায় বেরিয়ে খানিকটা হেঁটে একটা ট্যাক্সি পেল সন্দীপ। ধীরে সুস্থে উঠে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'যোধপুর পার্ক—'

জার্মানীতে থাকতে বান্ধবীদের সঙ্গে প্রচুর ঘুরেছে সন্দীপ। মেয়েদের সঙ্গলাভ তার কাছে দারুণ কোন ব্যাপারই না—সিগারেট টানা, দাঁত-মাজা কিংবা কুলকুচি করার মতো অতি সাধারণ এবং মামুলি ঘটনা। কিন্তু রিনিদের বাড়ি যেতে যেতে বুকের ভেতর ছোটোখাটো ঢেউ অনুভব করতে লাগল সন্দীপ। গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে ঘাঁটবার পর এখনও তবে তার রোমাঞ্চ হয়! এ-একটা আবিষ্কার বটে! সন্দীপ আপন মনেই হেসে ফেলল।

যোধপুর পার্কে তাপসদের তিনতলা বাড়িটা ছিমছাম, স্টীমলাইনড্। আজকাল ইওরোপে যে ধরণের বাড়ি উঠছে, সেইরকম আর্কিটেকচারে কলকাতা ছেয়ে যাচ্ছে। রিনিদের বাড়ির সব ক'টা ঘরেই এয়ার-কুলার বসানো।

তাপস আর রিনি সন্দীপের জন্য অপেক্ষা করছিল। ট্যাক্সি থেকে নামতেই ওকে চমৎকার-সাজানো ড্রইংরুমে টেনে নিয়ে গেল।

তাপসের বাবা-মা বাড়িতেই ছিল। তাদের সঙ্গে নতুন করে আলাপ-টালাপ হ'ল। ছেলেবেলায় তাপসের বাবা-মাকে খুব রোগা দেখেছে সন্দীপ। ওর বাবা ছিল যেমন রোগা তেমনি ঢ্যাঙা। তাপস তা নিয়ে খুব রগড় করত। কখনও বলত, তালপাতার সেপাই। কখনও বলত, স্টিক। তবে সব চাইতে বেশি যা বলত তা হ'ল লেংথ উইদআউট ব্রেডথ। আশ্চর্য, সেই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা কি দারুণই না ফুলেছে!

তাপসের বাবা হয়তো সন্দীপের মনোভাব টের পেয়েছিল। বলল, 'আমাকে চিনতে নিশ্চয়ই তোমার অসুবিধে হচ্ছিল।'

কথাটা ঠিক। এ-বাড়িতে না দেখলে তাপসের মা-বাবাকে সন্দীপ চিনতেই পারত না। বিব্রতভাবে সে বলল, 'না-না, অসুবিধে হবে কেন?'

'হচ্ছে হচ্ছে, সবারই হয়। ছেলের বন্ধু হয়ে সে কথাটা মুখে আর কি করে বল। আমার বন্ধুরা কী বলে জানো?'

সন্দীপ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

তাপসের বাবা বলতে লাগল, 'বন্ধুরা বলে আলপিন থেকে আমি এলিফ্যান্ট হয়েছি।' বলে হাসল।

সন্দীপও হাসল।

একটু চুপ করে থেকে তাপসের বাবা আবার বলল, 'তারপর তোমাদের খবর-টবর বল। তোমার বাবা ভালো আছে?

'ওই এক রকম।'

'অনেককাল ও-পাড়ায় যাওয়া হয় না। কারো সঙ্গে দেখা-টেখাও হয় না। অথচ যেতে খুব ইচ্ছে করে।'

সন্দীপ উত্তর দিল না।

তাপসের বাবা আবার বলল, 'তোমার মা কেমন আছে?'

সন্দীপের স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে আসতে লাগল। বাড়িটাকে সে ভুলে থাকতেই চায়, অথচ যেখানেই সে যাক, বাড়িটা তার পিছু পিছু ধাওয়া করবেই। আর অদ্ভুত লোক তাপসের বাবা। ইমপোর্ট লাইসেন্স বাগিয়ে মালটিমিলিওনেয়ার হলে কী হয়, দশ-বারো বছর আগে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মাছিমারা কেরানিই ছিল। স্ট্রিমলাইনড্ ঝকঝকে বাড়িতে থাকলে কিংবা গাড়ি ছুটিয়ে বেরালেই বা কী হবে, তাঁর মধ্যে সেই মধ্যবিত্ত কেরানিটি থেকে গেছে। সেই তুচ্ছ অকারণ কৌতূহল, সেই ডাঁটা-চচ্চড়ি অসুখ-বিসুখের খবর নেওয়া। বিস্বাদ গলায় সন্দীপ বলল, 'ভালো না, একরকম শয্যাশায়ী হয়ে আছে।'

'কী হয়েছে?'

ক্যান্সারের কথাটা কি ভেবে আর বলল না সন্দীপ। সে শুধু বলল, নানারকম কমপ্লিকেটেড ব্যাপার।'

'ভালো করে ডাক্তার-টাক্তার দেখাচ্ছ তো?'

জড়ানো গলায় সন্দীপ বলল, 'হ্যাঁ—'

তাপসের বাবা বলল, 'কাকে দেখাচ্ছ?'

সন্দীপের ঘাম ছুটে গেল। চোখ বুজে জলে ঝাঁপ দেবার মতো করে সে বলল, 'ডাক্তার এ. কে. সান্যালকে—'

'এ. কে. সান্যাল—খুব বড় ডাক্তার নাকি?'

'হ্যাঁ।'

কি ভেবে তাপসের বাবা বলল, 'কই, এ নাম তো শুনিনি।'

মরীয়ার মতো সন্দীপ বলে যেতে লাগল, 'লণ্ডন থেকে হার্টে স্পেশালাইজ করে সবে এসেছে—'

'তাই হবে। নামকরাদের সবাইকেই চিনি। তোমার মাসিমার জন্যে এ-বাড়িতে উইকে দু'জন করে অন্তত আসছে।'

সন্দীপ চুপ করে থাকল।

তাপসের বাবা আবার বলল, 'আসছে তো, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। সে যাক, ডাক্তার সান্যালকে তোমার কিরকম মনে হচ্ছে?'

'ভালো—বেশ ভালোই।

'তোমার মা কিছু রিলিফ পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই।'

'তা হলে ভদ্রলোকের ওপর ভরসা করা যায় বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'ডাক্তার সান্যালের ঠিকানাটা দিয়ে যেও, তোমার মাসিমাকে একবার দেখাব। কেউ তো কিছুই করতে পারছে না।'

সন্দীপের নাক-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল, চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে এল। শেষ পর্যন্ত তাপসের মা-ই তাকে বাঁচিয়ে দিল। জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলল, 'না-না, নতুন ডাক্তার কবরেজে আর দরকার নেই। ওষুধ খেয়ে, ইঞ্জেকসান নিয়ে আর পারি না বাপু।'

তাপসের বাবা বলল, 'তাহলে আর কি। যে রুগী তারই যখন ইচ্ছে নেই, ঠিকানা থাক।'

ঘাম দিয়ে সন্দীপের জ্বর ছেড়ে গেল।

তারপর আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প হ'ল। জার্মানীর গল্প, সন্দীপ পার্মানেণ্টলি ইণ্ডিয়ায় ফিরে এসেছে কিনা, বোনেদের বিয়ে-টিয়ে হয়েছে কিনা, ভাইরা কে কি করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কথায় কথায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাপসের বাবা। বলল, 'সন্দীপ, তোমরা গল্প-টল্প কর। তোমার মাসিমা আর আমাকে একটা ডিনার পার্টিতে যেতে হবে।' সোফার হাতলে হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়ল ভদ্রলোক। তাপসের মা-ও উঠল।

তাপসের বাবা আবার বলল, 'সময়-টময় পেলে মাঝে মধ্যে এসো।'

সন্দীপ মাথা নাড়ল, 'আসব।'

তাপসের মা রিনিকে বলল, 'গল্পে গল্পে মনে ছিল না—সন্দীপকে চা দিস।'

ওরা চলে গেল।

এখন ড্রইংরুমে সন্দীপরা তিনজন। রিনি একটা বেয়ারাকে ডেকে চা-টা দিয়ে যেতে বলল। একটু পরে প্রচুর খাবার-দাবার এল। খেতে খেতে আবার গল্প শুরু হ'ল, সেই সঙ্গে হাসাহাসি—ঠাট্টা, মজা। এক ফাঁকে পিয়ানো বাজিয়ে ওয়েস্টার্ন সুরে একটা বাংলা গান শুনিয়ে দিল রিনি।

সন্দীপ বলল, 'ফাইন—'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

তারপর রাত বাড়লে সন্দীপ বলল, 'এবার যাওয়া যাক।'

তাপস বলল, 'এখন-ই যাবি ?'

'হ্যাঁ।'

'ক'টা এমন বাজে ?'

'দশটা।'

'নাইট ইজ টু ইয়াং ফ্রেণ্ড।'

'তা ঠিক।' সন্দীপ হাসল, 'তবু যাই। আমাদের ও-দিকটায় ন'টা বাজতে না বাজতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়।'

রিনি বলল, 'আবার কবে দেখা হবে ?'

সন্দীপ বলল, 'হবে একদিন।'

'আপনাকে ফোনে কোথাও পাওয়া যেতে পারে ?'

'না। আমাদের বাড়ি ফোন নেই।'

'তবে ?'

সন্দীপ মনে মনে একবার বাবার মুখটা ভেবে নিল। বুড়োটা চিরকাল কেরানি-.গিরি আর ওয়ান-টেন্‌থ অফ কুরুবংশ বানিয়েই কাটিয়ে দিলে। না করল একটা ঝকঝকে ভালো বাড়ি, না গাড়ি, না টেলিফোন। শহরতলীর অন্ধ গলিতে ওই শুয়োরের খোঁয়াড়টা যে তার পৈতৃক বাসস্থান ভাবতেই মাথা কাটা যায়। রাগে বিতৃষ্ণায় তার মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

রিনি বলল, 'এক কাজ করতে পারেন—'

সন্দীপ মুখ তুলল।

রিনি বলল, 'আমাদের বাড়িতে যদি ফোন করেন—'

তাপস ওধার থেকে চেঁচিয়ে উঠল' 'সেটা-ই বেস্ট। অবশ্য তুই আরেকটা কাজ করতে পারিস।'

'কী ?'

'আমাদের অফিসে ফোন করতে পারিস।'

সন্দীপ বলল, 'অফিসে তোকে ক'টা পর্যন্ত পাওয়া যায় ?'

একটু ভেবে তাপস বলল, 'দুটো পর্যন্ত নিশ্চয়ই ; তার পরে আনসার্টেন।'

'ঠিক আছে। তোদের বাড়ি আর অফিসের ফোন নাম্বার দে। তবে—'

'তবে কী ?'

'ফোন করবার আগেই হয়তো দুম করে তোর অফিসে গিয়ে হাজির হয়ে যাব।'

'গ্র্যাণ্ড—'

চোদ্দ

পরের দুটো দিন বাড়ি থেকে বেরুতেই পারল না সন্দীপ। পাড়ায় দারুণ উত্তেজনা। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চারদিকে শুধু গোলমাল আর শব্দ। তার ভেতর কে বেরুবে ? কলকাতায় ফেরার পর এত উত্তেজনা সে আর দ্যাখেনি।

সন্ধ্যের পরও বেরুবার উপায় নেই। কেননা কয়েক ঘণ্টা কর্ডন করে পর পর দু-দিন সার্চ হ'ল।

হারু প্রথম দিনই উত্তেজনার মুখে কোথায় চলে গেছে, আর ফেরেনি। কোথায় গেছে, কে জানে। হারুর ব্যাপারে সন্দীপের বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্ট নেই। তার কথা মনে হলেই দারুণ এক রাগ মাথার ভেতর লাভার মতো ফুটতে থাকে—অভদ্র, অবাধ্য।

আশ্চর্য, এর মধ্যে কিন্তু সংসারটা নিজের নিয়মে ঠিকই চলে যাচ্ছে। বাবা বাজার করছে, মাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে, সেঁক দিচ্ছে। গৌরী রমা ভোরে উঠে ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছে। আলো আর বৌদি রান্নাঘরেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। দাদার বাচ্চাগুলো ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড়ে ধুলোবালি মেখে ভূত সাজছে। সেই ক্লান্তি-কর পরিচিত ছক।

হারু যে চলে গেছে, সে জন্য মা আর বড়দি ছাড়া কারো বিশেষ উদ্বেগ নেই। আদৌ ইচ্ছা ছিল না, তবু নিজের অজান্তেই বাবাকে ফস করে সন্দীপ জিজ্ঞেস করে বসল, 'হারুটা গেছে কোথায় ?'

বাবা ভুরু কুঁচকে বিরাগের গলায় বলল, 'কে জানে—'

'ফিরবে কবে ?'

'সে-ই বলতে পারে।'

'মাঝে মাঝে এ-রকম চলে যায় নাকি ?'

বাবা খুব অবাক হয়ে গেল। জার্মানী থেকে ফেরার পর বাড়ির কারো সম্বন্ধে এত প্রশ্ন করেনি সন্দীপ, এত কৌতূহল দেখায়নি। বিমূঢ়ের মতো সন্দীপকে দেখতে দেখতে বাবা বলল, 'হ্যাঁ।'

সেদিন স্লোগান-লেখা ক'টা খবর-কাগজ আর কিছু পত্র-পত্রিকা প্যামফ্লেট দেখে সন্দীপের মনে হয়েছিল হারু পার্টি-টার্টি করে। তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কী, সন্দীপ জানে না। হঠাৎ রাগ এবং বিদ্বেষের কথা ভুলে গিয়ে সন্দীপ মনে

মনে ঠিক করে ফেলল, হারুর সঙ্গে এ-বিষয়ে একটু আলোচনা করবে।

মাত্র ক'দিন হ'ল কলকাতায় এসেছে সন্দীপ। দশ বছরে এখানকার সবই প্রায় তার কাছে অপরিচিত হয়ে গেছে। প্রতিদিন খবর-কাগজে রক্তারক্তির খবর পড়ে এবং হাজার রকমের মিছিল দেখে শ্লোগান শুনে স্পষ্ট না হলেও তার মনে হয়েছে সারা দেশ জুড়ে উল্টোপাল্টা ঝড়ের হাওয়া বইছে। হারু হয়তো বাঙলা দেশের রাজনীতির ঠিক ছবিটা তাকে দিতে পারবে।

দু-দিন পর আবহাওয়া শান্ত হয়ে গেল।

তৃতীয় দিনের সকালে সন্দীপ স্নান-টান সেরে ঠিক করল একবার এসপ্ল্যানেডের দিকে যাবে। দু-দুটো দিন চুপচাপ ঘরে বসে থেকে কোমর-টোমর ধরে গেছে! এভাবে শুয়ে-টুয়ে থাকলে আর দেখতে হবে না; এক মাসেই সে অচল জড় পদার্থ হয়ে উঠবে।

বেরুতে যাবাব মুখে হঠাৎ মেজ জামাইবাবু এসে হাজির। চোখের কোলে শ্যাওলার মতো সেই কালচে থাক, দৃষ্টি ঘোলাটে—লাল, সাদা ফ্যাটফেটে পুরু ঠোঁট ঝুলে আছে। শালা যা মাতাল, এই সকাল বেলাতেই গলায় ঢেলে এসেছে নাকি? কিছু বিশ্বাস নেই মেজ জামাইবাবুকে।

সন্দীপ হাসল। বলল, 'বলা নেই কওয়া নেই, দুম করে আবির্ভাব যে?'

মেজ জামাইবাবুও খয়েরি দাঁত বের করে হাসল, 'হ্যাঁ, দুম করেই আসতে হ'ল। তুমি তো আর গেলে না।'

'মেজদি আসেনি?'

'না।'

'চলুন, ঘরে যাই—'

ঝুপসি বাগান থেকে বারান্দায় উঠতে উঠতে মেজ জামাইবাবু একবার রান্না-ঘরে উঁকি দিল। সেখানে আলো-কে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আমি এসে গেছি বড়দি; আমার জন্যে চাট্টী চাল নিয়ে নেবেন।'

মেজ জামাইবাবু-টা খুব অমায়িক আর ইনফরম্যাল। গলায় কাপড় দিয়ে দশবার হাতজোড় না করলে যারা আসে না, সে তাদের দলের না। এখন না হয় পুরনো হয়ে গেছে, মেজ জামাইবাবু যখন নতুন জামাই ছিল তখনও হুট হুট এসে পড়ত, যা পেত সুবোধ বালকের মতো খেত। কোন রকম ঝামেলা নেই, ফল্‌স্ প্রেসটিজ নেই। এই জন্য লোকটাকে খুব ভালো লাগে।

আচমকা বড়ো জামাইবাবুর কথা মনে পড়ে গেল, সে একেবারে মেজ জামাই-

বাবুর উল্টো। শুয়োরের বাচ্চাটার কত রকম যে বায়নাক্কা ছিল ! বাড়িতে হয়তো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, দশবার করে গলবস্ত্র হয়ে তাকে নেমন্তন্ন করে আসতে হ'ত ; নইলে আসতই না। হাজার বার সাধবার পর যদিও বা আসত, কথাবার্তা বলত খুবই কম, নাকটা ফুলিয়ে সবসময় আকাশের দিকে খাড়া করে রাখত। ব্লাডি বাগার-টার ভাব দেখে মনে হ'ত, তাদের বাড়ি পা দিয়ে চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ফেলেছে।

বড়ো জামাইবাবুর কথা ভাবতে গিয়ে সেই প্রতিজ্ঞাটার কথা আবার মনে পড়ল। সন্দীপ ঠিক করে রেখেছিল উল্লুকের বাচ্চাটার সঙ্গে একদিন দেখা করে তার ঘাড়ে দশ-বারোটা লাথি কষিয়ে আসবে। নিশ্চয়ই যাবে সে, শিগগিরই একদিন যাবে।

রান্নাঘর থেকে আলো গলা তুলে বলল, 'আচ্ছা—'

মেজ জামাইবাবু বলল, 'মা-বাবাকে বলে দিন আমি এসেছি। শালাবাবুর সঙ্গে একটু গল্প-টল্প করে মা'র ঘরে যাচ্ছি।'

আলো আবার বলল, 'আচ্ছা।'

মেজ জামাইবাবু সন্দীপের সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঢুকেই বিছানায় চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়ল।

সন্দীপ একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'একা একা এলেন, মেজদিকে আনলে ভালো লাগত।'

মেজ জামাইবাবুর ঘোলাটে চোখ নাচতে লাগল। ঝোলানো ঠোঁট খানিকটা টেনে তুলে সারা গা দুলিয়ে দুলিয়ে একচোট হেসে নিল সে। তারপর বলল, 'তোমার মেজদির আসবার উপায় নেই হে ব্রাদার-ইন-ল—'

'কেন ?'

'পরশু থেকে তার মাথা ঘুরছে। তার ওপর হুড় হুড় করে বমি।'

'বমি কেন ?'

মেজ জামাইবাবু কনুই'র ভর দিয়ে উঠে বসল। লাল সুপুরির মতো চোখ দুটো গোল করে বলল, 'হিল্লি-দিল্লি ইংল্যাণ্ড জার্মানী করে বেড়ালে কি হবে, তুমি এখনও নাবালকই আছ হে।'

কপাল কুঁচকে গেল সন্দীপের, 'তার মানে ?'

'সেদিন তোমার মেজদি এল, তাকে দ্যাখোনি ?'

'দেখব না কেন, কত গল্প-টল্প করলাম।'

'কি রকম দেখেছ ?'

'কি রকম বলতে ?'

মেজ জামাইবাবু একটা অশ্লীল মন্তব্য করল।

লোকটার জিভ বড়ো ঢিলে। কিছুই তার মুখে আটকায় না। সন্দীপ ধমকের গলায় বলল, 'কী বলছেন !'

মেজ জামাইবাবু পান-ছোপানো দাঁত বার করে থলথলে শরীরে ঢেউ তুলে তুলে আবার হাসল, 'একেবারে দুধের বাছা হয়েই রইলে শালাবাবু ! তোমার মেজদির—' বলেই গলা নামিয়ে আরেকটা মন্তব্য করল।

জার্মান আর স্ক্যানডিনেভিয়ান ছুকরিদের মধ্যে দশটা বছর কাটিয়ে দিলে কি হবে, মেজ জামাইবাবু যা খচ্চর, এখনও তার কান গরম করে তুলতে পারে। সন্দীপ বলল, 'আপনি একটা যাচ্ছেতাই—'

'তা যা বলেছ। তোমার মেজদিটা এমনিতেই ফুটবল হয়ে উঠেছে, ক'মাস পর যা একখানা আকার ধারণ করবে না ? দেখে শুনে মনে হচ্ছে, তোমার জোড়া ভাগনে আসছে।'

হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সন্দীপ, 'আপনার লজ্জা করে না।'

মেজ জামাইবাবু খানিকক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'লজ্জা করবে কেন ? অগ্নিসাক্ষী করে তোমার বোনকে বিয়ে করেছি। ধর্মপত্নীর গর্ভে সন্তান হবে, শাস্ত্রে এর অনুমোদন আছে। রীতিমতো লীগ্যাল ব্যাপার। সোসাইটি ঢালা অর্ডার দিয়ে রেখেছে। ঐ যে বলে পুত্রার্থে ক্রিয়তে—'

আপনার বয়েস কত হ'ল ?'

'ম্যাট্রিকুলেসন সার্টিফিকেট ধরলে ফরটি এইট-টেইট ; আসলে ফিফটি টু। কেন, বয়েস দিয়ে কী হবে ?'

'এই বয়েসে ছেলেপুলে হওয়া উচিত না।'

'ইওরোপ-টিওরোপ চষে এসে এটা তুমি কী বলছ ব্রাদার ?'

সন্দীপ ভ্রূ কুঁচকে রইল।

মেজ জামাইবাবু বলতে লাগল, 'সাহেব-সুবোদের শুনি আশী বছরেও বাচ্চা-কাচ্চা হয়। আশী হতে এখনও আমার তিরিশ বছর দেরী।'

'ওদের কথা ছাড়ুন। যে বয়েসেই ছেলেপুলে হোক, ওরা মানুষ করতে পারে। আমাদের সে অবস্থা আছে নাকি ? কত আর মাইনে পান ! তার অর্ধেক তো ভাটিখানার লোকেরা নিয়ে যায়। চারটে ছেলেমেয়ে তো ছিলই, তার ওপর যদি আরেকটা বাড়ে কিভাবে মানুষ হবে ?'

মেজ জামাইবাবু আবার টান টান শুয়ে পড়ল, 'ও-সব ভাবি না পচাবাবু, ওই

যে কথায় বলে না, 'জিভ দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি', আমার হয়েছে সেই মন্ত্র। তা ছাড়া—'

'কী?'

মেজ জামাইবাবু আবার হাতের ভর দিয়ে উঠে বসল। সন্দীপের কানের কাছে মুখ এনে গুপ্ত তথ্য ফাঁস করবার মতো কিছু বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বলল না। আবার শুয়ে পড়ল।

এদিকে চোখ কুঁচকে যেতে লাগল সন্দীপের। জার্মানীতে থাকতে একটা বই তার হাতে এসেছিল, নামটা অদ্ভুত—'জিওগ্রাফি অফ হাঙ্গার'। পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে আস্ত বইটাই পড়ে ফেলেছিল। দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এশিয়ার ক্ষুধার্ত গরীব দেশগুলোতে খাদ্য-টাদ্য নেই, খাদ্য নেই তাই জীবনীশক্তিও ক্ষীণ। হৈ-হুল্লোড় করে যে এখানকার মানুষ দিন কাটাবে সে ক্ষমতাও নেই, তেমন সুযোগও নেই। অথচ ইওরোপ-টিওরোপে একেবারে উল্টো হাওয়া। সেখানে প্রচুর খাবার-দাবার, প্রচুর ড্রিংকস্, প্রচুর স্বাস্থ্য, প্রচুর ফান, প্রচুর ফ্রলিক আর হুল্লোড়বাজি। রাস্তায় মোড়ে-মোড়ে হাজার রকমের এণ্টারটেনমেণ্ট ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আর এখানে আনন্দ বলতে একটাই—সেক্স এনজয়মেণ্ট। তাই বোধ হয় তারা দশ ভাইবোন, তাপসের ভাষায় ওয়ান-টেন্থ্ অফ কুরুবংশ, এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরেই আনন্দর পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ে, মেজদিটার আবার একটা বাচ্চা হবে।

স্ট্যাটিসটিকস্ দেখলে মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যায়। যে হারে ছারপোকার মতো মানুষ জন্মাচ্ছে তাতে এই কলকাতা শহরে দশ-পনেরো বছর পর আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

মেজ জামাইবাবুর দিকে তাকিয়ে আনন্দ'র কথা মনে পড়ল, বাবার মুখটাও চট করে একবার ভেবে নিল সন্দীপ। ওদের সবার ওপর রাগও হচ্ছে, আবার করুণাও।

এক সময় সন্দীপ বলল, 'তারপর বলুন, হঠাৎ কী মনে করে?'

মেজ জামাইবাবু উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা ছিল তোমার সঙ্গে?'

'কী কথা?'

'আমাদের বাড়ি যাবার—'

'নানা ঝামেলায় একদম ভুলে গিয়েছিলাম—' শরীরটা পেছনে হেলিয়ে হাত টান-টান করে আর্মচেয়ার হ'ল সন্দীপ।

মেজ জামাইবাবু বলল, 'তুমি গেলে না বলেই আমাকে ছুটে আসতে হ'ল।

মাঝখান থেকে একটা ক্যাজুয়াল লিভ মাটি। তারপর তুমি আমাদের ওখানে যাচ্ছ কবে বল—'

'যাব একদিন।'

'একদিন-ফ্যাকদিন না ; ঠিক ডেট দাও।'

'ব্যাপারটা কী বলুন তো ; এত তাড়া কিসের ?'

মেজ জামাইবাবু অভিমানের গলায় বলল, 'এ্যাদ্দিন পর এলে, তোমাকে দুটো ডাল-ভাত খাওয়াতে আমাদের ইচ্ছে হয় না ?'

সন্দীপ বলল, 'খাবার জন্যে কি আছে ; একদিন হুট করে গিয়ে হাজির হয়ে যাব।'

'তুমি যখন হাজির হবে আমি হয়তো থাকব না। কবে যাবে বল, সেদিন না হয় আরেকটা ক্যাজুয়াল লিভ নেব। আর—'

'কী ?'

'হেঁ-হেঁ বাবা—' ঠোঁট টিপে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেজ জামাইবাবু বলল, 'তোমার জন্যে একটা জিনিস যোগাড় করে রেখেছি।'

'কী জিনিস ?'

'এক শিশি অমৃত—খাঁটি স্কচ। কোত্থেকে এক ছোকরা হাপিস করে এনেছিল। আমি গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে বাগিয়ে নিলাম। তুমি গেলে ছিপি খুলব।'

সন্দীপ উৎসাহিত হ'ল, 'তবে তো যেতেই হয়। আচ্ছা, আজ হ'ল বুধবার, আসছে সোমবার নিশ্চয়ই যাব।'

'কখন যাবে ?'

'বিকেলের দিকে।'

'রাত্তিরে ওখানে থাকবে কিন্তু—'

'সে তখন দেখা যাবে।'

'পাক্কা বাত ?'

'ইয়েস।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মেজ জামাইবাবু খুব ঘনিষ্ঠ স্বরে বলল, 'হ্যাঁ হে, সেই বোতলটা তো সেদিন সাবাড় হয়ে গেল, তারপর আর এনেছ-টেনেছ নাকি ?'

সন্দীপ মাথা নাড়ল, 'না, বাড়িতে আনার ভীষণ ঝামেলা। ওই জিনিসটার ব্যাপারে সবার এত ছুঁচিবাই—'

'তা যা বলেছ। আরে বাবু ডাল খাচ্ছিস, ভাত খাচ্ছিস, দুধ খাচ্ছিস, মাছ

খাচ্ছিস। যত দোষ নন্দ ঘোষের বেলায়। কেউ বোঝে না, এটাও তো একটা খাবার জিনিস রে বাবা। নইলে ঈশ্বরের জগতে ওটা সৃষ্টি হ'ল কেন? অ্যাঁ, তুমিই বলো—'

সন্দীপ চুপ করে থাকল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর মেজ জামাইবাবু থ্যাসথেসে মোটা শরীর নিয়ে শুয়ে পড়ল, 'একখানা দিবানিদ্রা দিয়ে নেওয়া যাক হে শালাবাবু—'

সন্দীপ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুমোন না।'

'তুমিও একটু গড়িয়ে নাও।' কথা বলতে বলতে গলা জড়িয়ে এল মেজ জামাইবাবুর, একটু পরেই নাক ডাকতে লাগল।

মে মাসের গরমে ঘরটা ফার্নেস হয়ে উঠেছে। মেজ জামাইবাবুর সারা গায়ে পুন পুন করে ঘামের দানা বেরিয়ে একটা সমুদ্র হয়ে গেল। জবজবে শরীরে তাকে এখন একটা ঝোল-মাখানো প্রকাণ্ড গ্রেভি চপের মতো দেখাচ্ছে।

বসে বসে কিছুক্ষণ মেজ জামাইবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকল সন্দীপ। ভাবল, এই সুযোগ, ঘুম থেকে উঠে আবার হয়তো বকবকানি শুরু করবে লোকটা। সট করে উঠে দাঁড়িয়ে ট্রাউজার্স আর শার্ট গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল সন্দীপ।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আজ আর রকগুলোতে সেই ছেলেগুলোকে দেখা গেল না। তারা কোথায় গেছে, কে জানে। মাঝে মাঝে থাকে ছেলেগুলো, তারপর আচমকা কোথায় যে চলে যায়।

প্রায় নির্জন গলিটা দিয়ে অন্যমনস্কের মতো হেঁটে যাচ্ছিল সন্দীপ। ভাবছিল এসপ্ল্যানেডে গিয়ে একবার তাপসদের অফিসে যাবে। খানিকটা আড্ডা দেওয়া যাবে ওর সঙ্গে। তক্ষুণি সন্দীপের মনে পড়ে গেল, দুটোর পর তাপসকে অফিসে পাওয়া আনসার্টেন। তবু একবার গিয়ে দেখবে; যদি পাওয়া যায়। নাকি যোধপুর পার্কে ফোন করবে? রিনি তো করতে বলেছিলই, ফোন নাম্বারও দিয়ে দিয়েছিল।

মনের ভেতর যখন দড়ি টানাটানি চলছে সেই সময় সন্দীপ গলি থেকে বড়ো রাস্তায় এসে পড়ল। এই দুপুর বেলায় ভিড়-টিড় নেই, এখন ট্রামে উঠলেও হাত-পা ছড়িয়ে বসবার জায়গা পাওয়া যাবে। সন্দীপ ট্রাম স্টপেজে গিয়ে দাঁড়াল। দূরে একটা ট্রাম দেখা যাচ্ছিল, মে মাসের রোদে জ্বলতে জ্বলতে ট্রামটা রুপোর তীরের মতো ছুটে আসছিল।

ট্রাম স্টপেজের কাছে একটা পুরনো ভাঙা মন্দির। তার এক চিলতে ছায়া

রাস্তার এক ধারে হেলে ছিল, সেখানে দু-তিনটে লোক জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। সন্দীপ তাদের লক্ষ্য করেনি।

ট্রামটা তখনও বেশ দূরে, আচমকা মন্দিরের সেই ছায়া থেকে একটা লোক প্রায় ছুটতে ছুটতেই সন্দীপের দিকে চলে এল। তার ঘাড়ের কাছে থেকে শ্লেষ্মা-জড়ানো ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকল, 'সন্দীপ—'

চমকে সন্দীপ মুখ ফেরাল—হেরম্ববাবু তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় একই রকম আছে হেরম্ববাবু, তবে একটু কুঁজো হয়ে গেছে, অনেকখানি রোগা, ছুরি দিয়ে দাগ টানলে যেমন হয়, সারা মুখে বয়েসের অগুনতি রেখা।

মাংস সেদ্ধ করলে হাড়টাড়গুলো যেমন নরম হয়ে যায়, সন্দীপের মনে হ'ল তার শিরদাঁড়াটা অবিকল সেই রকম হয়ে যাচ্ছে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে এক্ষুণি হয়তো হুড়মুড় করে সন্দীপ পড়ে যাবে।

হেরম্ববাবু আবার বলল, 'আমায় চিনতে পারছ?'

অমন যে ঘাঘী সন্দীপ, তার গায়ে ঘাম ঝরছিলই, এবার গল গল করে স্রোত নামল। ঘামের মধ্য দিয়ে তার শরীরের সব সত্ত্ব আর ভাইটালিটি যেন বেরিয়ে যেতে লাগল। ভয়ানক দুর্বল বোধ করল সে, এবং নার্ভাস।

চুক্তি অনুযায়ী এই লোকটা এখনও তার ভাবী শ্বশুর; একে কি প্রণাম করা দরকার? প্রণাম করবে কি করবে না যখন ভাবছে, হেরম্ববাবু বলল, 'মনু বলছিল তুমি নাকি বারো-চোদ্দ দিন হ'ল কলকাতায় ফিরেছ—'

'হ্যাঁ।'

'এ-ক'দিন খুব ব্যস্ত ছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, মানে—'

'তাই বোধ হয় আমাদের বাড়ি যেতে পারোনি—'

সন্দীপ চুপ।

হেরম্ববাবু বলল, 'আমরা কিন্তু তোমাকে খুব আশা করেছিলাম।'

সন্দীপ এবারও উত্তর দিল না।

হেরম্ববাবু বলতে লাগল, 'রোজই ভাবি তুমি আসবে, তুমি আসবে। কিন্তু আসো আর না।'

সন্দীপ এতক্ষণে বলল, 'যাব যাব আমিও কতদিন ভেবেছি। রোজই একটা না একটা ঝঞ্ঝাট জুটেছে।'

হেরম্ববাবু হয়তো বিশ্বাস করল না। ঘোলাটে ধূসর চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'অ, তাই বুঝি—'

সন্দীপ থমকে গেল, একটু ভেবে বলল, 'কত রকমের লোক যে এ-ক'দিন এসেছে!'

ঝকঝকে লোহার পাতের ওপর দিয়ে ট্রামটা ঝড়াং ঝড়াং করে এসেই কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়াল, তারপর হুস করে বেরিয়ে গেল। হেরম্ববাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ট্রামটা আর ধরা গেল না।

সন্দীপ বলল, 'আপনি বোধহয় কোথাও যাচ্ছিলেন—'

'হ্যাঁ, ধর্মতলায়। কেন?'

'আমার জন্যে ট্রামটা ধরতে পারলেন না।'

'আমি ধরতে চাইলে কারো জন্যে কি আর আটকাতো। ভাবছি আজ আর ধর্মতলা যাব না।'

সন্দীপ অবাক। মে মাসের চড়চড়ে রোদে মাইল দেড়েক হেঁটে এসে হেরম্ববাবু হঠাৎ কেন যে মতটা বদলে ফেলল বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক সে কিছু জিজ্ঞেস করল না, সন্দেহের চোখে এক পলক তাকাল শুধু।

হেরম্ববাবু শুধলো, 'তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

'একটু এসপ্ল্যানডের দিকে।'

'দরকার আছে?'

'না, তেমন কিছু না—' বলতে গিয়েই জিভে যেন পিন ফুটল। ঝট করে থেমে গেল সন্দীপ।

'তা হলে তো ভালোই, খুব ভালো—' হেরম্ববাবু ডাইনে-বাঁয়ে দু-ধারে মাথা নেড়ে বলল, 'জরুরী কাজটাজ যখন নেই তখন আমার সঙ্গে চল।'

মুহূর্তে গলার ভেতরটা একরাশ খরখরে বালি হয়ে গেল, ব্লটিং পেপার দিয়ে জিভের সব লালা কেউ যেন পলকে শুষে নিল। দমবন্ধ গলায় সন্দীপ বলল, 'কোথায়?'

'আমাদের বাড়ি।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ এখনই। অবশ্য—'

'কী?'

'মনু জানতে পারলে খুব রেগে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো—'

সন্দীপ ভীত চোখে তাকিয়ে থাকল।

হেরম্ববাবু বলল, 'হাজার হোক আমি বাপ তো। মেয়ে রেগে যাবে বলে, মাথা গরম করবে বলে আমি হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে পারি না।

তোমার সঙ্গে আমার কিছুটা বোঝাপড়া আছে। এসো—' বলেই হাঁটতে শুরু করল হেরম্ববাবু।

হেরম্ববাবুর হাঁটার ধরনটা হুবহু সেই রকমই আছে; তেমনই ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে টাল খেতে-খেতে হাঁটা।

কি আশ্চর্য, একসময় সন্দীপ আবিষ্কার করল সে হেরম্ববাবুর পিছু পিছু চলেছে। অদৃশ্য একটা বঁড়শি নাকে আটকে দিয়ে টানতে টানতে তাকে নিয়ে যাচ্ছে হেরম্ববাবু। ব্লাডি বাগার, সারা দুনিয়া চষে এসে একটা রিফিউজি ফুট-পাথের দোকানদার কিনা তোকে স্রেফ তুড়ি দিয়ে-দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে, শালা তোর বারোটা বেজে গেছে—সন্দীপ নিজেকেই বলল। গোঁয়ারের মতো একবার ভাবল, হেরম্ববাবুর সঙ্গে যাবে না। ভাবা পর্যন্তই, হেরম্ববাবুকে অগ্রাহ্য করে সে কিছুতেই ফিরতে পারল না। সন্দীপ বিরক্ত হচ্ছিল, অসন্তুষ্ট হচ্ছিল, ক্রুদ্ধ হচ্ছিল, তবু হেরম্ববাবুর সঙ্গে না গিয়ে যেন উপায় ছিল না। অনিবার্য নিয়তির মতো, না-কি চতুর জাদুকর সেজে হেরম্ববাবু তাকে কোন সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তায় একটা কথাও হ'ল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা রিফিউজি কলোনিতে পৌঁছে গেল।

কলোনিটাকে এখন আর চেনাই যায় না। দশ বছর আগে এখানকার সব বাড়ি-ঘরই ছিল কাঁচা; বাঁশ আর টালি-ফালি দিয়ে তৈরি। এখন কাঁচা বাড়ির সংখ্যাই কম, একতলা দোতলায় চারদিক ছেয়ে গেছে।

অশোকদের বাড়িটাও আগের মতো নেই। মেঝে পাকা হয়েছে, ইঁটের দেয়াল উঠেছে, অবশ্য ছাদ নেই, ছাদের জায়গায় ঝকঝকে টিনের চালা। সামনের উঠোনটা বাঁধিয়ে নেওয়া হয়েছে।

উঠোন থেকেই হেরম্ববাবু চেঁচিয়ে ডাকল, 'কই গো, কোথায় গেলে, ত্যাখো কাকে ধরে এনেছি—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুবদিকের ঘরের দরজায় যে এসে দাঁড়াল—তাকে দেখে চমকে উঠল সন্দীপ। এ-বাড়ি না হয়ে অন্য কোথাও হলে চট করে তাকে চিনতেই পারত না। অশোকের মা'র চেহারাটা দারুণ খারাপ হয়ে গেছে। সেই আহ্লাদী পুতুলের মতো মুখখানা ভেঙেচুরে কেমন যেন হয়ে উঠেছে। কানের দু'ধারে একটা চুলও আর কাঁচা নেই, উজ্জ্বল ভাসাভাসা চোখ দুটোর ওপর ধূসর ছায়া পড়েছে।

হেরম্ববাবু বলল, 'একে চিনতে পারছ?'

অশোকের মা বলল, 'কথা শোন, চিনতে পারব না! এসো বাবা, এসো—'

সন্দীপকে নিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে হেরম্ববাবু বলল, 'সন্দীপ হয়তো আমার ওপর খুব রেগে আছে, বুঝলে ?

'কেন ?'

'রাস্তা থেকে ওকে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে এলাম, তাই—'

অশোকের মা উত্তর দিল না।

ওরা সামনের একটা ঘরে গিয়ে বসল। অশোকের মা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

হেরম্ববাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনুটা বাড়ি নেই; থাকলে সন্দীপকে আনা যেত না। অথচ ওর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।'

অশোকের মা বললেন, 'কী যা-তা বলছ! ছেলেটা এ্যাদ্দিন পর এল। তার সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে ক্ষেপে উঠলে! কথার কি ছিরি!'

হেরম্ববাবু ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরিয়ে নিল, ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অস্পষ্ট জড়ানো গলায় কিছু একটা বলল।

অশোকের মা এবার সন্দীপকে বলল, 'মনুর মুখে শুনেছি, দু-হপ্তা হ'ল তুমি দেশে ফিরেছ।'

'কলকাতায় এসেছ অথচ আমাদের সঙ্গে দেখা করোনি কেন, এমন কি ব্যস্ত যে এত-দিনে একবারও আমাদের বাড়ি আসতে পারলে না, রাস্তা থেকে ধরে আনতে হ'ল—' এ জাতীয় প্রশ্নের আশঙ্কায় এবং অস্বস্তিতে দমবন্ধ করে স্ট্যাচু হয়ে থাকল সন্দীপ।

কিন্তু অশোকের মা সেদিক দিয়েই গেল না। আস্তে করে বলল, 'বিলেতে ভালো ছিলে তো বাবা?'

অশোকের মা'র কাছে আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-জার্মানী-রাশিয়া-স্কাণ্ডিনেভিয়া—সবই বিলেত। বুকের ভেতর আটকানো বাতাসটা আস্তে আস্তে বার করে দিয়ে সন্দীপ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'তোমাদের বাড়ির সবাই ভালো আছে?'

'মা খুব অসুস্থ; আর সবাই ভালো আছে।'

'হ্যাঁ, তোমার মা'র খবর মনুর কাছে রোজই পাই। একদিন দেখে আসব।'

সন্দীপ চুপ।

অশোকের মা আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে বললেন, 'ঐ ছ্যাখো, আমার কি-ভুলো মন! এ্যাদ্দিন পর এলে, কী খাবে বল? চা করবো—'

'না-না, এখন আর চা খাব না।'

'যা গরম, একটু লেবুর সরবত করে দিচ্ছি।'

'কিছু দিতে হবে না।'

'তাই কখনো হয়।' অশোকের মা চলে গেল।

একটু চুপচাপ। তার পর খুক খুক কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে হেরম্ববাবু বলল, 'তা হলে কাজের কথাটা সেরে নেওয়া যাক—'

বুকের ভেতর বিশ টনের ক্রেন ছিঁড়ে পড়ার শব্দ হ'ল। সন্দীপ এক পলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।

হেরম্ববাবু এবার সোজাসুজি বলল, 'মনু অবশ্য ঘাড় বাঁকিয়ে ফেলেছে কিন্তু তোমার মুখেই আমি শুনতে চাই।'

'কী?'

'মনুর বিয়ের ব্যাপারে কী ঠিক করলে?'

এই প্রশ্নটাই যে হেরম্ববাবু করবে, সন্দীপ জানত। তবু তার মনে হ'ল, এই ঘরটায় হাওয়া চলাচল হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। অসহায় ভাবে এদিক-সেদিক দু-একবার তাকিয়ে নিল সন্দীপ, অশোকের মা যদি এই সময়টা থাকত! সরবত করতে কতক্ষণ লাগে কে জানে। শিথিল কাঁপা গলায় সন্দীপ বলল, 'পরে এ-নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

'পরে না, আজ এখনই যা বলবার বল।'

সন্দীপ চুপ করে থাকল।

হেরম্ববাবু আবার বলল, 'দশ বছর তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি; আর পারব না। আমি ব্যবসাদার মানুষ, কারবারে টাকা লাগিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে থাকা আমার স্বভাব—কিন্তু আমার ধৈর্যও শেষ হয়ে এসেছে।'

সন্দীপ এবারও উত্তর দিল না।

দুম করে এবার হেরম্ববাবু বলল, 'টালবাহানা না করে আমাকে একটা কথা খোলসা করে বলো তো—'

আবছা গলায় সন্দীপ বলল, 'কী?'

'তুমি কি ও-দেশে বিয়ে-টিয়ে করে ফেলেছ?'

সন্দীপ চমকে উঠল, 'কই না তো। কে বললে?'

'কেউ বলেনি। দশ বছর ওখানে আছ, ভাবলাম বোধহয় একটা জার্মান শ্বশুর-টশুর জুটিয়ে ফেলেছ।'

সন্দীপের মস্তিষ্কের ভেতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। সে কিছু বলল না।

হেরম্ববাবু থামেনি, 'কিছু মনে কোরো না, তোমাকে এবার ক'টা খারাপ কথা বলব—'

সন্দীপ তাকিয়ে থাকল। সে যেন কিছু শুনতে পাচ্ছিল না, বুঝতে পারছিল না, তার মাথার ভেতরটা দ্রুত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল।

হেরম্ববাবু বলতে লাগল, 'তোমার সঙ্গে মনুর কী কথা হয়েছে জানি না। জানবার দরকারও নেই। তবে মনুর কথা শুনে মনে হ'ল, এ-বিয়েতে তার মত নেই। সে তো বলেই খালাস, কিন্তু আমার কথাটা ভাবো—'

সন্দীপ এবারও চুপ।

'আমি দোকানদার মানুষ, তিন বছর হাঁটাহাঁটি করে তিন হাজার টাকার বিজনেস লোন বার করেছিলাম। সেটা ব্যবসাতে না খাটিয়ে তোমার পেছনে লাগিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো কাজে এল না। মনু আমাকে বলে, ভাবো, ওই টাকাটা তোমার জলে গেছে। বললেই তো হ'ল না। টাকাটা যদি আমি খাটাতাম, এই দশ বছরে ফেলে-ছড়িয়ে কম করে দশ-পনেরো হাজার টাকা মুনাফা হ'ত। হ'ত কি না?'

সন্দীপ কী উত্তর দেবে, ভেবে পেল না।

হেরম্ববাবু দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতো বলে যেতে লাগল, 'পনেরো হাজার আর ধরলাম না। তুমি আমাকে দশ হাজার আর আসল তিন হাজার মোট তেরো হাজার টাকা দিয়ে দিও। তোমার ওপর আমার আর কোন দাবি থাকবে না। তোমাকে ঋণ থেকে খালাস করে দেব।'

সরবতের গেলাস হাতে করে অশোকের মা ঘরে ঢুকল। হেরম্ববাবুর শেষ দিকের কথাগুলো তার কানে গিয়েছিল। বলল, 'কার ঋণের কথা বলছ?'

হেরম্ববাবু বলল, 'সে আছে।'

সন্দীপ বুঝল, স্ত্রীর সামনে ওই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চায় না হেরম্ববাবু। সে খানিকটা আরাম বোধ করল।

সরবত খাবার ইচ্ছেটা ধোঁয়া হয়ে উবে গিয়েছিল। কিন্তু না খেয়েও উপায় ছিল না। অশোকের মা ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সময় সময় স্নেহ-টেহর মতো ব্যাপারগুলোও কি সাঙ্ঘাতিক আর কষ্টদায়কই না হয়ে উঠতে পারে! চোখ বুজে ঢক করে নিমের রস গেলার মতো গেলাসটা গলার ভেতর উপুড় করে দিল। তারপর স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মতো সট করে উঠে দাঁড়াল, 'এখন আমি যাই।'

অশোকের মা কিছু একটা অনুমান করেছিল। বলল, 'এক্ষুণি যাবে?'

'হ্যাঁ—'

'আবার কবে আসবে?'

আধফোটা অস্পষ্ট স্বরে সন্দীপ কী বলল, নিজেই বুঝতে পারল না। সে ঘরের

বাইরে পা বাড়াল।

হেরম্ববাবু বলল, 'আমার কথাটা মনে রেখো—'

'আচ্ছা—' লম্বা পায়ে বারান্দা থেকে উঠোনে নামল সন্দীপ।

উদ্বিগ্ন মুখে একবার ঘরের ভেতরটা দেখল আশোকের মা, একবার দেখল সন্দীপকে তারপর দ্রুত উঠোনে নেমে ডাকল, 'সন্দীপ—'

সন্দীপ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অশোকের মা বলল, 'এ্যাদ্দিন পর এলে—বসতে না বসতেই চলে যাচ্ছ যে?'

'অনেকক্ষণ তো বসলাম।'

একটু চুপ থেকে অশোকের মা বলল, 'মনুর বাবা তোমাকে কী বলছিল?'

দাঁতের ফাঁকে কাঁকর পড়ার মতো সন্দীপ অস্বস্তি বোধ করল, 'কই কিছু না তো—'

'তুমি লুকোচ্ছ—'

'না-না, লুকোব কেন?'

'আমার মন বলছে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।'

সন্দীপ হাসতে চেষ্টা করল, 'কিছু হয়নি।'

'না হলেই ভালো—' বিষণ্ণ চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল অশোকের মা। তারপর বলল, 'আমাকে খুলে বললেই পারতে সন্দীপ। অত বড়ো মেয়ে গলায় কাঁটার মতো আটকে আছে। আমার কষ্ট কেউ বোঝে না।' অশোকের মা'র গলা ভারী হতে হতে বুঁজে এল। সে আর দাঁড়াল না, এলোমেলো পায়ে ঘরে ফিরে গেল।

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সন্দীপ, তারপর কলোনির কাঁচা সরু রাস্তায় বেরিয়ে এল।

কলোনিটা পেছনে ফেলে অন্যমনস্ক লক্ষ্যহীন সন্দীপ মিউনিসিপ্যালিটির খোয়া ওঠা রাস্তায়-রাস্তায় অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল। হেরম্ববাবু—হ্যাট টালমাটালবাবু, এ-ভাবে বাড়িতে ধরে এনে টাকাটা ফেরত চাইতে পারে—সে ভেবে উঠতে পারছিল না। তিন হাজার টাকাকে সুদে ফুলিয়ে লোকটা তেরো হাজারে দাঁড় করিয়েছে। তেরো হাজার টাকা সন্দীপের কাছে কিছু না, কিন্তু তাই বলে চাইবে? হঠাৎ সাজ্ঘাতিক রাগ হতে লাগল সন্দীপের। তার ব্লাড প্রেসার নেই, তবু মাথা এবং ঘাড়ের কাছটা চিন চিন করতে লাগল। তবে কি সব রক্ত গিয়ে মাথায় চড়েছে?

একটা থার্ডক্লাশ বাজে লোক প্রায় তুড়ি দিয়ে দিয়েই ট্রাম রাস্তা থেকে তাকে বাড়ি নিয়ে গেল, কি আশ্চর্য! তাকে একবারও বাধা ছায়নি সন্দীপ। সেই লোকটা তাকে যা খুশি তাই বলে গেল। তখনও সে চুপ। হেরম্ববাবুর সামনে অত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল কেন? এবার নিজের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সন্দীপ। তেরো হাজার টাকা—থারটিন থাউজেণ্ড রুপীজ—দিয়ে দেবে সে। নাকের ওপর ছুঁড়ে দেবে। ফুঃ! যত সব ভিখিরি—বেগারস—

হেরম্ববাবুকে খিস্তি-টিস্তি করে মনের রাগ এবং উত্তেজনার অনেকখানিই বার করে দিতে পারল। তবু মেজাজটা বিশ্রী হয়েই রইল।

গ্রীষ্মের বেলা এর মধ্যে অনেকটা হেলে গেছে। গনগনে রোদ জুড়িয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন প্রচুর বাড়িঘর উঠলেও শহরতলীর এ-দিকটায় এখনও বেশ গাছপালা। গাছের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। পুব আর দক্ষিণ দিক থেকে জোর হাওয়া দিচ্ছিল। উল্টোপাল্টা হাওয়ার ঘূর্ণিতে ধুলোবালি গাছের পাতা পাক খেয়ে-খেয়ে উড়ছিল। মাথার ওপর অজস্র পাখি।

কব্জি উল্টে সন্দীপ দেখল ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে। এখন আর এসপ্ল্যানেডে গিয়ে কী হবে? তাপসকে পাওয়া যাবে না। শুধু শুধু যাওয়া-আসাই সার।

সন্দীপ বাড়ি-ই ফিরে এল।

মেজ জামাইবাবুটা এখনও আছে। তার কথা মনেই ছিল না। সন্দীপ দেখল বাইরের বারান্দায় ফাটা কাপে চা খেতে খেতে বড়দির সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে সে। দারুণ ঘুমিয়েছে। তাই মুখ-টুখ ফোলা।

মেজ জামাইবাবু তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'বেশ, বেশ ছেলে তো তুমি—'

সন্দীপ বলল, 'কেন, কী করলাম?'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছি; এই ফাঁকে সটকে পড়লে?'

সন্দীপ অন্যমনস্কের মতো হাসল। বার বার হেরম্ববাবুর মুখটাই মনে পড়ে যাচ্ছিল তার।

মেজ জামাইবাবু আবার বলল, 'গিয়েছিলে কোথায়?'

'কাছেই।' সন্দীপ সরল মুখে ডাহা মিথ্যে বলে গেল, 'আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, আমার কিন্তু ঘুমটুম আসছিল না। ভাবলাম একটু ঘুরে-টুরে আসি। আপনি জেগে উঠবার আগেই ফিরব।'

আলো বলল, 'চা খাবি পচা?'

'চা? না—আচ্ছা দে—' সন্দীপ নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ট্রাউজার্স আর

বুশশার্ট ছেড়ে পাজামা গেঞ্জি পরতে-পরতে চা এসে গেল। আলোই দিয়ে গেল। মেজ জামাইবাবু তার কাপ-টা হাতে করে বারান্দা থেকে ঘরে চলে এল।

মেজ জামাইবাবু বলল, 'ভেবেছিলাম আমি থাকতে থাকতে তুমি আর ফিরলে না। আচ্ছা এখন চলি। আসছে রোববারের কথাটা কিন্তু ভুলো না। যাবে কিন্তু—'

সন্দীপ দুম করে বলল, 'আমি তো অনেকদিন ছিলাম না ; তাই জানিও না। এখানে বার-টার আছে ?'

'এই মিউনিসিপ্যাল এরীয়ায় বার ! বল কি হে শালাবাবু ; এ কি তোমার বার্লিন লণ্ডন পেয়েছ ? বার চাইলে পার্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গী যেতে হবে। তবে—'

'কী ?'

'বাজারের ওদিকটায় একটা দিশী মদের দোকান আছে।'

'দিশী মদ ? আচ্ছা তাই চলুন—'

'ব্যাপার কী হে—' মেজ জামাইবাবুকে অবাক দেখাল।

হেরম্ববাবু মেজাজটা খারাপই করে দিয়েছে। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রচুর খিস্তি-টিস্তি করেছে তবু রাগটা যাচ্ছে না। এক বোতল হুইস্কি যদি এই সময় পাওয়া যেত ! ঐ বাজে রট লোকটার মুখ সে ভুলতে চায়।

মেজ জামাইবাবু বলল, 'এক্ষুণি শুঁড়ির দোকানে যাবে ? এখনো তো সন্ধ্যে হয়নি।'

'আপনার মতো সমঝদার লোকের মুখে কিন্তু এরকম কথা আশা করিনি মেজ জামাইবাবু—'

'কেন ?'

'মাল খাব, তার আবার সকাল-সন্ধ্যে আছে নাকি।'

কথাটা মেজ জামাইবাবুর মনের মতো হয়েছে। খ্যাল-খ্যাল করে হেসে সে বলল, 'বেড়ে বলেছ ব্রাদার। সুধা চাখব, তার আবার দিনক্ষণ কী ? এভরি মোমেণ্টই শুভক্ষণ। তবে—'

'কী ?' সন্দীপ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'আমার এক বন্ধু আছে, সে পাঁজিপুথি অশ্লেষা-মঘা দেখে তবে ওয়াইন শপে ঢোকে।'

মেজ জামাইবাবুকে এই জন্য ভালো লাগে। লোকটা এমন মজার মজার কথা বলতে পারে ! সন্দীপ হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই পাজামা-টাজামা ছেড়ে ফের ট্রাউজার্স পরে নিল।

মেজ জামাইবাবুও ধুতি-পাঞ্জাবিতে ফিটফাট হয়ে নিল। বলল, 'আমি আর ফিরব না। সুধা চেখে ওখান থেকেই বরানগর ফিরে যাব।'

বাইরে এসে একবার মা'র ঘরে গেল মেজ জামাইবাবু। তারপর আলো আর বউদির কাছে বিদায় নিয়ে সন্দীপের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে মেজ জামাইবাবু বলল, 'আমার মনটা কিন্তু খুঁতখুত করছে—'

'কেন কী হ'ল?' সন্দীপ তার দিকে তাকাল।

'তোমার পেট তো আমাদের মতো না। আমাদের পেট হ'ল শালা ডাস্টবিন—যা-ই ফেলো না কেন ঠিক নিয়ে নেবে। কিন্তু তোমার হ'ল হুইস্কি-জিন-রাম, দামী দামী জিনিস-খাওয়া পেট। সেখানে কি দিশী কালীমার্কা মাল সইবে?'

'সইবে—সইবে। চলুন না—'

পনেরো

কালীমার্কা বাংলা মদের মহিমা আছে। নেশার ঘোরে সারা রাত বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়েছে সন্দীপ।

অন্য দিন আলো কি বৌদি এসে ঘুম ভাঙিয়ে চা দিয়ে যায়। আজ বাবার গলা শোনা গেল, 'পচা—পচা—'

হাই তুলতে তুলতে উঠে বসল সন্দীপ।

বাবার গদগদ গলা আবার শোনা গেল, 'দ্যাখ দ্যাখ, কারা এসেছে—'

সন্দীপ দরজার দিকে তাকাল—রিনি আর তাপস দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এ-বাড়িতে আসতে পারে, বিশেষ করে এই সকাল বেলায়, ভাবাই যায় না। অবাক চোখে তাকিয়েই থাকল সে। হঠাৎ কী মনে পড়তে দ্রুত নিজের দিকে চোখ ফিরল সন্দীপের। তার খালি গা, গরমের জন্য জামা-টামা খুলে শুধু একটা পাজামা পরে শুয়েছিল। পাজামাটা হাঁটু পর্যন্ত গুটনো। তাড়াতাড়ি সেটা পায়ের পাতা পর্যন্ত টেনে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে হ্যাঙ্গার থেকে বুশ শার্ট নামিয়ে পরে নিল। এবার মোটামুটি ভব্য হওয়া গেছে।

সন্দীপ বিব্রত মুখে হাসল, 'ওখানে কেন রে? আয় আয়—ভেতরে চলে আয়।'

বাবাও কুর্ণিশ করার ঢং-এ মাথা ঝুঁকিয়ে হাত নেড়ে বলল, 'এসো তাপস, এসো রিনি মা। তোমরা গরীবের বাড়ি আসবে, কল্পনাই করতে পারিনি। কি সৌভাগ্য আমার—'

বড়লোক দেখে বাবার হ্যাংলামি খুব খারাপ লাগল সন্দীপের। সে কিছু বলল না।

ঘরে ঢুকে একমাত্র চেয়ারটায় বসল রিনি, তাপস এদিক-ওদিক দেখে কিছু না পেয়ে সন্দীপের পাশেই বসে পড়ল।

ছেলের বন্ধু এসেছে, গল্প-টল্প করবে। বাবা কিন্তু সহজে নড়ল না। জোঁকের মতো ওদের গায়ে আটকে থাকল। ছেলেবেলা থেকেই সন্দীপ দেখে আসছে, পয়সাওলা লোক দেখলে বাবার কাছাকোঁচা খুলে যায়, তখন কী যে করবে ভেবে পায় না। এমন বড়লোকের পা-চাটা আর দ্যাখেনি সন্দীপ। সে খুব বিরক্ত হচ্ছিল।

বাবা হাত কচলে কচলে আর হেঁ-হেঁ করে তাপস আর রিনির সঙ্গে সমানে বকবক করতে লাগল। তাপসের বাবা-মা কেমন আছে, ব্যবসা কেমন চলছে, বছরে ক'লাখ টাকার বিজনেস হচ্ছে, কত লোক কাজ করে, যোধপুর পার্কেরটা ছাড়া আর কোন বাড়ি-টাড়ি করছে কিনা, ক'খানা গাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাপস উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। শুনতে শুনতে চোখ গোল্লা পাকিয়ে যাচ্ছিল বাবার।

অনেকক্ষণ পর হয়তো হুঁশ হল বাবার। বলল, 'ওই দ্যাখো, আমিই বকে যাচ্ছি। আচ্ছা তোমরা এবার গল্প-টল্প কর।' বাবা চলে গেল।

যাক, দেরিতে হলেও যে লোকটার সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে, এতেই খুশী সন্দীপ। হেসে হেসে বলল, 'এ সময় তোরা ?'

তাপস বলল, 'চলে এলাম।'

'বেশ করেছিস। কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে ?'

'ব্লাডি, তোর সঙ্গে কী কথা ছিল ?'

'কী ?'

'ফোনে তোর কনট্যাক্ট করবার কথা ছিল না ?'

সন্দীপ আলস্যের ভঙ্গিতে আঙুল মটকাতে লাগল। বলল, 'করব ভেবেছিলাম।'

তাপস বলল, 'ভেবেছিলি তো করলি না কেন ?'

রিনি একটা গাঢ় নীল রঙের সিল্কের শাড়ি পরে এসেছিল, তার জমিতে গোল গোল কারুকাজ। হাত দুটো পেখমের মতো ছড়িয়ে সে ময়ূরী হ'ল। আদুরে গলায় বলল, 'জানেন আপনার ফোনের জন্যে রোজ আশায় আশায় বসে থাকতাম।'

সন্দীপ ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে বলল, 'রিয়ালি ?'

'রিয়ালি।'

এই সময় বাবা বড়দিকে নিয়ে আবার এ-ঘরে এল। বড়দির হাতে অনেক দিন আগের কানাভাঙা রঙচটা ট্রে (ট্রে-টা এক সময়ের শখ এবং সচ্ছলতার

প্রতীক)। ট্রে-র ওপর প্লেটে সাজানো গুচ্ছের সিঙাড়া নিমকি এবং সন্দেশ। চেহারা দেখেই বোঝা গেল মোড়ের দোকান থেকে কেনা হয়েছে। আর আছে তিন কাপ চা।

বাবা হাত কচলাতে কচলাতে বলতে লাগল, 'খাও বাবা, একটু চা খাও। এ্যাদ্দিন পর গরীবের বাড়ি এসেছ—'

বাবাকে দেখে মনে হচ্ছিল সার্কাসের ক্লাউন। আবার মনে হচ্ছিল রিনিরা এক কাপ চা খেলে তার ফোরটিন জেনারেশন উদ্ধার হয়ে যাবে।

রিনি আঁতকে ওঠার মতো করে হাত নাড়তে লাগল, 'ওরে বাবা, না-না, এত কখনও খাওয়া যায়!'

একদা মার্চেন্ট অফিসের লেজার কীপার ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য'র দু-পাটিতে চার পাঁচটার বেশি দাঁত আসল হবে না। বাদবাকি নকল। সাচ্চা-ঝুটো সব রকমের দাঁত বার করে লোকটা বিশ্রী হাসল, 'কি যে বল মা, কতটুকুই বা দিয়েছি! আর তোমাদের বয়েসটাই তো খাবার বয়েস।'

'এতগুলো খাবারকে বলছেন কতটুকু!' বলেই আলতো করে দু-আঙুলে একটা নিমকি তুলে নিল রিনি, 'আমি কিন্তু আর খেতে পারব না। তবে চা-টা খাব।'

বাবা এতেই গলে গেল, 'আচ্ছা আচ্ছা, তোমার যা ইচ্ছে—'

তাপস কিন্তু একটা নিমকিতেই পার পেল না। সেই সঙ্গে একটা সন্দেশও খেতে হ'ল। তাপস আলোকে চিনত। তার সঙ্গে দু-একটা সাধারণ কথা বলল। বাবা আরো কিছুক্ষণ আঠার মতো আটকে থেকে একসময় চলে গেল।

সন্দীপ এবার বলল, 'কী ব্যাপার বল্—'

রিনি বলল, 'আপনাকে বাড়ি এসে ইনভাইট না করলে তো যাবেন না, তাই আসতে হ'ল।'

'কিসের ইনভিটেসন?'

'পরশু দিন একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের সবার ইচ্ছে আপনি তাতে আসবেন।'

'গ্ল্যাডলি; পিকনিকটা কোথায় হচ্ছে?'

'বজবজের কাছে একটা গার্ডেনে—'

'চাঁদা কত দিতে হবে?'

'এক পয়সাও না। আপনি আমাদের গেস্ট।'

'তাই কখনো হয়?'

'এবারটা হবে। আমাদের তো মাঝে মাঝে গেট-টুগেদার হয়। পরে যখন কোনো ফাংসান হবে তখন দেখা যাবে।'

একটু ভেবে সন্দীপ বলল, 'আমি তো পিকনিকের জায়গাটা চিনি না। যাব কী করে?'

'দারুণ প্রবলেম তো!' রিনি হেসে ফেলল। তারপরেই দেখা গেল, সেন্ট মাখা রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলার ঘাম মুছছে। রিনি একাই না, সন্দীপও ঘেমে নেয়ে উঠেছিল। সে-ও সারা গায়ে রুমাল চেপে চেপে ধরছিল।

তক্ষুণি যোধপুর পার্কে রিনিদের বাড়িটার কথা মনে পড়ে গেল সন্দীপের।

এয়ার কুলার, সোফা, কৌচ, ডিসটেম্পার-করা দেয়াল, কার্পেট, দামী পর্দা, উর্দিপরা বয়দের হাতে সানমাইকার ট্রে, লতা-পাতা-কাটা জাপানি ক্রকারি। আর এখানে? একটা আস্ত চেয়ার পর্যন্ত নেই। খান দুই হাত-পাখা অবশ্য আছে। সন্দীপের ইচ্ছে হ'ল, মরে যায়। তার পরেই ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য নামে রিটায়ার্ড বুড়ো কেরানিটার ওপর পুরনো রাগটা আবার ফস করে বারুদের মতো জ্বলে উঠল। সারা জীবনে লোকটা করল কী?

রিনি আবার বলল, 'পরশুদিন মর্নিং-এ আটটার ভেতর আমাদের বাড়ি আসবেন। ওখান থেকে দাদা আপনি আর আমি চলে যাব।'

অন্যমনস্কের মতো সন্দীপ বলল, 'আচ্ছা।' একটু চুপ। তারপর আবার বলল, 'এ-ঘরে তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে, না? যা গরম, ফ্যান-ট্যান নেই।'

রিনিরা দারুণ সহিষ্ণুতা দেখাল, 'না-না, কিসের কষ্ট।'

সন্দীপ একটু ভেবে বলল, 'আর কে কে আসছে পিকনিকে?'

'আপনি তাদের চিনবেন না।'

'আমাদের পুরনো বন্ধু-টন্ধু কেউ নেই?'

তাপস বলল, 'না, সব নিউ গায়। দেখবি এককেটি বস্তু!'

রিনি বলল, 'দাদার কথা শুনবেন না। যারা আসবে, আই এ্যাসিওর, ইউ উইল এনজয় দেয়ার কম্পানি।'

সন্দীপ হাসল।

তাপস বলল, 'কথা হয়ে গেল। এবার তা হলে আমরা উঠি?'

'এক্ষুণি?'

'হ্যাঁ রে, আমাদের আরো দু-চার জায়গায় যেতে হবে।'

'যা তবে।' সঙ্কোচের গলায় সন্দীপ বলল, 'তোদের এই গরমে আটকে রাখা মানে আরো কষ্ট দেওয়া। ফ্যান নেই—'

যাবার সময় সন্দীপরা দারুণ মহানুভবতা দেখিয়ে বলল। হঠাৎ বলল, 'তোর মা'র অসুস্থতার কথা সেদিন বলছিলি না?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'চল, একবার দেখে যাই।'

সন্দীপ অবাকও হল, আবার অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল। 'মা'র কাছে যাবি? পেশেন্টের ঘর—'

তাপস বলল, 'এ্যাদ্দুর এলাম। একবার না দেখে গেলে সবাই কী ভাববে বল্—'

মা'র ঘরে গিয়ে আর্দ্র সহানুভূতির সুরে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল তাপসরা। বেশির ভাগই মা'র অসুখ আর শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে প্রশ্নোত্তর। বাবা এ-ঘরেই ছিল। তাপসদের দেখে সে দিশেহারা হয়ে পড়ল, হাঁটু ভেঙে কুঁজো হয়ে একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে। আকাশের চাঁদ যেন হাতের তালুতে পেয়ে গেছে। বাবা বলতে লাগল, তোমরা আবার এ-ঘরে কেন? হেঁ-হেঁ, অসুস্থ মানুষের ঘরে আসা ঠিক না—'

কিছুক্ষণ পর তাপসরা যখন বিদায় নিল, সন্দীপ ওদের সঙ্গে রাস্তায় এল। তাপসরা গাড়ি নিয়ে এসেছিল। গাড়িতে উঠে সুন্দর করে ঘাড় বাঁকিয়ে পাখি হ'ল রিনি। বলল, 'যাবেন কিন্তু—'

সন্দীপ ঘাড় কাত করল, 'বাড়ি এসে বলে গেলে, যাব না? নিশ্চয়ই যাব।'

ওরা চলে গেলে সন্দীপ নিজের ঘরে ফিরে এল। এখনও মুখ-টুখ ধোয়া হয়নি। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, দরজায় মার্চেন্ট অফিসের বাতিল কেরানী ব্রজগোপাল ভট্টাচার্যের মুখ দেখা গেল। সন্দীপ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল।

বাবা খুব চাপা গলায় বলল, 'জার্মানী থেকে ফেরার পর ওদের সঙ্গে বুঝি তোর দেখা হয়েছিল?'

বাবা কাদের কথা বলছে, সন্দীপ বুঝতে পারল। অনিচ্ছার গলায় বলল, 'হ্যাঁ—'

'কোথায় দেখা হল?'

নাও, এখন হিস্ট্রি আওড়াও। তুড়ি দিয়ে মাছি তাড়াবার মতো সন্দীপ ব্যাপারটা শেষ করে দিতে চাইল, 'হয়েছে এক জায়গায়।'

বাবা বলল, 'জানিস ওরা ভীষণ বড়োলোক হয়েছে। লাখ লাখ টাকা—'

সন্দীপ উত্তর দিল না। সে খুব বিরক্ত হচ্ছিল।

বাবা বলল, 'ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে ওরা কত বড়ো অফিস করেছে, জানিস ?'

'না।'

'প্রায় এক শো লোক কাজ করে।'

সন্দীপ চুপ।

বাবা বলতে লাগল, 'তোর সঙ্গে তো এত বন্ধুত্ব, তা এক কাজ কর-না পচা—'

সন্দীপের স্নায়ুগুলো টান-টান হয়ে গেল। সংক্ষেপে বলল, 'কী ?'

'তাপসকে বলে ওদের অফিসে হেরোকে ঢুকিয়ে দে।'

সন্দীপ দ্রুত একবার বাবাকে দেখে নিল। ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য লোকটাকে এই মুহূর্তে দারুণ লোভী দেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হারুর কথা মনে পড়ল সন্দীপের। এতক্ষণে তাপসদের এত খাতিরের কারণটা বোঝা গেল। হারুটা সেই যে সেদিন চলে গেছে, তারপর আর ফেরেনি। গলার ভেতর থেকে ডেলা পাকিয়ে নোংরা কিছু একটা বেরিয়ে আসছিল। তার বদলে গরম চাটুতে ঠাণ্ডা জল দেবার মতো বলল, 'আমি বলতে পারব না।'

বাবা একটা চড় খেল যেন, 'কেন, পারবি না কেন ?'

'এ-সব ব্যাপারে আমি কাউকে রিকোয়েস্ট করি না, তাতে প্রেস্টিজ থাকে না।'

'অ-অ—তা—' গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরুল বাবার গলা চিরে। তারপরেই ঘাড় থেকে ধূসর মাথাটা ভেঙে ঝুলে পড়ল। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতো একটু দাঁড়িয়ে থেকে ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য চলে গেল।

ষোলো

কলকাতার কুড়ি মাইলের ভেতর এমন একখানা নন্দন কানন ছিল, কে জানত। রিনিদের সঙ্গে রোববার যখন সন্দীপ বজবজের সেই গার্ডেনে পৌঁছুল, ন'টাও বাজে নি। ওরা এসে দেখল, অনেক তরুণ-তরুণী আগেই এসে গেছে। মেয়ে আর ছেলেদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান।

রিনি তাপস ছাড়া আর সবাই সন্দীপের অচেনা। মেয়েগুলোর সাজটাজ রিনির মতোই। ফাঁপানো চুল, কারো বব্‌ড, কারো কার্ল করা, ম্যানিকিওর-করা নখ, পেণ্টেড মুখ, চোখে গোল গোল চাকার মতো সান-গ্লাস। ওদের স্লিভলেস ব্লাউজের ঝুল ছ'ইঞ্চির বেশি হবে না। ছেলেদের টাইট লো-কাট ট্রাউজার্স আর জ্যাকেট কিংবা টিরিলিনের কলারওলা পাঞ্জাবি। কাঁধ পর্যন্ত নেমে-আসা চুল,

মোটা লম্বা জুলপি। কারো কাঁধে ক্যামেরা, কারো ট্রানজিস্টর। দেখতে দেখতে সন্দীপের মনে হতে লাগল, এরা নতুন এ্যাফ্লুয়েণ্ট সোসাইটি থেকে বুঝিবা উঠে এসেছে।

রিনিই সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল, 'হিয়ার ইজ আওয়ার নিউ ফ্রেণ্ড সন্দীপ ভট্টাচারিয়া। ফর লং টেন ইয়ারস হ্যাড বীন টু জার্মানী। রিসেণ্টলি ব্যাক হোম—ইত্যাদি ইত্যাদি।' তারপর যাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হ'ল তাদের একগাদা নাম বলে গেল, 'এ হ'ল পল্লব, এ সোনিয়া, এ জয়া, এ বিপ্লব, এ সোমনাথ, এ ইন্দ্রাণী, এ যোগিতা—'

সবাই বেশ ঝকঝকে, উজ্জ্বল। ওরা বলছিল, 'গ্ল্যাড টু মীট ইউ।'

একটি পাঞ্জাবী মেয়ে, যোগিতা—চমৎকার বাংলা বলে। বলল, 'নাউ উই আর অল ফ্রেণ্ডস্। 'আপনি আপনি' করে কিন্তু বলতে পারব না।'

সন্দীপ স্মার্ট জবাব দিল, 'ও নো-নো, আপনি-টাপনিগুলো মোস্ট এমব্যারাসিং। তুমিই ভালো।'

বাদবাকি সবাই হুল্লোড় বাধিয়ে দিল, 'গ্র্যাণ্ড।'

তাপস বলল, 'তা হলে এই প্রস্তাব—'

সবাই চেঁচাল, 'পাশ।'

সন্দীপকে ঘিরে যুবক-যুবতীরা মৌচাক তৈরি করেছিল। কিছুক্ষণ পর ঢেউয়ের মতো তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বাগানটা বিরাট এবং চমৎকার। চারধারে গাছপালা, মাধবী-লতার ঝোপ, ঝোপগুলোর ভেতর সিমেন্টের বেঞ্চ, সেগুলোর মাথায় লাল-নীল ছাতা; আজকের জন্যই ছাতাগুলো লাগানো হয়েছে। মাঝখানে প্রকাণ্ড লম্বাটে দীঘি, একদিকে লাল সানবাঁধানো ঘাট, আরেকদিকে ডাইভিং বোর্ড। বোর্ডটার দু'পাশে পোশাক বদলাবার জন্য দুটো বড়ো ঘর। একটা পুরুষদের, অন্যটা মেয়েদের। এ ছাড়া খানকতক টালির বাংলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

সন্দীপ লক্ষ করল, জোড়া জোড়া যুবক-যুবতী মাধবীলতার ঝাড়ে কিংবা বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় গিয়ে বসেছে। অনেকে আবার পুকুরপাড়ের সরু নুড়ি-বিছানো রাস্তায় ঘুরছে, অনেকে আড্ডা দিতে দিতে হুল্লোড় করছে।

ক্রমে সন্দীপদের চারপাশের ভিড়টা হাল্কা হতে হতে একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। ওরা এখন শুধু তিনজন। তাপস, সন্দীপ আর রিনি।

তাপসের চোখ খোঁজবাতির মতো ঘুরছিল। হঠাৎ ডান দিকে ঝাঁকড়া-মাথা রেন-ট্রীর তলায় একটা মেয়েকে একা একা বসে থাকতে দেখল সে। প্রায়

চেঁচিয়েই উঠল সে, 'ওহ্, সোনিয়া ইজ অল এ্যালোন। ওকে একটু সঙ্গ দেওয়া যাক।' বলেই পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

একটু চুপ করে থেকে রিনি বলল, 'চলুন কোথাও বসি; আপনার সঙ্গে জমিয়ে একটু গল্প করা যাক।'

সন্দীপের আপত্তি ছিল না, ওরা যদি সুযোগ করে ছায় তার 'না' বলবার কী থাকতে পারে? এদেশে রিনির মতো স্মার্ট ঝকঝকে মেয়ে তৈরি হয়ে বসে আছে, কে ভাবতে পেরেছিল। অবশ্য জার্মানী যাবার আগে আপস্টার্ট এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিতে মিশবার সুযোগ তার হয়নি। এর আগে তিনবার মোটে রিনির সঙ্গে দেখা হয়েছে। একবার পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয়। আবেকবার যোধপুর পার্কের বাড়িতে। আর সেদিন তাদের শহরতলীর বাড়িতে। তিনবারই তাপস সঙ্গে ছিল। এই প্রথম রিনিকে একলা পাওয়া গেল! বেশ ভালোই লাগল সন্দীপের। পায়ের তলায় স্রোতের টান অনুভব করল সে।

চারধারে তাকাতে তাকাতে পুকুরটার দক্ষিণ দিকে একটা ছায়াচ্ছন্ন নির্জন ঝোপ চোখে পড়েছিল রিনির। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'নাইস, চলুন ওখানে গিয়ে বসি।'

ওরা যখন পাশাপাশি হাঁটছিল, আশপাশ থেকে নানারকম মন্তব্য ভেসে আসছিল, 'চীয়ার ইউ লাকি গায়—' কিংবা 'উইস ইউ এ ফাইন টাইম—'

হেসে হেসে সবার উদ্দেশেই সন্দীপ বলতে লাগল, 'থ্যাঙ্কস—থ্যাঙ্কস—থ্যাঙ্কস—' রিনিও তাই বলছিল।

একসময় ওরা সেই ঝোপটার ভেতর গিয়ে বসল। ঘন ছায়ায় ঝোপটা এই মে মাসেও আশ্চর্য ঠাণ্ডা। মাথার ওপর টুই টুই করে পাখি ডাকছিল।

রিনি বলল, 'আমাদের এই গেট-টুগেদার কেমন লাগছে?'

সন্দীপ উচ্ছ্বাসের গলায় বলল, 'ফাইন। কলকাতায় যে এরকম ব্যাপার-ট্যাপার হয়, আমি জানতাম না।'

'সে কি!'

'রিয়ালি। আমার দারুণ ভালো লাগছে।'

রিনি হাসল।

সন্দীপ আবার বলল, 'এখানে না এলে দারুণ মিস করতাম।'

রিনি বলল, 'সিওর। বাইরে থেকে দেখলে ক্যালকাটাকে আগলি লাগবে। ডার্টি, স্লাম্টি, বাকোয়ার্ড। মিছিল, স্লোগান, গারবেজ। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এর অন্য একটা লাইফ আছে। এ্যাণ্ড অ্যাই থিংক, ছাট ইজ চার্মিং।'

'একজাক্টলি—'

একটু চুপ। তারপর সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসের ওপর সন্দীপ প্রায় শুয়েই পড়ল। রিনির দিকে পলকহীন তাকিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে ভালো করে আলপই হয়নি। আমার কিউরিয়সিটি প্রায় ফেমিনিন বলতে পার। এখন তোমার কথা বল—ডিটেলস্ চাই, কিছু বাদ দেবে না।'

'আমার কোন্ কথা?'

'তোমার ফিউচারের, এ্যাম্বিশানের।'

এ্যাম্বিশান সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়ে রিনি বলল, 'ফিউচারের কথা সেদিনই তো আপনাকে বলেছি।'

সন্দীপের মনে ছিল। তবু স্রেফ গল্প জমাবার জন্য বলল, 'কী বলেছিলে যেন?'

'আপনি দেখছি খুব ভুলে যান।'

অন্য কেউ বললে সন্দীপ আপত্তি করত। রিনির বেলায় হেসে হেসে বলল, 'তা যা বলেছ। আমি দারুণ ফরগেটফুল।'

রিনি নিজের চোখকে পাখির চোখ করে বলল, 'এই তো ক'দিন আগে বলেছি। আমার কথাটা অন্তত আপনার মনে রাখা উচিত ছিল।'

'ও, সিওর—' সন্দীপ বলতে লাগল, 'এবার থেকে তোমার সব কথা আমার মনে থাকবে।'

'থ্যাঙ্কস্—' রিনির চোখের মণিতে খাঁচার পাখি নাচতে লাগল। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, আমি একটা কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়ে গেছি। শিগগির লণ্ডন যাব।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে। কদ্দিনের ভেতর যাবে, এক্সপেক্ট করছ?'

'পনেরো দিন হতে পারে। আবার একমাস-দু'মাসও লাগতে পারে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কিছু ভাবিনি।'

সন্দীপ বলল, 'ভালোই হ'ল। তুমি লণ্ডন গেলে জার্মানী থেকে মাঝে মাঝে ওখানে চলে যাওয়া যাবে। না কি বল?'

রিনি খুশিতে কিশোরী হয়ে গেল, 'কি মজা যে হবে; ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম দেয়ার। এ্যাণ্ড আই উইল হ্যাভ এ ভেরি ফাইন টাইম উইথ ইউ।'

'ইজ ইট?'

'সিওর।'

গল্পে-গল্পে দুপুর হয়ে গেল। পুকুরের ওপারে একটা ঘর থেকে নানা রকম খাবারের গন্ধ ভেসে আসছে। বাবুর্চি-টাবুর্চি নিয়ে আসা হয়েছে। তারাই ওখানে রান্না-বান্না করছিল।

একসময় একটি যুবক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছিল, 'খাবার-দাবার রেডি, এবার সবাই স্নান করে নাও।' তারপরেই দেখা গেল, ঝোপঝাড় থেকে গাছতলা থেকে হুড়মুড় করে যুবক-যুবতীরা বেরিয়ে এল। কেউ কেউ ডাইভিং বোর্ডের ওপারের ঘর দুটোয় ঢুকে স্নানের পোশাক পরে জলে ঝাঁপ দিল।

রিনি বলল, 'আপনি স্নান করবেন না?'

সন্দীপ মাথা নাড়ল, 'না। আমি স্নান করে এসেছি।'

'তবু আরেকবার করে নিন-না। যা গরম—'

'তা ঠিক। কিন্তু—'

'কী?'

তক্ষুণি উত্তর দিল না সন্দীপ। জার্মানীতে থাকতে অনেকে তাকে সুইমিং পুলে নামার জন্য টানাটানি করেছে কিন্তু সে নামেনি। কারণ সন্দীপ সাঁতার-টাতার জানে না।

রিনি আবার বলল, 'কী হ'ল?'

সন্দীপ এত যে ঝকঝকে, এত স্মার্ট তবু তার ঘাড় যেন ভেঙে ঝুলে পড়ল। বার দুই ঢোক গিলে বলল; 'আমি সাঁতারটা ঠিক জানি না।'

এক পলক তাকিয়ে থেকে রিনি বলল, 'হোপলেস!' তারপরেই এস্রাজে দ্রুত ছড় টানার মতো হেসে উঠল।

লজ্জায় কুঁজো হয়ে যেতে যেতে সন্দীপ আবছাভাবে ভাবল, এবার আর সাঁতারটা না শিখলেই না। তারপরেই তার মনে পড়ল বয়েসটা পঁয়তিরিশ। এখন, এই বয়েসে কি আর জলে হাত-পা ছুঁড়ে চিত-সাঁতার ডুব-সাঁতারের পাঠ নেওয়া চলে!

রিনি বলল, 'তাহলে আপনি একটু বসুন। আমি স্নান করে আসি।'

বদ্ধ জলাশয়ে মাছের মতো খেলা করবার পর একসময় ওরা উঠে এল। ক'টা বয় এর জন্যেই যেন ওত পেতে ছিল। ঝটপট প্লেটে প্লেটে খাবার সাজিয়ে তারা সার্ভ করতে লাগল।

হৈ-চৈ করে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গাছতলায় অনেকক্ষণ গড়িয়ে নিল। রোদের রঙ যখন হলুদ হয়ে এল সেই সময় রিনি বলল, 'এরকম চুপচাপ গড়াবার কোনো মানে হয় না।'

একটা বিদেশী ফার্মের ম্যানেজার ট্রেইনী বরুণ বলল, 'কী করতে চাও ?'

'একটু গান-টান হোক—'

'গ্র্যাণ্ড আইডিয়া !' লোকসভায় প্রস্তাব পাস করার মতো সবাই চেঁচিয়ে মেচিয়ে সায় দিল।

ইন্দ্রাণী হঠাৎ বলল, 'আমার একটা বক্তব্য আছে।'

সবাই তার দিকে তাকাল। ইন্দ্রাণী বলতে লাগল, 'আমাদের নিউ ফ্রেণ্ড সন্দীপ গান গেয়ে কিংবা নাচ-টাচ-ম্যাজিক যা ইচ্ছে দেখিয়ে আমাদের আনন্দ দেবে।'

রিনিরা সমস্বরে বলল, 'লাভলি প্রোপোজাল। আমরা হোল-হার্টেডলি সমর্থন করছি।'

সন্দীপ বলল, 'কিন্তু আমি তো গান নাচ-টাচ কিছুই জানি না।'

'সেকি ! এতদিন ইওরোপে কাটিয়ে এলে ! সেখানে এত ক্যাজিনো, এত নাইট ক্লাব। ওখানে শুকদেব হয়ে ছিলে নাকি ?'

"তা ঠিক না। তবে নাচ-ফাচ আমার আসে না। অন্যেরা গাইলে নাচলে এনজয় করি। নিজে পারি না।'

'রট্—'

'ম্যাক্সিমাম আমি একটা আবৃত্তি করতে পারি।'

সোনিয়া ঠোঁট ছুঁচলো করে বলল, 'আবৃত্তি ! মানে রেসিটেসন ?'

সন্দীপ মাথা নাড়ল, 'ইয়েস।'

'কী রিসাইট করতে চাও ?'

তাই তো, কী আবৃত্তি করবে ? বলেও ঝামেলায় পড়া গেল। স্মৃতি হাতড়ে স্কুল-ফাইনালের সময়কার একটা কবিতার মাত্র কয়েক লাইন মনে করতে পারল সন্দীপ। বলল, 'টাগোরের একটা ভার্স—'

'রবীন্দ্রনাথ ? দেখ, ঐ মানুষটার ওপর আমাদের দারুণ শ্রদ্ধা ; কিন্তু এই গেট-টুগেদারে ওঁকে টানাটানি না করাই ভালো। বুঝতেই পারছ। ব্যাপারটা খুব লাইট, হুল্লোড়বাজি আর কি। তার ভেতর টাগোরের কবিতার মতো একটা হেভিওয়েট চাপালে সমস্ত আনন্দটাই নষ্ট।'

নাচ-টাচগুলো দেশে ফিরে কাজে লাগবে, এটা আগে জানতে পারলে কবেই শিখে ফেলত সন্দীপ। ক্যাজিনোয়-ক্যাজিনোয় কম তো ঘোরেনি। দুই কাঁধে পঞ্চাশ কুইণ্টাল ওজনের লজ্জা আর অক্ষমতা চাপিয়ে সে চুপ করে রইল।

রাজেশ বলল, 'ঠিক আছে, সন্দীপকে ছেড়ে দাও আজ। ও বরং আমাদের

পারফর্মেনস দেখুক। কে স্টার্ট করবে বল ?' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে বলল, 'রিনি—রিনিই শুরু করুক।'

রিনি বলল, 'আমি কী করব ?'

'তোমার সেই স্পেশাল ব্যাপার—পপ সঙ্—'

'অলরাইট, আমার আপত্তি নেই। তবে আমার সঙ্গে প্রেমাও গাইবে।'

'মোস্ট গ্ল্যাডলি—'নক্সাদার লুঙ্গি-পরা একটি মেয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে উঠে এসে রিনির পাশে দাঁড়াল। তারপর দু'জনে সামনে হাত ছড়িয়ে দিয়ে শুরু করল, 'মাই ডার্লিং—মাই ডার্লিং—পপ—পপ—পপ—

কেম ডাউন ফ্রম দি সিলভারি মুন-

রাম্বা-রাম্বা-রাম্বা-'

স্প্যানিশ গীটার বাজিয়ে ওদের সাহায্য করতে লাগল বরুণ।

পর-পর আটটা গান গাইল রিনিরা। প্রেমার গলাটা চাপা, তাই স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। কিন্তু রিনির গলা তীক্ষ্ণ এবং সুরেলা। ওদের গানের পর ক'টি মেয়ে আর ছেলে ওয়েস্টার্ন স্টাইলে নাচল। তারপর শুরু হ'ল ফোটো তোলা। চারদিকে শুধু ক্লিক-ক্লিক-ক্লিক। সবার ফিল্ম শেষ হয়ে গেলে ড্রিঙ্কের আসর বসল। ছেলেরা বেশির ভাগ খেল হুইস্কি, মেয়েদের কেউ-কেউ বীয়ার। কেউ-কেউ অন্য সফ্ট ড্রিঙ্ক।

সন্ধের পর ওরা কলকাতায় ফিরবার জন্য গাড়িতে উঠল। রিনিদের গাড়িতে রিনি, তাপস আর সন্দীপ। জানলার পাশে বসে সন্দীপ ভাবছিল, ফ্রী-মিক্সিংটা ইওরোপে জলভাত, কেউ'এ নিয়ে মাথা-টাথা ঘামায় না। কিন্তু কলকাতাও যে ইওরোপের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, কে জানত। কে জানত, নোংরা অপরিচ্ছন্ন এই দেশ ওয়েস্ট জার্মানী হয়ে উঠেছে !

হঠাৎ পাশ থেকে রিনি বলল, 'আজকের দিনটা কিরকম লাগল ?'

সন্দীপ চমকে উঠল। তারপর বলল, 'ভেরী ইণ্টারেস্টিং, দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হ'ল।'

একটু পর সন্দীপ আবার বলল, 'না এলে দারুণ একটা ব্যাপার মিস করতাম।'

রিনি হাসল। সন্দীপ বলতে লাগল, 'প্রায়ই তোমাদের এরকম পিকনিক-টিকনিক হয় নাকি ?'

রিনি বলল, 'না ; মাঝে-মধ্যে।'

'আবার কবে হচ্ছে ?'

'এখনও ঠিক হয়নি।'

'এবার যখন হবে জানিও।'

'ও স্যুয়োর।'

গাড়িটা চকচকে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে মস্ত পোকার মতো ছুটছিল। স্টিয়ারিংএ হাতে রেখে বসে ছিল তাপস। ড্রাইভ করতে করতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে বলল, 'তোকে একটা কথা বলতে একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

সন্দীপ তার দিকে ফিরল, 'কি রে?'

'কাল হঠাৎ আনন্দ আমাদের অফিসে এসে হাজির।'

'কী বললে?'

'তোর দারুণ নিন্দে করল।'

'নিন্দে!' সন্দীপ অবাক হ'ল।

'হ্যাঁ রে—' সামনে চোখ রেখে তাপস মাথা নাড়ল।

'কারণ?'

'আনন্দর কারণ-টারণ লাগে না। জেলাসি—বুঝলি, ওটার পেট ভর্তি হিংসে। কারো ভালো দেখতে পারে না। কেউ শাইন-টাইন করলে ওর ধারণা, মামা-ভগ্নিপতিরা করে দ্যায়।'

নাকমুখ কুঁচকে বিরক্ত গলায় রিনি বলল, 'রট্। এ-সব ছাড়ো তো।'

সন্দীপও কিছু বলল না।

তাপস বলল, 'হাঁ-হাঁ থাক; বাজে ব্যাপার।'

কিছুক্ষণের ভেতর ওরা কলকাতায় পৌঁছে গেল। রাত খুব বেশি হয়নি। অন্ধকার এখনও ফিকে, জোলো কালির মতো আকাশের গায়ে লেপ্টে আছে। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলছিল।

তাপস বলল, 'কি রে এক্ষুণি বাড়ি ফিরবি, না আমাদের বাড়ি যাবি?'

সন্দীপ বলল, 'আজ আর তোদের ওখানে যাব না; বাড়িই ফিরে যাই।'

'ঠিক আছে—' গাড়ি ঘুরিয়ে সন্দীপদের বাড়ির দিকে চালিয়ে দিল তাপস। সন্দীপকে ওদের সদর দরজায় নামিয়ে বলল, 'হোপ টু মীট এগেন—ফির মিলেঙ্গে—'

'নিশ্চয়ই।'

রিনি বলল, 'আবার কবে দেখা হচ্ছে?'

সন্দীপ বলল, 'যেদিন বলবে।'

এক পলক কি ভেবে রিনি এবার বলল, 'সকালের দিকে ক'টা পর্যন্ত বাড়ি থাকেন?'

'দশটা পর্যন্ত তো বটেই। তারপর হয়তো বেরিয়ে পড়ি; কোনো দিন আবার

বেরুই না ; সারাদিনই বাড়িতে কেটে যায়। কেন ?'

'এমনি জানতে ইচ্ছে হ'ল।'

ওরা চলে গেল। রাস্তার বাঁকে যতক্ষণ তাপসদের গাড়িটা দেখা গেল, সন্দীপ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর অন্যমনস্কের মতো বাড়ি ঢুকল।

দাঁতের ফাঁকে বালি আটকাবার মতো আনন্দর ব্যাপারটা বাদ দিলে সমস্ত দিনটা দারুণ কাটল। নিজের অজান্তেই কলকাতাকে একটু একটু ভালো লেগে যাচ্ছে সন্দীপের।

ঝুপসি বাগানের ভেতর দিয়ে রোয়াক পর্যন্ত এসেই চমকে উঠল সন্দীপ। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মল্লিকা বড়দির সঙ্গে গল্প করছে। আজ সারা-দিনে মল্লিকার কথা একবারও ভাবেনি। আজ কেন, ক'দিন ধরেই মল্লিকার কথা সে ভাবছে না। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল সন্দীপ, মল্লিকার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হ'ল, তারপর বাঁ ধারে ঘুরে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে গেল।

ট্রাউজার্স শর্ট-টার্ট ছেড়ে সবে পাজামা পরেছে সন্দীপ, মল্লিকা এ-ঘরে এল। বলল, 'আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।'

মেয়েটা যেন যাত্রাদলের বিবেকের মতো। ওকে দেখলেই আজকাল ভীষণ অস্বস্তি হয়। পিকনিকে কিছুটা হুইস্কি খেয়েছিল সন্দীপ ; মাথার ভেতর পিয়ানোর টুং টাং শব্দের মতো নেশাটা ঝিমঝিম করছিল। নেশাটা দ্রুত ফিকে হয়ে আসতে লাগল। সন্দীপ বলল, 'বোসো বোসো—'

'বসবার সময় নেই ; এক্ষুণি বাড়ি চলে যাব। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

'কী ব্যাপার ?'

'আপনাকে ক'দিন আগে একজন উকিলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম, মনে আছে ?'

চোয়াল শক্ত হল সন্দীপের, 'আছে। কেন ?'

মল্লিকা বলল, 'তারপর তো আপনি আর ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেননি।'

'না, করিনি।'

'সেটাই হয়েছে মুশকিল।'

'কেন ?'

'আপনার যাওয়া উচিত ছিল।'

'আমি গিয়ে কী করব ?'

'আপনার ভাই, আপনি যাবেন না তো রাস্তার লোক যাবে নাকি ?'

ঘাড় গোঁজ করে একরোখার মতো দাঁড়িয়ে থাকল সন্দীপ।

মল্লিকা আবার বলল, 'মাঝখানে কোর্টে একটা ডেট পড়েছিল, আপনি যাননি। সেদিন আমাকেই যেতে হয়েছিল। আসছে বেস্পতিবার আবার ডেট পড়েছে ; এবার আপনি যাবেন।'

সন্দীপ উত্তর দিল না।

মল্লিকা বলতে লাগল, 'একটু চেষ্টা-চরিত্র করলে ছেলেটাকে এখনও বাঁচানো যায়।'

রুক্ষ গলায় এবার সন্দীপ বলল, 'আমি পারব না। সেদিনই তো তোমাকে বলে দিয়েছি, এসব আমাকে দিয়ে হবে না।'

স্থির চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল মল্লিকা। বলল, 'আপনাকে দিয়ে কী কী হবে তার একটা লিস্ট করে রাখবেন। এবার থেকে লিস্টের বাইরে কিছু করতে বলব না।'

মুখ শক্ত হলো সন্দীপের। কর্কশ গলায় বলল, 'আচ্ছা।'

মল্লিকা আর একটা কথাও বলল না। আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সতেরো

কী আশ্চর্য, পরের দিন সকাল বেলাতেই আবার এল রিনি। একলাই এসেছে ; আজ সঙ্গে তাপস নেই।

দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে মুখ ধুয়ে চা খাচ্ছিল সন্দীপ, রিনিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রথমটা অবিশ্বাস্যই মনে হ'ল সন্দীপের। কাল সারাদিন তার সঙ্গে কেটেছে ; আজই যে আবার রিনি আসবে, কে ভেবেছিল।

রিনি হাসল, 'আজও চলে এলাম কিন্তু—'

সন্দীপ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খুশির গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই আসবে। বোসো বোসো। তাপসকে দেখছি না যে—'

'কেন দাদা ছাড়া আমি আসতে পারি না ? আপনি কি আমাকে এতই নাবালিকা ভাবেন ?'

'আরে না-না, এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম—'

'দিল্লী থেকে একজন বড়ো অফিসার আসছেন ; আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড ; দাদা তাঁকে রিসিভ করতে দমদম গেছে।'

'কখন ফিরবে ?'

'কিছু ঠিক নেই।'

সন্দীপ বলল, 'একটু চা খাবে ?'

'ও নো—' রিনি জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'আমি চা খেয়েই বেরিয়েছি। আপনি চটপট রেডি হয়ে নিন। ফাইভ মিনিটস্ সময় দিলাম।'

'মানে ?'

'মানে কিচ্ছু না। এখন ঘরে বসে কী করবেন ? গাড়ি নিয়ে এসেছি ; চলুন একটু ঘুরে আসি।'

তক্ষুণি একটা কথা মনে পড়ে গেল সন্দীপের। আজ—আজই তো রোববার। মেজ জামাইবাবু নেমন্তন্ন করে গেছে। আগেও একবার মেজদি মেজ জামাইবাবু নেমন্তন্ন করেছিল, সন্দীপের যাওয়া হয়নি। আজ না গেলে খুব খারাপ দেখাবে। হঠাৎ মেজ জামাইবাবুর ওপর দারুণ রাগ হ'ল। খাওয়াবে তো তেল-মশলায় গ্যারগেরে গুচ্ছের মাছ-মাংস। অবশ্য এক বোতল স্কচ হুইস্কির টোপ নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। এই রোববারটায় নেমন্তন্ন না করলে যেন ওদের আর চলছিল না। একদিন খাইয়ে কী যে স্নেহ-মমতা দেখানো যায়, সন্দীপ ভেবে পেল না।

রিনি বলল, 'বসে থাকবেন না ; উঠুন—উঠুন—'

'কিন্তু—'

'কী হ'ল ?'

'আমার যে আজ একটা নেমন্তন্ন আছে।'

'সেখানে না গেলেই নয় ?'

'না। মানে আমার মেজদির বাড়ি—'

'মেজদি যখন, কিছু মনে করবে না। এক কাজ করুন, বাইরে কোন বুথ-টুথ থেকে ফোন করে দেবেন। বলবেন আজ যেতে পারব না।'

'মেজদিদের ফোন নেই—' এই কথাটা উচ্চারণ করতে লজ্জায় মাথা কাটা যেতে লাগল সন্দীপের, 'তা ছাড়া—'

রিনি জিজ্ঞেস করল, 'তা ছাড়া কী ?'

'আগেও একবার ওরা নেমন্তন্ন করেছিল ; আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আজ না গেলে বুঝতেই পারছ—হাজার হোক, একটা পারিবারিক ব্যাপার—'

'আপনি এসব ফর্মালিটি মানেন ?'

বিব্রত সন্দীপ বলল, 'না, ঠিক মানে—'

রিনি বলল, 'যাক গে, ক'টায় আপনার নেমন্তন্ন ?'

মেজ জামাইবাবু দুপুরে যেতে বলেছিল। তবু সন্দীপ বলল, 'যখন হোক একবার গেলেই হ'ল।'

'তবে আর কি, চলুন চলুন। বিকেলবেলা আপনাকে আপনার মেজদির বাড়ি পৌঁছে দেব।'

একটু ভেবে সন্দীপ বলল, 'ঠিক আছে। এখন আমরা যাব কোথায় ?'

রিনি বলল, 'যেদিকে দু চোখ যায়।'

সন্দীপ উঠে পড়ল; শার্ট ট্রাউজার্স নিয়ে পাশের ঘরে বদলাতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে—এসে দ্যাখে বাবা কিভাবে যেন গন্ধ পেয়ে এ-ঘরে চলে এসেছে; একগাদা মিষ্টিফিষ্টি নিয়ে রিনিকে তোষামোদ করছে।

রিনি কিছুতেই খাবে না। কিন্তু নাছোড় ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য না খাইয়ে ছাড়ল না। একটা মিষ্টি মুখে পুরেই উঠে পড়ল রিনি, তারপর সন্দীপকে নিয়ে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

পাড়ার সেই চেনা ছেলেগুলোকে আজও দেখা গেল না। ক'দিনই ওদের দেখা যাচ্ছে না। ওরা না থাকায় পাড়াটা বড়ো নির্জন মনে হচ্ছে।

গাড়ি নিয়ে রিনি ট্রাম রাস্তায় চলে এল। সে নিজেই ড্রাইভ করছিল। উইণ্ড স্ক্রীনের ওপারে চোখ রেখে হঠাৎ বলল, 'একটা কথা বলব ?'

'বল।'

'কাল পিকনিকে ইন্দ্রাণী একটা প্রোপোজাল দিয়েছিল, মনে আছে ?'

'কী ?'

'উই আর অল ফ্রেণ্ডস্, সবাইকে 'তুমি' করে বলা উচিত।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে।'

'আমার ইচ্ছে আপনাকে 'তুমি' বলি।'

স্মৃতির ভেতর বিদ্যুৎ চমকে গেল। দশ বছর আগে ইডেন গার্ডেনের এক ছায়াচ্ছন্ন রেন-ট্রীর তলায় বসে মল্লিকাও তাকে 'তুমি' করে বলার ইচ্ছে জানিয়েছিল। সন্দীপ বলল, 'নিশ্চয়ই। কাল থেকেই স্টার্ট করলে পারতে।'

রিনি হাসল, 'তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু বলতে গিয়ে আটকে গিয়েছিল।'

'তোমার মতো স্মার্ট মেয়েরও আটকায় !' সন্দীপও হাসল।

'আফটার অল, তুমি আমার দাদার বন্ধু।'

'তাতে কী ?'

'না, কিছু না।'

ওরা কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দুপুর করে দিল ; তারপর একটা দামী রেস্তোরাঁয় ঢুকে লাঞ্চ সেরে চলে গেল সিনেমায়। জিনা লোলোব্রিজিডার রগরগে কড়া একখানা ছবি দেখে যখন বেরুল, বিকেলটা যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে। মে মাসের এই শেষ বেলাটা এখনও উত্তপ্ত। চারদিক থেকে চাপা আঁচ উঠে আসছিল। যদিও দক্ষিণ দিক থেকে উল্টোপাল্টা হাওয়া দিয়েছে, রিনিরা খুব অস্বস্থ বোধ করছিল ; এয়ারকণ্ডিসানড্ হল থেকে বেরিয়ে এই গরম তারা সহ্য করতে পারছিল না।

রিনি বলল, 'এখন তোমার মেজদির বাড়ি যাবে তো ?'

সন্দীপ বলল, 'হ্যাঁ।'

'বাড়িটা কোথায় ?'

'বরানগরে—'

'চল, তোমাকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

মেজদিদের বাড়ির কাছে সন্দীপকে নামিয়ে রিনি বলল, 'কাল কী করছ ?'

'নাথিং—' সন্দীপ বলল, 'আমার এখানে কোন কাজ নেই। একেবারে সেণ্ট পারসেণ্ট বেকার বলতে পার।'

'কাল দুপুরে তোমাদের বাড়ি আসছি। রেডি থেকো—'

'অলওয়েজ ওয়েলকাম।'

রিনি একপলক তাকিয়ে বলল, 'রোজ রোজ তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি। কেউ কিছু ভাবছে নাকি ?'

সন্দীপ বলল, 'আরে না-না, কারো ভাবাভাবি আমি কেয়ার করি না। কাল আবার কষ্ট করে তুমি আসবে ! আমিই বরং কাল তোমাদের বাড়ি যাব।'

'কখন যাবে ?'

'বারোটা-একটার ভেতর।'

'ঠিক আছে।' রিনি চলে গেল।

মেজদিদের বাড়িটা রাস্তার ওপরেই। পুরনো আমলের দোতলা। দোতলা ঐ নামেই ; কেননা মাথায় ছাদ নেই, তার বদলে টালির চাল। বাড়িটা অনেক জায়গায় ভেঙেচুরে গেছে ; যে কোন দিন হুড়মুড় করে পড়তে পারে। জার্মানী যাবার আগে যেমন দেখে গেছে অবিকল তেমনিই রয়েছে বাড়িটা ; বলা যায় এই দশ বছরে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। মেজ জামাইবাবুটা মাল খেয়ে-খেয়েই সব পয়সা উড়িয়ে দিলে ; বাড়িঘর সারিয়ে-সুরিয়ে যে ভালোভাবে থাকবে সে দিকে হুঁশ নেই।

দরজার কড়া নাড়তে মেজ জামাইবাবুই স্বয়ং এসে খুলে দিল। খালি গা, একটা ধুতি দু' ভাঁজ করে লুঙ্গির মতো পরা। সন্দীপকে দেখে তার মুখে যেন ফস করে মার্কারি ল্যাম্প জ্বলে উঠল। ঈষৎ ঝুঁকে বলল, 'এসো, এসো হে ব্রাদার-ইন-ল। আসতে আজ্ঞা হোক।'

মেজ জামাইবাবুর কথাবার্তা ভাবভঙ্গির মধ্যে একটা ক্লাউন লুকিয়ে রয়েছে যেন। সে কাছে থাকলে মোটামুটি মজাই লাগে। সন্দীপ হাসল।

সন্দীপকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল মেজ জামাইবাবু। একসঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ভেতরে যেতে-যেতে বলল, 'আমরা তো আজও তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল গেল। তখনও যখন এলে না, ভাবলাম হয়তো বরানগরের কথা ভুলেই গেছ।' পরক্ষণেই গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'কই গো, কোথায় গেলে? পুঁটু-বাবলি-ঝন্টু, কোথায় রে তোরা? আয় আয় দেখবি আয়, কে এসেছে—'

চারদিকের ঘর-বারান্দা থেকে দুদ্দাড় করে অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে বেরিয়ে এল। কুড়ি থেকে পাঁচ-ছয়ের মধ্যে বয়েস। সবাই ফর্সা জামা-কাপড় পরে সেজেগুজে রয়েছে। সন্দীপ আসবে বলেই হয়তো এত সাজসজ্জার ঘটা। আবছা-ভাবে সন্দীপের মনে পড়ল, জার্মানী যাবার আগে মেজদির দুই ছেলেমেয়ে দেখে গিয়েছিল। বাদবাকি এই দশ বছরে হয়েছে।

হেসে হেসে গর্বের গলায় মেজ জামাইবাবু বলল, 'তোদের মেজ মামা। হুঁ-হুঁ বাবা, সামান্য লোক না, জার্মানী ফেরত। পেন্নাম কর—পেন্নাম কর—'

ঢিপ ঢিপ করে ছেলেমেয়েগুলো সন্দীপের পায়ে মাথা ঠুকে গেল। তাদের সঙ্গে সন্দীপের পরিচয় করিয়ে মেজ জামাইবাবু বলল 'চল, ওপরে গিয়ে বসি।'

সামনের দিকে একটা বাঁক ঘুরে ওরা দোতলার সিঁড়িতে উঠল। মেজদির বাচ্চাগুলো সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সন্দীপের মনে হ'ল, শোভাযাত্রা করে ওরা তাকে নিয়ে যাচ্ছে।

দোতলায় উঠতেই মেজদির সঙ্গে দেখা। সেদিন লক্ষ করেনি, আজ দেখল, মেজদির চোখের কোণে কালি, মা হবার কিছু লক্ষণও চোখে পড়ল।

মেজদি অল্প হেসে বলল, 'আসতে পারলি শেষ পর্যন্ত?'

জড়ানো গলায় কিছু একটা উত্তর দিল সন্দীপ।

মেজদি বলল, 'আয় এ-ঘরে—'

ডান দিকের সব চাইতে বড়ো ঘরটায় সিংহাসনের মতো প্রকাণ্ড এক চেয়ারে সন্দীপকে বসানো হ'ল। মেজদির ছেলেমেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে সঙ্কোচ আর

কৌতূহল-মাখানো চোখে তাকিয়ে থাকল।

সন্দীপের চেয়ারটার গা ঘেঁষে ঢালা তক্তপোষে অনন্ত শয্যা পাতা রয়েছে। আগেও দেখেছে সন্দীপ, ছয় ঋতু বারো মাস এই বিছানাটা পাতাই থাকে।

ডাঁই-করা তেলচিটে বালিশ, ময়লা বেড-কভার, ছেঁড়া তোষক থেকে পেচ্ছাবের দুর্গন্ধ উঠে আসছিল। সন্দীপ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

মেজ জামাইবাবু আর মেজদি তক্তপোষে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। মেজদি বলল, 'মা কেমন আছে রে?'

সন্দীপের মনে পড়ল, কাল আর আজ দু'দিন মা'র ঘরে উঁকি দ্যায়নি। খোঁজখবরও নেয়নি। সূক্ষ্ম অপরাধবোধে কোথায় যেন একটু ছুঁচ ফোটাল। জড়ানো গলায় সন্দীপ বলল, 'ওই একরকম—'

'মেডিকেল রিপোর্টটা পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী আছে তাতে?'

'কেন, জামাইবাবু তো সেদিন গেছল। তোকে কিছু বলেনি?'

মেজ জামাইবাবু তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'রিপোর্টে পরিষ্কার কিছু পাওয়া যায়নি ; আবার চেক-আপ করতে হবে—তাই বলিনি।' সন্দীপের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল মেজ জামাইবাবু।

সন্দীপ বুঝল, ক্যান্সারের কথাটা মেজদির কাছে চেপে গেছে মেজ জামাইবাবু। সে-ও এ নিয়ে কিছু বলল না। শুনলেই এক্ষুণি মড়াকান্না জুড়ে দেবে মেজদি। পরে নিশ্চয়ই শুনবে। যখন শুনবে তখন যা হয় হবে।

'বাবা-বৌদি-দিদি, ওরা কেমন আছে?'

'ভালোই।'

'হারু কী করছে?'

'ওর কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবি না।'

একটু চুপ করে থেকে মেজদি বলল, 'এখন কী খাবি বল্। চা, না সরবত?'

সন্দীপ বলল, 'চা-ই আন্—'

'এই গরমে চা খাবি? তার চাইতে এক গেলাস লেবুর সরবত করে দি।'

'তোর যখন ইচ্ছে, দে।'

সরবত খেতে খেতে ওরা নানারকম গল্প করতে লাগল। নতুন করে জার্মানীর গল্প হ'ল, কলকাতা কি রকম লাগছে, সন্দীপ এখানে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মধ্যেই হঠাৎ দুম করে মেজদি বলল, 'গৌরী আর

রমা বড়ো হয়েছে ; ওদের যদি বিয়ে দেওয়া যেত—'

সন্দীপ উত্তর দিল না ; সাংসারিক প্রসঙ্গ উঠলেই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মতো মেজদি বলতে লাগল, 'মা-বাবারও বয়েস হয়েছে। মা'র শরীরের যা অবস্থা ; কখন আছে কখন নেই। তার আগে যদি গৌরী-রমার বিয়েটা দেখে যেতে পারতো—'

সন্দীপ চুপ।

একটু থেমে মেজদি আবার বলল, 'ওরা চাকরি-টাকরি করছে। মেয়ের রোজগারে খাওয়া যে কী লজ্জার! মা-বাবার দিকে আমি আর তাকাতে পারি না।'

মেজদিটা কি ঘুরিয়ে তাকেই খোঁচা দিচ্ছে? এই যে নেমন্তন্ন করে আনা হয়েছে, এটা কি ষড়যন্ত্র? উদ্দেশ্য কি ওদের? সন্দীপের কপাল কুঁচকে যেতে লাগল ; দ্রুত রক্ত মাথায় চড়তে লাগল।

মেজদি বলল, 'তোকে একটা কথা বলব?'

রুক্ষ চাপা গলায় সন্দীপ বলল, 'কী?'

'একটা ছেলে আছে। সম্পর্কে আমার দেওর হয় ; ছেলেটির স্বভাবচরিত্র বেশ, দেখতেও সুন্দর, চমৎকার স্বাস্থ্য। ম্যাট্রিক পাশ অবশ্য, চাকরিটা কিন্তু ভালোই করে ; উপরি-টুপরি মিলিয়ে মাসে চারশো সাড়ে চার শো রোজগার। দাবি-দাওয়াও তেমন নেই। গৌরীর সঙ্গে বেশ মানাবে।'

সন্দীপ চোয়াল শক্ত করে থাকল।

মেজদি আবার বলল, 'ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলব?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? বাবাকে বল্—'

'বাবাকে বলে কী হবে?'

'তা আমি কী করব?'

'করলে তো তুই-ই করবি, বাবার কি সে সামর্থ্য আছে? তুই কথা দিলে আমি এগুতে পারি।'

এরা তাকে ভেবেছে কী? নিস্পৃহ কঠিন গলায় সন্দীপ বলল, 'আমি ওসব কিছু জানি না। দু-চারদিনের জন্যে এসেছি ; আমাকে এ-সবের মধ্যে জড়াসনি মেজদি।'

চড় খেয়ে মেজদির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল যেন। বলল, 'ও—ও, আচ্ছা—'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মেজদি আবার শুরু করল। আপন মনেই বলে যেতে লাগল, 'বৌদির দিকে তাকানো যায় না। জীবন যে ওর কী করে চলবে? এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা!'

মেজদি কি সন্দীপকে সামনে বসিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষের চতুর উকিলের মতো তার

যাবতীয় দুষ্কৃতি আর অপরাধের তালিকা মনে করিয়ে দিতে থাকবে? ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্লেনে ওঠার আগে ব্লাডপ্রেসার মাপিয়েছিল সন্দীপ। সেদিক থেকে কোনো রকম গোলমাল নেই। প্রেসার পারফেক্টলি নরমাল। কিন্তু এই মুহূর্তে ঘাড় গলা চিন-চিন করছে, কান গরম হয়ে উঠেছে। সে অনুভব করতে লাগল রক্তচাপ চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে। তারই ভেতর ঝাপসাভাবে একবার সে ভাবল, দাদা তার জন্য কী না করেছে। এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে হয়েছে তাকে। বৌদি আর তার বাচ্চাগুলোর জন্য কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কী করতে পারে সন্দীপ? কিছু করতে গেলেই তো এখানে জড়িয়ে পড়তে হবে। হঠাৎ নিজের ওপর দারুণ রাগ হ'তে লাগল। কেন যে সে দেশে ফিরতে গেল? বাপ-মার অসুখ হয়, কেউ কেউ মরেও যায়। সবসময় সব ছেলেমেয়েকেই শিয়রে বসে থাকতে হবে, এমন কথা নেই।

মেজদি আবার বলল, 'বৌদির যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বাচ্চাগুলো যাতে মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারে, একটু দেখিস ভাই।'

আজ বিবেকের রোলটা কি মল্লিকার হাত থেকে মেজদির হাতে চলে গেছে? সন্দীপ চুপ করে রইল।

মেজদি একটু ভেবে বলল, 'বড়দিটারও কী কপাল! আমাদের সংসারটায় যেন শনির দৃষ্টি পড়েছে!'

বড়দির কথা উঠতেই ঝট করে সেই পুরনো সঙ্কল্পটা আরেকবার মনে পড়ে গেল সন্দীপের। শিগগিরই একদিন বড়ো জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করে তার ঘাড়ে গোটাকতক লাথি কষিয়ে আসবে।

আরো কিছুক্ষণ পর সন্দীপের ব্লাডপ্রেসার একটা মারাত্মক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে মেজদি উঠল, 'তোরা গল্প-টল্প কর; আমি রান্নাঘরে যাই।' ও চলে গেল।

মাথার ভেতরকার দপ্‌দপে শিরাগুলো শান্ত করার জন্য সন্দীপ চারদিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত ভাগনে-ভাগনীদের ডাকল। প্রথমে ওরা কিছুতেই কাছে আসবে না; অনেক ডাকাডাকির পর এল। দাদার বাচ্চাগুলোর চাইতে এরা অনেক পরিচ্ছন্ন, ওদের পোশাক-টোশাকও বেশ পরিষ্কার।

সঙ্কোচ-টঙ্কোচ ভাঙাবার পর জমিয়ে নিতে বেশিক্ষণ লাগল না। মেজদির বাচ্চাগুলো শুধু জার্মানীর গল্প শুনতে চায়। ওদেশের হিচ-হাইকিং-এর গল্প, খেলাধুলো হুল্লোড়বাজি এবং এ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনতে শুনতে ওদের চোখ চকচক করতে লাগল।

অনেকক্ষণ গল্পের পর মাথাটা যেন হাল্কা হ'ল সন্দীপের। আর তখনই মেজ-

জামাইবাবু ছেলেমেয়েদের বলল, 'দু ঘণ্টা মেজ মামাকে বকিয়েছ; এবার যাও। আবার পরে গল্প-টল্প হবে।'

ছেলেমেয়েগুলো ভারি বাধ্য আর ভদ্র। ওরা আস্তে আস্তে চলে গেল। মেজ জামাইবাবু উঠে দরজায় খিল লাগিয়ে ফের তক্তপোষে এসে বসল। বলল, 'ওদের যেতে বললাম কেন জানো?'

'কেন?'

'সুধার বোতলখানা বার করব ভাবছি।'

'এক্ষুণি?'

'কেন, আপত্তি আছে?'

'না, ঠিক আপত্তি নেই। তবে—'

'তবে-টবে না; গলাটা ভীষণ খুসখুস করছে। এখন একটুখানি চাখো; তারপর রাত্তিরে আবার দেখা যাবে'খন।' মেজ জামাইবাবু তক্তপোষের তলায় একটা অকেজো ভাঙাচোরা ট্রাঙ্ক থেকে বোতল আর কলাই-করা গেলাস বার করে আনল।

অনেক রাত্তিরে খাবার ডাক পড়ল। বাচ্চাদের আগেই খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় পাঠিয়ে দিয়েছে মেজদি। শুধু বড়ো মেয়েটা মা'র সঙ্গে সঙ্গে আছে; সংসারের কাজে মেজদিকে নিশ্চয়ই সাহায্য করে সে। এদেশের এ-ই নিয়ম। মেয়ে একটু বড়ো হলেই মা'র হেল্পিং হ্যাণ্ড হয়ে ওঠে। বড়দি মেজদিকে দেখেছে; বিয়ের আগে ওরা মা'র পায়ে পায়ে ঘুরে তাদের বিরাট সংসারের ঘানি টানত।

ফুল-লতাপাতা-কাটা প্রকাণ্ড দুই আসনে বসে সন্দীপ আর মেজ জামাইবাবু খাচ্ছিল। তাদের সামনে বড়ো কাঁসার থালা; থালাটা ঘিরে সারি সারি অগুনতি বাটি।

মেজদির বাড়িতেও ফ্যান-ট্যান নেই। ঘামে জামা-টামা সপসপে হ'য়ে যাচ্ছে সন্দীপের।

মেজদি একটা উঁচু পিঁড়ির ওপর বসে গলগল করে ঘামতে ঘামতে বাঁ হাতে পাখার হাওয়া খাচ্ছিল আর ডান হাতে সন্দীপদের পাতে দরকারমতো মাছ তরকারি তুলে দিচ্ছিল। মেজদির বড়ো মেয়ে নমিতা দরজার কাছে ছবি হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

খাওয়া যখন আধাআধি হ'য়ে এসেছে, মেজদি হঠাৎ ডাকল, 'পচা—'

সন্দীপ মুখ তুলল।

মেজদি বলল, 'তোকে একটা কথা বলব ?'

'কী ?'

তক্ষুণি উত্তর দিল না মেজদি। হাতপাখাটা নামিয়ে আঁচলে মুখটা মুছে নিল। তারপর আঙুলের ডগায় শাড়ির খুঁটটা একবার জড়ায়; তখনই খুলে ফেলে। আবার জড়ায়, আবার খোলে।

সন্দীপ বলল, 'কী রে, চুপ করে আছিস ? কী বলবি বল্-না—'

শেষ পর্যন্ত নিজে আর বলতে পারল না মেজদি; কিছুক্ষণ ভেতরকার দ্বিধাটার সঙ্গে যুদ্ধ করে জামাইবাবুর দিকে তাকাল, 'তুমিই বল—'

মেজ জামাইবাবু কপাল থেকে বাঁ হাতে ঘামের দানাগুলো কাঁচিয়ে ফেলে লাজুক হাসল, 'তোমাদের ভাইবোনের ভেতর আবার আমাকে কেন ?'

মেজদি বলল, 'না-না, তুমিই বল। আমি গুছিয়ে গাছিয়ে কথা বলতে পারি না; কী বলতে কী বলব—'

মেজ জামাইবাবু বলল, 'বেশ আমিই বলছি—' একটু থেমে মনে মনে বক্তব্যটা গুছিয়ে নিল সে, তারপর শুরু করল, 'শালাবাবু, খুব সঙ্কোচ হচ্ছে, তবু না বলে উপায় নেই।'

সন্দীপ বিরক্ত হ'ল, 'দু'জনে তখন থেকে কী ভণিতা করছেন !'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ বলছি। তুমি তো আমাদের অবস্থা দেখছ। এই বাড়িটার যা হাল হয়েছে, কোনদিন হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়বে। বর্ষার পর বর্ষা যাচ্ছে, অথচ সারাতে পারছি না।'

'পারছেন না কেন ?'

'ক্যাশ ভায়া, ক্যাশ—' বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে মেজ জামাইবাবু বলল, 'এটার খুবই অভাব।'

সন্দীপ চুপ করে রইল।

মেজ জামাইবাবু আবার বলল, 'তার ওপর হাজার দুই টাকা ধার হয়ে গেছে। পাওনাদার তাগাদা দিয়ে দিয়ে চামড়া খুলে নেবার যোগাড় করেছে। আমি শালা আর তাল সামলাতে পারছি না।'

সন্দীপ এবারও কিছু বলল না।

মেজ জামাইবাবু মুখ কাচমাচু করে আবার বলল, 'তুমি যদি ভাই হাজার চারেক টাকার ব্যবস্থা করতে পার, বাড়িটা সারিয়ে সুরিয়ে নিতে পারি; ধারটাও শোধ করা যায়।'

এতক্ষণে আসল বেড়ালটা ঝুলি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বার বার

বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসার রহস্যটা এখন জলের মতো পরিষ্কার। হঠাৎ মাথা গরম হয়ে গেল সন্দীপের, 'ধার করেছেন কেন ?'

'বুঝতেই পারছ, এত বড়ো সংসার—এটা আনতে ওটা ফুরোয় ; ওটা আনতে এটা—'

'অথচ মাল খাওয়াটি ঠিক চলছে।' হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো সন্দীপ চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি বাড়ি সারাবেন, ধার শোধ করবেন, তার টাকা দিতে হবে আমাকে ? আপনারা আমাকে ভেবেছেন কী ? একটা ফার্দিং দেব না।'

আহত বোবা পশুর মতো তাকিয়ে থাকল মেজ জামাইবাবু। মেজদি বিমূঢ়ের মতো একবার স্বামীকে একবার ভাইকে দেখতে লাগল। নমিতার মুখটা ভয়ে বিস্ময়ে কেমন যেন হয়ে গেল।

লাফ দিয়ে পাত ছেড়ে হঠাৎ উঠে পড়ল সন্দীপ।

মেজদি কয়েক পলক বিমূঢ় হয়ে থাকল। তারপর ঝট করে উঠে দাঁড়াল। কাঁপা গলায় বলল, 'কি হ'ল ?'

সন্দীপ গোঁয়ারের মতো বলল, 'আমি আর খাব না।'

'কেন, খাবি না কেন ?'

সন্দীপ উত্তর দিল না। ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

মেজদি এবার প্রায় কেঁদে ফেলল, 'তুই যদি খেতে খেতে এখন উঠে যাস পচা আমি মাথা খুঁড়ে মরব।'

মেজ জামাইবাবুও এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সন্দীপের একটা হাত ধরে অনুনয়ের গলায় বলল, 'টাকা তোমায় দিতে হবে না। যা বলেছি উইথড্র করে নিচ্ছি। এত রাত্তিরে তুমি যদি পাত থেকে উঠে চলে যাও আমাদের মানসিক অবস্থা কী হয় একবার ভেবে ছাখো—'

ঘাড় গোঁজ করে আবার বসে পড়ল সন্দীপ। তারপর চুপচাপ খেয়ে উঠে বলল, 'এবার আমি যাই—'

মেজ জামাইবাবু বলল, 'এগারোটা বেজে গেছে ; রাস্তাঘাট খারাপ। এত রাত্তিরে যাওয়া ঠিক হবে না ; কাল সকালে যেও।'

'না ; এখনই আমি যাব।'

মেজ জামাইবাবু বার বার করে বলল, মেজদি হাতে ধরল কিন্তু সন্দীপকে আটকানো গেল না ; একরোখার মতো চলে গেল।

মেজ জামাইবাবুও তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল ; রাস্তার মোড়ে এসে একটা ট্যাক্সিতে তুলে বাড়ি ফিরে গেল সে।

এত রাতে বি. টি. রোড-টা একেবারে ফাঁকা। হঠাৎ হঠাৎ অন্য প্রভিন্সের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দু-একটা লরি ঝড় তুলে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু' ধারে লাইট পোস্টগুলো ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। কোনোটায় আলো জ্বলছে; বেশির ভাগই অন্ধ; বাল্ব-টাল্ব কারা চুরি করে নিয়ে গেছে।

বাইরের হু-হু হাওয়ায় মাথাটা জুড়িয়ে আসতে লাগল। মেজ জামাইবাবুর ওপর কেন যে হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, সন্দীপ ভেবে পেল না। মাথা গরম না করেও ভালো কথায় টাকার ব্যাপারটা সে এড়িয়ে যেতে পারত। এখন তার খুব খারাপ লাগছে; অনুশোচনার মতো কিছু একটা তাকে পেয়ে বসল।

আচমকা সন্দীপ এক কাণ্ডই করে বসল। ড্রাইভারকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'ট্যাক্সি ঘুমাইয়ে তো সর্দারজী। যঁহাসে আয়া উঁহা যানা পড়ে গা—'

মেজদির বাড়ির দরজায় ফিরে আসতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। কড়া নাড়তে জামাইবাবু এসে দরজা খুলে দিল; সন্দীপকে দেখে ভদ্রলোক একেবারে হতবাক। বলল, 'তুমি!'

সন্দীপ বলল, 'হ্যাঁ আমি! একটা কথা বলবার জন্যে ফিরে আসতে হ'ল।'

'এসো, ভেতরে এসো।'

'না, এখানেই বলি।'

'কী?'

মেজ জামাইবাবুর একটা হাত নিজের হাতের ভেতর টেনে নিয়ে সন্দীপ বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না জামাইবাবু; তখন আমার কী যে হয়ে গিয়েছিল! ঐ চার হাজার টাকা আপনাকে আমি দেব। তবে এখন না; জার্মানী ফিরে গিয়েই পাঠিয়ে দেব। মেজদিকে বলবেন, ও যেন আমার ওপর রাগ না করে।'

'সে সব হবে'খন। তুমি ভেতরে এসো তো—'

সন্দীপ বলল, 'আজ আর না; পরে একদিন আসব।'

মেজ জামাইবাবু গাঢ় আবেগের গলায় বলল, 'ঠিক আসবে?'

'আসব।'

সন্দীপ আবার ট্যাক্সিতে গিয়ে বসল। বসেই মনে হ'ল, জালের মতো কিছু একটার ভেতর সে আটকে গেল। মেজদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, বেশ করেছিল। কেন যে আবার ফিরে আসতে গেল!

আঠারো

রিনি সেই যে পিকনিকে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে প্রায় রোজই তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। হুট হুট গাড়ি নিয়ে হাজির হয় সে। কোনদিন বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কিংবা লেকের ধারে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে। সন্দীপ সোজা সেখানে চলে যায়।

রিনি সাউথ আর সেন্ট াল ক্যালকাটার অনেকগুলো ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার। সন্দীপকেও দু-তিনটে সোসাইটির মেম্বার করে দিয়েছে। সেন্সর যে-সব দুঃসাহসী বিদেশী ছবির পায়ে বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছে, সেগুলো এ-সব জায়গায় অবাধে দেখানো হয়। নতুন রীতির ফ্রেঞ্চ, টার্কিশ আর চেক ছবি দেখবার জন্য কী ভিড়, কী ভিড়! নতুন রীতি না হাতি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এন্তার সেক্স; ন্যুডিটির ছড়াছড়ি।

রিনি বলে, 'এ-সব ছবি নিশ্চয়ই ইওরোপ-টিওরোপে ওপেনলি এক্সহিবিট করা হয়?'

সন্দীপ বলে, 'ও, সিউর।'

'এ-সব ব্যাপার নিয়ে ওখানে কেউ বোধহয় মাথা ঘামায় না; তাই না?'

'হ্যাঁ; লাইফের প্যাটার্নটাই সেখানে অন্যরকম।'

কোনদিন ওরা সোসাইটির ছবি ছাখে, কোনদিন ডায়মণ্ডহারবার রোড কি জি. টি. রোড ধরে হু-হু গাড়ি ছুটিয়ে ছায়। ভাঙাচোরা রাস্তা, আবর্জনার স্তূপ, মিছিল, চিৎকার, স্লোগানের বাইরে আরেক কলকাতার দিকে রিনি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ি এসে নিয়ে যাক কিংবা রাস্তা থেকেই তুলে নিক, ফেরার সময় রিনি কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। তখন আর নামে না রিনি; পরের দিন কোথায় কখন দেখা হবে, বলে দিয়ে হাত নেড়ে চলে যায়।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে সন্দীপ; রাত দশটার ভেতর ফিরে এলে দেখা যায়—বারান্দায় বসে বসে বড়দি, বৌদি কি গৌরী রমার সঙ্গে গল্প করছে মল্লিকা। তাকে দেখলেই ঝট করে উঠে দাঁড়ায় সে; ঝকঝকে পলকহীন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বৌদিদের দিকে ফিরে বলে, 'আজ চলি', বলেই এক মিনিটও আর থাকে না; সন্দীপের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। যেদিন রিনির সঙ্গে বাড়ি ফিরতে বারোটা-একটা হয়ে যায় সেদিন অবশ্য মল্লিকাকে দেখা যায় না।

রিনির সঙ্গে তার ঘোরাঘুরির খবরটা নিশ্চয়ই জেনে গেছে মল্লিকা। জানাই উচিত। সন্দীপ তো আর লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু করছে না ; যা করছে সবার সামনে বুক ফুলিয়ে, একরোখার মতো। সন্দীপ জানে, সে যা খুশি করুক এ-বাড়িতে কেউ অন্তত বাধা দেবে না। কেউ যদি বাবাকে এ-নিয়ে তাতাতে যায়, বাবা হেসে হেসে বলবে, ছেলে আমার দশ বছর জার্মানীতে ছিল ; এ-সব ওখানকার দস্তর ভায়া। সেকেলে মেণ্টালিটি নিয়ে ওদের দেখলে চলবে না। দিনকাল সব বদলে গেছে।

কিন্তু মল্লিকা এত রাত পর্যন্ত এ-বাড়িতে বসে থাকে কেন ? আবছাভাবে সন্দীপ ভাবতে চেষ্টা করেছে। কে জানে, কেন থাকে।

একদিন যশোর রোড ধরে সন্দীপরা অনেকদূর চলে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে এগারোটার মতো হ'য়ে গেল।

কী আশ্চর্য, মল্লিকাকে দেখা গেল—বাবা আর বড়দির সঙ্গে রকে বসে আছে। এত রাত পর্যন্ত সে তো কোনদিন থাকে না। মল্লিকার মুখেই শুনেছে, ওদের রিফিউজি কলোনির দিকে রাস্তাঘাট সন্ধ্যের পরই নির্জন, অন্ধকার হয়ে যায়। মিউনিসিপ্যালিটির আলো-টালোগুলো জ্বলে না। তবু আজ এতক্ষণ কেন আছে ?

অন্য দিন তাকে দেখেই চলে যায় মল্লিকা ; আজ কিন্তু গেল না। সন্দীপের সঙ্গে তার ঘরে এল।

মল্লিকাকে দেখলে আজকাল সন্দীপের আরাম লাগে না। 'ওকে দেখে কেন আমি কুঁকড়ে যাব ? কত মেয়ের সঙ্গেই তো ইন্টিম্যাসি হয় ; তাই বলে সবাইকেই বিয়ে করতে হবে নাকি ?' সন্দীপ ভাবল। তারপর গা থেকে অস্বস্তিটা টোকা দিয়ে দিয়ে ঝেড়ে ফেলে স্মার্ট হ'ল, 'আমাকে কিছু বলবে ?'

'হ্যাঁ—' দরজার ওপর ক্লান্ত রেখায় দাঁড়িয়ে ছিল মল্লিকা। বলল, 'সেই জন্যেই তো এতক্ষণ বসে আছি।'

'বল।'

'কাল ন'টার সময় আমি আসব ; আপনি বাড়ি থাকবেন।'

'রাত ন'টায় ?'

'না, সকালে।'

সন্দীপের মনে পড়ল, কাল এগারোটায় রিনির সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবার যাবার কথা আছে। রিনি গাড়ি নিয়ে হাজরার মোড়ে রেলওয়ে বুকিংটার কাছে আসবে। সেখান থেকেই তাকে তুলে নেবে। তার মানে অন্তত সাড়ে দশটার ভেতর তাকে বেরিয়ে যেতে হবে।

সন্দীপ বলল, 'আমার কাছে কিছু দরকার আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী ?'

'কাল বলব।'

'আজই বল না—'

'আজ বলে লাভ নেই, বাড়ি থাকবেন। কালকের দিনটা অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি ; আমার সঙ্গে আপনাকে এক জায়গায় যেতে হবে।'

সন্দীপ থমকে গেল, 'আমি যেতে পারব না।'

খুব দৃঢ় গলায় মল্লিকা বলল, 'কিন্তু যেতে আপনাকে হবেই।'

'আমি যে কাল একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে ফেলেছি।'

'ওটা ক্যানসেল করে দিন।'

'তা কি করে হবে, খুব জরুরী ব্যাপার—'

'তার চেয়ে এটা ঢের বেশি জরুরী। আপনি কাল থাকবেন ; আমি আসব। আচ্ছা এখন চলি।' রানীর মতো আদেশ দিয়ে মল্লিকা চলে গেল।

একটু পর বাইরে বাবার গলা শোনা গেল, 'এত রাত্তিরে একা-একা যেতে হবে না ; চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

মল্লিকা বলল, 'আপনি আবার কেন কষ্ট করে যাবেন কাকাবাবু—আমি কিন্তু চলে যেতে পারতাম।'

বাবা কিন্তু শুনল না, মল্লিকাকে এগিয়ে দেবার জন্য তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

আর ঘরের ভেতর অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকল সন্দীপ। তার মাথার ভেতরটা টগবগ করে ফুটছিল, শিরায় শিরায় গলানো সীসার মতো কী যেন ছোটাছুটি করছিল। মল্লিকা তাকে কাল ন'টার সময় থাকতে বলেছে, বললেই থাকতে হবে ? এমন দাসখত সে কারো কাছে লিখে দ্যায়নি। কিছুতেই সে কাল বাড়ি থাকছে না।

উনিশ

পরদিন সকাল সাতটার ভেতর ঘুম থেকে উঠে স্নান-টান করে ফিটফাট হয়ে নিল সন্দীপ। মল্লিকা ন'টার সময় আসবে, বলেছে। তার আগেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে।

কিন্তু বেরুনো হ'ল না। অদৃশ্য শক্তির মতো কি যেন একটা তাকে চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখল। যতবার সন্দীপ উঠতে গেল ততবারই মনে হ'ল, তার পায়ে কেউ পেরেক ঠুকে মেঝের সঙ্গে আটকে দিয়েছে। নিজের ঘরে বসে সে গলগল করে ঘামতে লাগল।

কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় মল্লিকা এ-বাড়িতে এল। সন্দীপের ঘরে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'রেডি হয়ে আছেন, দেখছি। ভেরি গুড। আমি ভেবেছিলাম, আপনাকে তাড়া দিয়ে চান-টান করাতে হবে।'

সন্দীপ ঘাড় গোঁজ করে রইল ; উত্তর দিল না।

মল্লিকা আবার বলল, 'কিছু খেয়ে-টেয়ে নিয়েছেন ?'

খুব সংক্ষেপে সন্দীপ বলল, 'না।'

'খেয়ে নিলে পারতেন। ফিরতে-ফিরতে ক'টা বাজবে বলা যায় না।'

'আমি এখন খাব না।'

মল্লিকা খাওয়ার ব্যাপারে আর কিছু বলল না।

সন্দীপ আবার বলল, 'কোথায় যাব আমরা ?'

'গেলেই দেখতে পাবেন।'

'গেলে তো দেখতে পাবই। তার আগে জায়গাটার নাম শুনতে দোষ কী ?

'অত অস্থির হচ্ছেন কেন ? আচ্ছা আপনি একটু বসুন, আমি কাকিমার ঘর থেকে আসছি।'

সন্দীপ বিরক্ত গলায় বলল, 'যেখানেই নিয়ে যাও, দশটার বেশি কিন্তু আমি থাকতে পারব না।'

'কতক্ষণ থাকতে হবে, সেটা আমার হাতে না—'

মল্লিকা চলে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন আবার ফিরে এলো, তার সঙ্গে বাবা আর বড়দি। বাবার সেই চিরকালের রয়াল ড্রেস—ডবল-কাফ দেওয়া টুইলের ফুল শার্ট, ধুতির তলায় সেটা গোঁজা, এই গরমেও হাঁটু পর্যন্ত মোজা আর তালিমারা বুট। বড়দিও মোটামুটি একখানা ফর্সা শাড়ি আর সস্তাদামের চটি পরে নিয়েছে। তবে দু' জনকেই ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

মল্লিকা বলল, 'চলুন—'

নিঃশব্দে উঠে পড়ল সন্দীপ, অনিচ্ছুক পায়ে বাইরের রকে আসতেই মা'র ঘর থেকে কান্নার শব্দ শোনা গেল—মা কাঁদছে। হঠাৎ সন্দীপের মনে পড়ল, দু-তিন দিন সে মা'র খোঁজ খবর নেয়নি। রান্নাঘরের জানলায় চোখ যেতেই দেখা গেল, বউদি জীর্ণ গরাদে মুখ চেপে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। দাদার ছেলেমেয়ে-

গুলোও আজ আর ছুটোপাটি করছিল না, রকের আরেক ধারে জড়াজড়ি করে তারা বসে আছে। সারা বাড়ি ঘিরে অসহ্য চাপা উৎকণ্ঠা টের পাওয়া যাচ্ছিল।

হঠাৎ কী এমন হ'ল? সন্দীপ বুঝতে পারছিল না। তবে সবার উদ্বেগ তাকে ভেতরে ভেতরে বিচলিত করে তুলছিল। সন্দীপ একবার ভাবল, কারণটা জিজ্ঞেস করে। কি ভেবে আর করল না।

বড়ো রাস্তায় এসে আরেকবার বাবা আর আলোকে দেখে নিল সন্দীপ। এমন প্রসেসান করে তারা চলেছে কোথায়?

এখন প্রায় সাড়ে ন'টার মতো বাজে। অফিস টাইমের ভিড় শুরু হ'য়ে গেছে। এই পীক আওয়ারে ট্রাম-বাসে পা রাখবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবা মল্লিকাকে বলল, 'কিভাবে যাবে? যা ভিড়!'

'তাই তো দেখছি।' চারদিকে তাকাতে তাকাতে মল্লিকা বলল, 'কিন্তু এখন না গিয়েও উপায় নেই। ফার্স্ট আওয়ারেই টাইম দিয়েছে। একটু আগে আগে যাওয়াই ভালো।

সন্দীপ হঠাৎ বলল, 'কোথায় যাবে?'

মল্লিকা বলল, 'আলিপুর।'

'কাছেই তো; একটা ট্যাক্সি ডাকি।'

বাবা খ্যাঁক করে উঠল, এখান থেকে এখানে যাব; আবার ট্যাক্সি কেন? শুধু শুধু পয়সার শ্রাদ্ধ।'

সন্দীপ গ্রাহ্য করল না। এ সময় ট্যাক্সি পাওয়া লটারি পাওয়ার মতো। অনেকক্ষণ ছোটাছুটি করবার পর শেষ পর্যন্ত একটা অবশ্য পাওয়া গেল।

ট্যাক্সিতে উঠে মল্লিকা ট্যাক্সিওলাকে বলল, 'আলিপুর কোর্ট চলুন।'

সন্দীপ চমকে উঠল, 'কোর্টে কেন?'

মল্লিকা বলল, 'আজ পটলার কেসের রায় বেরুবে।'

এই জন্যেই বাড়ির সবার এত উৎকণ্ঠা, মা'র চাপা কান্না। রায় যা বেরুবার তা বেরুবেই। কেউ সেটা ঠেকাতে পারবে না। তবু কেন যে মল্লিকা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! কোন মানে হয়? বিরক্ত অসন্তুষ্ট সন্দীপ জানলার বাইরে ছুটন্ত দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে থাকল। বার-বার সে মল্লিকাকে বলেছে, সংসারের কোন ঝামেলায় যেন তাকে না জড়ায়, কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই তাকে ছাড়বে না।

ওরা কোর্টে গিয়ে বসবার আধ ঘণ্টাখানেক পর ম্যাজিস্ট্রেট এলেন। তারপর পুলিশ পাহারায় পটলাকে আসামীর কাঠগড়ায় তোলা হ'ল।

কাঠগড়ায় এসে যে দাঁড়াবে সে-ই পটলা, আগে থেকে এটা জানা না থাকলে সন্দীপ তাকে চিনতেই পারত না। দশ বছর আগে যখন সে জার্মানী যায় তখন পটলার বয়স কত? আট ন'য়ের বেশি না। তখনকার সেই কচি মুখটা সন্দীপের মনে নেই। এই দশ বছরে ভেঙেচুরে পটলার চেহারা অন্যরকম হ'য়ে গেছে। ঘন দাড়ি, কড়া চোয়াল, সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো হাইট, সিগারেটের ধোঁয়ায় কালো ঠোঁট আর শক্ত চওড়া হাড়ে সে এখন গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান।

এই পটলা—বোমা, বাবার ভাষায় পেটো ছুঁড়ে কাকে জখম করেছে! সন্দীপ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

একটু পর দেখা গেল কোত্থেকে হাঁসফাঁস করতে করতে সেই ভদ্রলোক, উকিল রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এসে হাজির। তখনই ম্যাজিস্ট্রেট নির্বিকার পাথুরে মুখে গড়গড় করে রায়টা পড়ে গেলেন, 'ভারতীয় দণ্ডবিধির অমুক অমুক ধারা অনুসারে অভিযুক্ত আসামী দোষী প্রমাণিত হইয়াছে। আসামীর বয়স কম হওয়ায় এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের সুযোগ দিবার জন্য লঘু দণ্ড হিসাবে তাহাকে দু-মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম।'

রায় পড়া হয়ে গেলে পটলাকে 'ডক' থেকে নামানো হ'ল। ওদিকে মল্লিকা, বাবা আর আলো হুড়মুড় করে তার দিকে ছুটল। নিজের অজান্তে সন্দীপও উঠে পড়েছিল। পায়ে পায়ে সে-ও এগিয়ে গেল।

আলো কাঁদছিল। বাবার ঘোলাটে চোখদুটো কি রকম স্থির হয়ে গেছে; ফ্যাকাসে ঠোঁট ভীষণ কাঁপছে, কাঁধের ওপর গজালের মতো হাড়-দুটো ওঠানামা করছিল। রোগা হাতটা তুলে পটলার কাঁধে রাখল বাবা; গাঁটওলা এবড়ো খেবড়ো আঙুলগুলো নড়েচড়ে পটলার কাঁধের মাংস চেপে চেপে ধরতে লাগল।

বাবার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিল সন্দীপ। যে লোকটা পটলার নাম শুনলেই ক্ষেপে উঠেছে, কেস চলবার সময় একদিনও উকিলের বাড়ি উঁকি দ্যায়নি, সে যে এমন ভেঙে পড়তে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল।

ওদিকে করুণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল পটলা; তার চোখ ঝাপসা দেখাচ্ছিল। ঘাড় ভেঙে যেন ঝুলে পড়ছিল।

প্রথমে মল্লিকাই কথা বলল, 'এ দু-মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আমরা মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখে যাব। ভালোভাবে থাকবে, কারো অবাধ্যতা করবে না।' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল, 'তোমার মেজদার কথা সেদিন বলেছিলাম না?'

'হ্যাঁ—' পটলা মাথা নাড়ল।

'এই যে তোমার মেজদা—' মল্লিকা সন্দীপকে দেখিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পলকহীন সন্দীপের দিকে তাকিয়ে থাকল পটলা। তারপর ঝুঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বিস্ময় আর দুঃখ মিশিয়ে বলল, 'তুমি এসেছ মেজদা, তুমি এসেছ!'

সন্দীপ তাকিয়েই থাকল।

পটলা বলতে লাগল, 'মনুদি সেই কবে বলেছিল তুমি এসেছ! হাজতে বসে রোজ ভাবতাম, আমাকে দেখতে আসবে। এ্যাদ্দিনে আসতে পারলে!'

এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি আসতে আসতে বাবার মুখে পটলার হাজতে থাকার কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পটলা সম্বন্ধে সন্দীপের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। যা আছে তা হ'ল রাগ, বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা। কিন্তু এই মুহূর্তে সন্দীপ টের পেল তার মধ্যে অন্য রকম একটা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। জড়ানো গলায় বলল, 'আসব আসব ভেবেছিলাম, নানারকম ঝামেলায়—' ডাহা মিথ্যেটা বলে নিজের অজান্তেই সে মল্লিকার দিকে ফিরল। মল্লিকা ভুরু কুঁচকে তাকেই দেখছিল।

পটলা ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, 'মেজদা, আমি এবার ভালো হব। এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করে না। জেল থেকে বেরুবার পর তুমি আমায় জার্মান নিয়ে যাবে?'

পটলার মাথায় একটা হাত রেখে খুব নরম গলায় সন্দীপ বলল, 'সে হবে'খন। এই দুটো মাস সাবধানে থাকবি।'

'তুমি আমায় দেখতে আসবে তো?'

পটলা ভেবেছে কী? আরো একটা মাস সন্দীপ এখানে থাকবে? মনে যাই থাক, আগের মতোই কোমল গলায় সে বলল, 'নিশ্চয়ই আসব।'

এদিকে সেন্ট্রিরা তাড়া লাগাচ্ছিল, 'চল্ চল্। ইহা ইতনা টিম (টাইম) খড়া হোনাকা অডার নহী—' একটু পর পটলাকে নিয়ে ওরা প্রিজন ভ্যানে উঠল। চক্ষের পলক পড়তে না পড়তেই গাড়িটা সামনের একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মল্লিকা বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, চলুন বাড়ি ফেরা যাক।'

ওরা কোর্ট থেকে বেরিয়ে বাইরের রাস্তায় এল। উকিলবাবুও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। বাবা বার-বার কোঁচার খুঁটে চোখ মুছছিল, বড়দিও কাঁদছিল। চিরকালের খিটখিটে অসন্তুষ্ট বাবাকে অন্য এক চেহারায় দেখে ভালোই লাগছিল সন্দীপের।

উকিলবাবু বলছিল, 'কেসটা ভালো করে সাজাতে পারলে বেকসুর খালাস করে আনতে পারতাম। কিন্তু আপনারা তেমনভাবে কো-অপারেট করলেন না।'

মল্লিকা বলল, 'আমি কত দিক সামলাব বলুন। কাকাবাবু এতে থাকবেন না;

পটলার মেজদাকে আপনার সঙ্গে ইনট্রোডিউস করে দিলাম, তিনিও সরে থাকলেন। এদিকে আমার অফিসে ঝঞ্ঝাট, বাড়িতে ঝঞ্ঝাট। তবু তার ভেতর যতদূর পেরেছি করেছি—'

সোজাসুজি সন্দীপের ঘাড়ে পটলার জেলখাটার দায়টা চাপিয়ে দিল মল্লিকা। সন্দীপ কিন্তু প্রতিবাদ করল না।

চাক চাক বরফের মতো একটা অপরাধবোধ তার বুকের ওপর চেপে বসছিল। তবু রিনির সঙ্গে সেই এ্যাপয়েণ্টমেণ্টটার কথা তুলতে পারছিল না সন্দীপ। আলোদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে বৌদিকে জিজ্ঞেস করল, 'কেউ আমাকে ডাকতে এসেছিল?'

বৌদি বলল, 'না।'

সন্দীপ যখন যেতে পারেনি, রিনি তো আসতে পারত। বুকের ভেতর খিঁচ লাগার মতো কী যেন একটা হ'ল। তার পরেই আবার পটলার মুখটা মনে পড়ে গেল সন্দীপের।

কুড়ি

কোর্ট থেকে ফেরার পর দু'তিন দিন বাড়ি থেকে বেরুল না সন্দীপ; বেরুতে তার ইচ্ছা করছিল না। পটলার ব্যাপারটা তাকে খানিকটা অন্যমনস্ক, খানিকটা বা বিষণ্ন করে রাখল। বার-বার মনে হতে লাগল, সে একটু চেষ্টা করলে, উকিলের কাছে ঘোরাঘুরি করে তার কথামতো ডকুমেণ্ট টকুমেণ্ট যোগাড় করে দিতে পারলে জেলটা না-ও হতে পারত। তাছাড়া ছেলেটা বেশ ভালো, বিনয়ী। হারুর মতন ইনসোলেণ্ট না।

হারুর কথা মনে পড়তেই খেয়াল হল, সেই যে ছেলেটা বাড়ি থেকে চলে গেছে, এখনো ফেরেনি। কোথায় গেছে একটা খবরও দ্যায়নি।

যাই হোক, দু মাস পর পটলা যখন জেল থেকে বেরুবে তখন সন্দীপ নিশ্চয়ই কলকাতায় থাকছে না। না থাক, কিছু একটা ব্যবস্থা করে ওকে জার্মানী নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু জেল খাটলে কি বিদেশ যাবার পাশপোর্ট পাওয়া যায়? নিশ্চয়ই এক্সটার্নাল এ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি বাইরে যাওয়া আটকে দেবে। দেবে। ওদের যা চোখ, ধুলো ছিটনো অসম্ভব। পটলার গায়ে জেলখাটার দগদগে দাগটা ঠিক ওরা ধরে ফেলবে।

সন্দীপ ভাবল, দু'মাস পর পটলা যখন বেরুবে তখন ভাবা যাবে কী করা যায়। তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার কোন মানে হয় না।

এই দু-তিন দিনের ভেতর এ-বাড়িতে আরেকটা ব্যাপার ঘটে গেছে। মা শয্যাশায়ী হয়েই ছিল। কাঁড়ি কাঁড়ি ওষুধ আর ইঞ্জেকশানেও এতটুকু ইমপ্রুভমেণ্ট হচ্ছিল না। পটলার জেলের খবর পাবার পর হঠাৎ মা'র বুকের যন্ত্রণাটা এত বেড়ে যায় যে ডাক্তার আর বাড়িতে রাখতে সাহস পায়নি। কাল সকালে মাকে ক্যান্সার হাসপাতালে দিয়ে আসতে হয়েছে।

মাকে নিয়ে মল্লিকা আর বাবা-ই হাসপাতালে যাচ্ছিল। সন্দীপ তখন বাড়িতে। এ রকম একটা মারাত্মক সময়ে সে সঙ্গে না গিয়ে পারেনি।

মাকে পরীক্ষা-টরীক্ষা করে একজন স্পেশালিস্ট জানিয়ে দিয়েছিল, অপারেশন করতে হবে।

সেই মুহূর্তে সন্দীপের হৃৎপিণ্ডে ধারাল ফলার মতো কী যেন দ্রুত ঢুকে যাচ্ছিল। গলগল করে ঘামতে শুরু করেছিল সে। অস্থির গলায় বলেছিল, 'করতেই হবে?'

'ইয়েস। ইট ইজ আর্জেণ্ট এ্যাজ এনিথিং—'

'কবে করবেন?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তবে—'

'কী?'

অপারেশনের আগে নানারকম পরীক্ষা-টরীক্ষা করতে হবে। কয়েকজন স্পেশালিস্ট নিয়ে একটা মেডিক্যাল বোর্ড বসাতে হবে। তারপর—'

মা'র জন্যই কয়েক হাজার মাইল উড়ে কলকাতায় এসেছে সন্দীপ। মামুলী খোঁজখবর নেওয়া ছাড়া তার অসুখের ব্যাপারে সে কিছুই করেনি। এমন কি রিনির সঙ্গে আলাপ হবার পর মাঝে মাঝে মা'র ঘরে যাবার কথা ভুলে গেছে সন্দীপ। স্পেশালিস্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার হাত-পা কাঁপছিল। শিথিল স্বরে সে বলেছিল, 'কেসটা কি সীরিয়াস?'

'ভেরী সীরিয়াস।'

'অপারেশনে রিস্ক আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে।'

একটু ভেবে সন্দীপ বলেছিল, 'যদি অপারেশন না করা হয়?'

স্পেশালিস্ট বলেছিল, 'তাতে আরো ভয়।'

পটলার জেল, মা'র হাসপাতালে যাওয়া—এই দুটো বিরাট ঘটনা সন্দীপকে দুর্বল করে দিতে লাগল। হুইস্কি-বান্ধবী-হুল্লোড়-বাজি দিয়ে-ঘেরা দশ বছরের অভ্যস্ত জীবনটা হঠাৎ কেমন যেন অপরিচিত আর দূরের মনে হতে থাকে। সন্দীপের মনে হয়, আর কিছুদিন থাকলে এখান থেকে সে বেরুতে পারবে না। অভাব-হতাশা আর ফ্রাসট্রেসনের এই অসুস্থ ক্লান্ত বিপর্যস্ত জীবনের মধ্যে কোথায় যেন দুর্দান্ত সম্মোহিনী এক শক্তি আছে।

তিন দিন পর ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে দুম করে রিনি এসে হাজির। তার কথা এ ক'দিন সন্দীপ যে ভাবেনি, তা নয়। কিন্তু সে ভাবনার মধ্যে তীব্রতা ছিল না। থাকলে কবেই যোধপুর পার্কে চলে যেত। একেকবার সন্দীপের মনে হয়েছে, রিনিটা ভো-কাট্টা হয়ে গেল নাকি? ও যা মেয়ে, যখন তখন নতুন বয়ফ্রেণ্ড জুটিয়ে নিতে পারে। যদি জুটিয়েই থাকে কী আর করা যাবে।

রিনি এল যেন ঝড় হয়ে। সদর দরজা থেকেই উঁচু গলায় ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢুকল, 'সন্দীপ—সন্দীপ—'

সন্দীপ নিজের ঘরে শুয়ে একটা সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। লাফ দিয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এল, 'কী ব্যাপার, এই দুপুরবেলা!'

'দারুণ খবর আছে।' সন্দীপকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল রিনি।

'কী খবর?'

'কমনওয়েলথ্ স্কলারশিপটা পেয়ে গেছি।'

'কনগ্র্যাচুলেসনস্—'

সন্দীপ হাত বাড়িয়ে দিল, রিনিও বাড়াল। রিনির হাতটা চেপে ধরে আলতো করে ঝাঁকিয়ে দিল সন্দীপ। তারপর বলল, 'বোসো—'

পাশাপাশি বসে সন্দীপ আবার বলল, 'কবে এসেছে স্কলারশিপটা?'

'এই তো দিন তিনেক।'

সন্দীপের মনে পড়ে গেল, তিন দিন আগেই বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের সামনে রিনির সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি—'

'হঠাৎ!' রিনি অবাক।

'তোমার সঙ্গে বুধবার দেখা করবার কথা ছিল না? জরুরী কাজে এমন আটকে গেলাম যে যেতে পারিনি।'

'আরে আমিও সেদিন যেতে পারিনি; আমার দিক থেকেও ক্ষমা চাইবার আছে।'

'যাক গে, শোধবোধ।'

সন্দীপ হাসল, রিনিও হাসল। সন্দীপ বলল, 'তারপর কবে লণ্ডন যেতে হচ্ছে?'

রিনি বলল, 'উইদ ইন এ উইক—'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'দশ-বারো দিনের ভেতর সেসান শুরু হয়ে যাচ্ছে যে।'

'পাশপোর্টের কী হবে?'

'সেই জন্যেই তো লাস্ট তিনটে দিন টেরিব্‌লি বিজি ছিলাম। এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করতে হয়েছে। দিল্লীতে দশটা ট্রাঙ্ক করেছি।'

'তাতে লাভ হয়েছে কিছু?'

'সিয়োর—'

'পাশপোর্ট কবে পাচ্ছ?'

'পরশু-টরশু।'

'সাতদিনের ভেতরেই তা হলে যাওয়া সেটেলড্?'

'হ্যাঁ।'

একটু চুপ।

তারপর সন্দীপ বলল, 'ভেরি গুড নিউজ।'

রিনি বলল, 'দুপুরবেলা এই গরমে ঘরে বসে থাকার কোন মানে হয় না। চল কোথাও যাই—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তোমার জীবনে এমন একটা দারুণ ব্যাপার ঘটল। চলো, সেলিব্রেট করা যাক।'

দু' জনে বেরিয়ে পড়ল।

রিনির গাড়িটা রাস্তার ওধারে দাঁড়িয়ে ছিল। দরজা খুলে রিনিই প্রথমে উঠল, তারপর সন্দীপ।

রিনি যখন গাড়ি নিয়ে বেরোয়, ড্রাইভার থাকে না। ও নিজেই ড্রাইভ করে। দারুণ স্পীডে গাড়ি চালায় রিনি। কলকাতার সরু সরু রাস্তায়, টেম্পো-লরি-রিক্সা-ঠেলা-বাস-ট্যাক্সি-ট্রাম আর হাজার হাজার প্রাইভেট কার যেখানে ডেলা পাকিয়ে আছে তার ভেতর এত র‍্যাশ চালাবার মানে হয় না। যে সন্দীপ ইওরোপ চষে বেড়িয়েছে, রিনির পাশে বসে একেক সময় সে-ও নার্ভাস হয়ে পড়ে।

বোঁ করে গাড়ি ঘুরিয়ে ওরা ট্রামরাস্তায় এসে গেল। রিনি বলল, 'কোথায় যাবে?'

যেদিনই রিনি তাকে বাড়ি থেকে তুলে নেয়, ট্রাম রাস্তায় এসে এই প্রশ্নটা করে। সন্দীপ বলল, 'যে-দিকে খুশি—' রোজ এই উত্তরটাই সে দিয়ে থাকে। গাড়িতে উঠলে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে আর যেন কিছু থাকে না, রিনির ইচ্ছাতেই নিজেকে ছুঁড়ে দেয় সন্দীপ।

রিনি বলল, 'রোজই তো এসপ্ল্যানেডের দিকে যাই; আজ গড়িয়া হয়ে নরেন্দ্রপুরের দিকে যাওয়া যাক।'

'ঠিক আছে।'

'রাস্তার পাশে ভালো মাঠ দেখলে, গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ব। সব সময় ট্রাম-বাস, বাড়ির পর বাড়ি, পীচের রাস্তা দেখে চোখ পচে যাচ্ছে।'

'যা বলেছ।'

রিনি গাড়ির মুখ গড়িয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিল। খানিকটা গিয়ে হঠাৎ বলল, 'আরে একটা কথা জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছলাম।'

'কী?' সন্দীপ রিনির চোখের ভেতর তাকাল।

'তুমি কবে জার্মানী যাচ্ছ?'

সন্দীপ চমকে উঠল। এক মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিল সে। মনে মনে গুনে দেখল এর মধ্যে পাক্কা একুশটা দিন কেটে গেছে। হাতে আট-ন'দিনের বেশি নেই। জার্মানী ফিরে যেতে হলে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু করা দরকার।

আশ্চর্য, ফেরার কথাটা এ ক'দিন একবারও মনে পড়েনি! সন্দীপের মনে হ'ল, পটলা-মেজদি-মা—সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে তাকে ঠেলতে ঠেলতে একটা জটিল ফাঁদের ভেতর নিয়ে গেছে। শুধু কি ওরাই, এ চক্রান্তে কে নেই? বড়দির করুণ বিষণ্ন মুখ, বৌদির উদাসীন শোকের চেহারা, দাদার রোগা হাড়গিলেমার্কা বাচ্চাগুলো, হারু এবং সবার ওপর মল্লিকা। এরা যেন দশ বছরের অভ্যস্ত জীবনের কক্ষপথ থেকে একটানে তাকে নামিয়ে এনেছিল।

হঠাৎ দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল সন্দীপ; কিন্তু তক্ষুণি টের পেল, কলকাতার এই একুশটা দিন তাকে ভেতরে ভেতরে অনেক দুর্বল করে ফেলেছে। তবু একগুঁয়ের মতো সন্দীপ ভাবল, সে যাবেই। রিনির মতো মেয়েই যদি চলে যায় এ শহরে পড়ে থাকার মানে হয় না। সন্দীপ বলল, 'আট ন'দিনের ভেতর আমিও চলে যাব।'

'ফাইন। জার্মানীতে গিয়ে আমার কথা মনে থাকবে?'

'তোমাকে কি ভোলা যায়?'

'মাঝে মধ্যে লণ্ডন চলে এসো —

'নিশ্চয়ই। সে কথা তো আগেই হয়ে আছে।'

কি মনে পড়তে সন্দীপ আবার বলল, 'তুমি স্কলারশিপ পেয়ে লণ্ডন যাচ্ছ ; ব্যাপারটা কিভাবে সেলিব্রেট করা যায় বল তো ?'

রিনি বলল, 'তোমার যেভাবে খুশি।'

দশ মিনিট ভেবেও কিছুই ঠিক করতে পারল না সন্দীপ। দু হাত পেছন দিকে ছড়িয়ে শরীরটা সীটে এলিয়ে দিল। আস্তে করে বলল, 'আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। তুমি যা হয় ঠিক কর।'

রিনি সন্দীপের দিকে তাকাল। হাল্কা নীল রঙের গগল্‌সের ওপর তুলিতে-আঁকা আই-ব্রো অল্প কুঁচকে গেল। বলল, 'সেলিব্রেট করবে তুমি ; তার প্রোগ্রাম করে দিতে হবে আমাকে ?'

সন্দীপ হাসল।

ভুরু কুঁচকে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রিনি। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। কাল তো হবে না, আমার একটা জরুরী এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে, পরশু চল দীঘা চলে যাই। পরশু-তরশু দু দিন ওখানে থাকব ; তার পরের দিন কলকাতা ফিরব।'

অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না সন্দীপ। কলকাতা যে তলায় তলায় এতদূর এগিয়ে গেছে, তার ধারণা ছিল না। রিনি, দেখা যাচ্ছে কন্টিনেণ্টের যে কোনো মেয়ের কান ধরে চরকি নাচিয়ে দিতে পারে। একসময় সন্দীপের গলায় আবছা দ্বিধাগ্রস্ত শব্দ ফুটল, 'কিন্তু—'

'কী ?' রাজহাঁসের মতো সুশ্রী নিটোল গ্রীবা বাঁকিয়ে এদিকে তাকাল রিনি।

'দু দিন বাড়িতে থাকবে না, তোমার বাবা-মা কিছু বলবে না ?'

'ও-ও, হাউ সিলি।' বলেই আচমকা হেসে উঠল রিনি ; হাসতে হাসতে জলপ্রপাত হয়ে গেল। তার সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল ; স্টিয়ারিং থেকে হাতটা মাঝে মাঝেই খসে যাচ্ছিল ; তক্ষুণি অবশ্য শক্ত করে আবার ধরে ফেলেছিল। আর গাড়িটা মাতালের মতো রাস্তার দু ধারে টাল খাচ্ছিল। হাসতে হাসতে রিনি বলল, 'তুমি না এমন মজার কথা বলতে পার ! সত্যি করে বলো তো দশ বছর জার্মানীতে ছিলে, না কাশীর টোলে কাটিয়ে এসেছ ?'

সন্দীপ হকচকিয়ে গেল, 'হঠাৎ এ কথা ?'

'আরে বাবা, আমি সাফিসিয়েণ্টলি গ্রোন-আপ ; আমার চলা-ফেরার ব্যাপারে বাড়ির কেউ মাথা ঘামায় না। অবশ্য বাবা-মা'র মধ্যে মিডল্‌ ক্লাশ

মেণ্টালিটি অনেক সময় প্লে করে; জীবনে ওদের খুব আম্বল্ বিগিনিং ছিল কিনা। কিন্তু পাছে হাই সোসাইটির লোকেদের কাছে লুডিক্রাস পজিসানে পড়তে হয় তাই দাদার বা আমার কোনো ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করে না।'

'ও, আই সী। দ্যাটস্ নাইস—'

এই মেয়েটা, দিস রিনি—এলে সন্দীপ যেন অনেকখানি শক্তি পায়। বাবা-মা, বৌদি-আলো, এবং তাদের সংসার—সব বিরুদ্ধ প্রবল স্রোতগুলি তাকে যতটা দুর্বল করে ফেলে রিনি এসে ঠিক ততটা ভরসাই যুগিয়ে যায়। ক্লান্ত পরাজিত সন্দীপের কাছে রিনি যেন আত্মবিশ্বাসের মতো। রিনির সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই সন্দীপের মনে হচ্ছে, তাকে নিয়ে যেন সর্বক্ষণ একটা দড়ি-টানাটানি চলছে। দড়িটার এক দিক রিনির হাতে; অন্য দিকটা বাবা-মা-মল্লিকাদের।

একুশ

পরশু দিন কিন্তু দীঘা যাওয়া হ'ল না। সকাল বেলা হাসপাতাল থেকে জরুরী খবর এল, এক্ষুণি সেখানে যেতে হবে। খবর দিয়েই হাসপাতালের লোক চলে গেল।

গৌরী-রমা ফ্যাক্টরিতে চসে গেছে। মল্লিকা এত সকালে এ বাড়িতে আসে না। আলো বা বৌদির থাকা না-থাকা সমান। বাবা অবশ্য আছে; আর সন্দীপও আছে।

হাসপাতালের খবর শুনে বাবা এতো ভয় পেয়ে গেল যে তার গলা দিয়ে প্রায় আওয়াজ বেরুচ্ছিল না, হাত-পা দারুণ কাঁপছিল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর অস্ফুট গোঙানির মতো একটা শব্দ সে বার করল, 'কী ব্যাপার রে পচা; খারাপ কিছু হয়েছে নাকি?'

হাসপাতালের লোকটার মুখে বাবা যতটুকু শুনেছে ঠিক ততটুকুই সন্দীপের জানা। বাবা কি মা'র মৃত্যুর কথা ভাবছে? কিন্তু এভাবে তো মৃত্যুর খবর আসে না। নিজের মধ্যে দারুণ অস্থিরতা অনুভব করছিল সন্দীপ। বলল, 'কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

'কী করব এখন?'

সন্দীপ লক্ষ করল, বাবার হাত-পা এবং হাড়-মাংস-টাংস সব আলগা হয়ে যাচ্ছে যেন। মুখটা হঠাৎ অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছে। এই নার্ভাস ভীতু কাতর

লোকটা হাসপাতালে গিয়ে চোখ উল্টে মূর্ছাই যাবে। সন্দীপ বলল, 'তুমি বাড়িতেই থাকো, আমি হস্‌পিটালে গিয়ে দেখে আসছি কী হয়েছে।' মা'র খবরটা এত আকস্মিক যে রিনির সঙ্গে দীঘা যাবার কথাটা এই মুহূর্তে তার মনে থাকল না।

বাবা আবছা গলায় বলল, 'সেই ভালো; তুই হাসপাতালেই যা। আমি মনুদের বাড়ি হয়ে ওকে নিয়ে যাচ্ছি। মনুটা কাছে থাকলে সাহস পাওয়া যায়।'

সন্দীপের কপালে ভাঁজ পড়ল। কলকাতায় পা দিয়েই সে দেখছে মল্লিকার ওপর এ বাড়ির সবার, বিশেষ করে বাবার দারুণ নির্ভরতা। এক পলক বাবাকে দেখে সন্দীপ বেরিয়ে পড়ল।

হাসপাতালে আসতেই জানানো হ'ল, আজই মা'র অপারেশন করতে হবে। সমস্ত রেডি। ও. টি., নার্স, সার্জন—সব। শুধু বাড়ির লোকের একটা বণ্ড দরকার; সেই জন্যেই অপেক্ষা করা হচ্ছে।

বাবা রিফিউজি কলোনিতে ঘুরে মল্লিকাদের নিয়ে আসবে। এক ঘণ্টার আগে আসতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু মা'র অপারেশন আর এক সেকেণ্ডও ফেলে রাখা চলবে না। গম্ভীর ঠাণ্ডা মুখে ডাক্তার বলল, 'এমার্জেন্সি কেস। আপনার বাবার জন্য দেরি করা যাবে না। ইউ আর সান—আপনিই বণ্ডে সই করে দিন।'

'আমি!' ধূসর চোখে তাকাল সন্দীপ।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনি। কুইক—'

ঘোরের মধ্যে সই করতে করতে সন্দীপ ভাবল, সে না এসে যদি বাবাকে পাঠিয়ে দিত, কিংবা সঙ্গে করে আনত।

কিছুক্ষণ পর সন্দীপ দেখতে পেল, সামনের করিডর দিয়ে মাকে একটা ট্রলিতে শুইয়ে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সন্দীপের সমস্ত অস্তিত্বে কিরকম একটা ঝাঁকানি লাগল। দারুণ শীতে দাঁতে দাঁত লাগার মতো হ'ল তার। পর মুহূর্তেই মনে হ'ল কেউ ধাক্কা দিতে দিতে তাকে ট্রলিটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সন্দীপ ট্রলির সঙ্গে ছুটতে লাগল। মুখ ছাড়া মা'র গোটা শরীরটা ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা।

মা তাকিয়ে ছিল। দৃষ্টি ঘোলাটে, নির্জীব। চোখাচোখি হতেই মা হাসল। তাকে দেখে খুশী হয়েছে, খানিকটা অবাকও। এই মুহূর্তে তাকে দেখবে মা যেন ভাবে নি। দুর্বল স্বরে মা কি বলল, সন্দীপ বুঝতে পারল না। সে তাড়াতাড়ি ঝুঁকল, মুখের কাছে মুখ এনে বলল, 'কী বলছ মা?'

মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যতটা দেখা যায়, মা দেখল। তারপর বলল, 'আর কেউ আসে নি?'

'না।'

'ওরা আসবে না?'

'আসবে। বাবা সবাইকে নিয়ে আসছে।' ইচ্ছে করেই মল্লিকার নাম করল না সন্দীপ।

মা বলল, 'একটা কথা বলব বাবা?'

'এখন থাক; তোমার কষ্ট হচ্ছে!'

'এখন না বললে আর হয়তো বলা হবে না।'

'কী আজে বাজে বলছ!'

'আজে-বাজে না রে—'মা আবার হাসল, 'আমার মন বলছে আর বাঁচব না।'

সন্দীপ বলল, 'অপারেশন হলেই লোক মরে যায় নাকি? তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।' তার গলা কাঁপতে লাগল।

মা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'তুই যদি সংসারের দিকে না তাকাস, সংসারটা ভেসে যাবে। ওদের কথা ভেবে মরতে গিয়েও আমি শান্তি পাচ্ছি না।' হাত বাড়িয়ে সন্দীপের একটা হাত ধরল মা।

মাথা তুলে রাখতে মা'র ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। দিশেহারার মতো সন্দীপ তাড়াতাড়ি বলল, 'দেখব মা, তুমি চিন্তা কোরো না।'

মা যেন অনেকখানি শান্তি পেল। তারপর বলল, 'আর ওই মনুটার কথা ভাবিস। তুই বড় হয়েছিস, ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছিস। আমি আর কী বলব—'

এই মুহূর্তে মনে পড়া উচিত নয়, তবু বাংলা ফিল্মের শেষ দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল সন্দীপের, সেই সেখানে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বাবা-মা কি ঠাকুর্দারা নায়ক-নায়িকার হাতে হাত তুলে দিয়ে মিলন ঘটিয়ে যায়। সন্দীপের মজাও লাগল, আবার দুর্বোধ্য ঝাপসা অনুভূতিতে মনটা এলোমেলো হয়ে গেল। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই মা'র ট্রলিটা করিডরের শেষ মাথায় অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে গেল; প্রায় নিঃশব্দে তক্ষুণি কাচের দরজা বন্ধ হ'ল। সন্দীপ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আরো ঘণ্টাখানেক পর মল্লিকাকে সঙ্গে নিয়ে বাবা হাসপাতালে এলো। ততক্ষণে অপারেশন শুরু হয়ে গেছে।

অপারেশন থিয়েটারে যাবার আগে মা'র সঙ্গে সন্দীপের দেখা হয়েছে কিনা, কী কথাবার্তা হয়েছে, মা ভয় পেয়েছে কিনা—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিল মল্লিকা।

মেয়েটার মাথা খুব ঠাণ্ডা ; সহজে সে কাতর হয় না।

বাবা ঠিক উল্টো। একটুতেই অধীর হয়ে ওঠে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছিল না বাবা। একবার উঠছিল, একবার বসছিল, আবার করিডর ধরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটছিল। কণ্ঠার হাড় দারুণ ওঠা-নামা করছিল। হাতের গাঁটওলা এবড়ো খেবড়ো আঙুলগুলো বার বার মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেবেলা থেকেই সন্দীপ দেখে আসছে বিপদের সময় বাবার গলার হাড় ওভাবে লাফাতে থাকে ; হাত মুঠো পাকিয়ে যায়।

এত সবের মধ্যেও রিনির কথা আবার মনে পড়ছে সন্দীপের। অপারেশন কতক্ষণ চলবে, কে জানে। হাসপাতাল ছেড়ে এখন যাওয়া যায় না ; খুবই খারাপ দেখাবে। তা ছাড়া আনন্দ আর হুল্লোড়বাজির মেজাজটাই নষ্ট হয়ে গেছে। মনের ভেতরটা তখন বর্ষার আকাশের মতো ঘোলাটে, আচ্ছন্ন।

সন্দীপ ঠিক করল, রিনিকে একটা ফোন করে দেবে। না হলে শুধু শুধু মেয়েটা তার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফোন করা যায় কিনা, সন্দীপ জানে না।

হাসপাতালের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বাইরের লোকের ফোন করার ব্যবস্থা নেই। তখন সন্দীপ মল্লিকাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কোথাও টেলিফোন বুথ আছে ?'

মল্লিকা বলল, 'আছে।' রাস্তার ওপারে পোস্ট অফিসের লাল বাড়িটা দেখিয়ে বলল, 'ওখান থেকে ফোন করতে পারবেন।'

রিনিদের ফোন নম্বরটা মুখস্থই ছিল। ডায়াল করতে, কি আশ্চর্য, রিনিকেই পাওয়া গেল। সন্দীপ বলল, 'প্রথমেই এপলোজাইস করে নিচ্ছি -

রিসিভারে রিনির গলা ভেসে এল, 'কী ব্যাপার ?'

'দীঘার প্রোগ্রামটা ক্যানসেল করতে হবে। আই এ্যাম সো সরি—'

'তার মানে ? জানো একটা একমোডেসন পেতে কত কষ্ট হয়েছে !'

'জানি ; এই সীজনের সময় এক মাস দু'মাস আগে থেকেই হেল্‌থ্ রিসোর্টগুলোর সব হোটেল-টোটেল এ্যাডভান্স বুকিং হয়ে থাকে।'

'তবে ক্যানসেল করবার কারণটা কী ?'

'আমাদের দারুণ বিপদ হয়ে গেছে।'

'কী ?'

'আজ মা'র অপারেশন হচ্ছে।'

'ও তাই নাকি ! কখন ?'

'এখন চলছে !'

'তুমি কোত্থেকে কথা বলছ ?'

'হসপিটলের সামনে একটা পোস্ট অফিস থেকে।'

'ও, আই সী—'

একটু চুপ। তারপর রিনিই আবার বলল, 'অপারেশনটা মেজর ?'

সন্দীপ বলল, 'হ্যাঁ।'

'কখন শুরু হয়েছে ?'

'ঘণ্টাখানেক হবে।'

'আর কতক্ষণ চলবে ?'

'বলতে পারছি না।'

'তা হলে আর কি করা যাবে। এসময় তোমাকে আসতে বলতে পারি না। দ্যাট উইল বী ভেরি মাচ ক্রুয়েল এ্যাণ্ড হার্টলেস।'

সন্দীপ গলার ভেতর জড়ানো শব্দ করল।

রিনি বলতে লাগল, 'সমস্ত প্রোগ্রামটারই বারোটা বেজে গেল। এত আশা করে বসে ছিলাম।'

ফাঁসির আসামীর মতো মুখ করে সন্দীপ বলল, 'কী করব, বল। এরকম হবে, আমি তো জানতাম না। খুবই দুঃখিত।'

'ঠিক আছে ; কী আর করা যাবে।'

সন্দীপ বলল, 'মাঝখান থেকে এ-ই হ'ল, আমার জন্যে তুমি দীঘা যেতে পারলে না। খুব খারাপ লাগছে।'

রিনি বলল, 'কে বললে দীঘা যাব না ! তোমার জন্যে প্রোগ্রাম ক্যানসেল করব নাকি ?'

আচমকা আলো নিভে যাবার মতো মুখটা কালো হয়ে গেল সন্দীপের।

রিনি আবার বলল, 'পরশু ফিরছি দুপুরে। বিকেলে আমাকে একটা ফোন কোরো।'

'আচ্ছা।'

'এখন তা হলে ছাড়ি।'

লাইন কেটে গেল। তারপরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সন্দীপ। একসময় টেলিফোনের বিল মিটিয়ে অন্যমনস্কের মতো এলোমেলো পায়ে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির জটিলতার ভেতর দিয়ে হাসপাতালে ফিরে এল। যেভাবে সে হাঁটছিল, আরেকটু হলে এ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেত।

অপারেশন শেষ হতে ঝাড়া পাঁচটি ঘণ্টা লেগে গেল। সাড়ে ন'টায় শুরু হয়েছিল, এখন আড়াইটা।

সার্জন জানালো, 'বারো ঘণ্টার আগে পেশেণ্টের জ্ঞান ফিরবার আশা নেই। আপনারা এখন বাড়ি যেতে পারেন। কিছু দরকার টরকার হলে আমরা খবর দেব।'

বলামাত্রই সন্দীপরা চলে গেল না। আরো তিন ঘণ্টার মতো বসে থেকে সন্ধ্যের আগে আগে উঠে পড়ল।

বাইশ

ডাক্তার বলেছিল বারো ঘণ্টার ভেতর জ্ঞান ফিরে আসবে কিন্তু পুরো দু-দিন কেটে গেছে তারপর ; তবু মা'র জ্ঞান ফেরে নি। এই আটচল্লিশটা ঘণ্টা বাবা-বড়দি-মল্লিকা, বাড়ির সবাই দমবন্ধ করে রয়েছে যেন। পরিবেশের জন্যই কিনা, কে জানে, সন্দীপের শ্বাসও আটকে আটকে আসছে। এই দু' দিনের বেশির ভাগ ওদের কেটেছে হাসপাতালে ; খাবার সময় আর রাত্তিরে কিছুক্ষণের জন্য যা একটু বাড়ি আসতে পেরেছে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছে, 'কিরকম মনে হচ্ছে?'

ডাক্তার বলেছে, 'জ্ঞান না ফিরলে কিছুই বলা যাবে না।'

'বাঁচবে তো?'

'সব ডিপেণ্ড করছে জ্ঞান ফেরার ওপর ; তার আগে লাইফের গ্যারাণ্টি দেওয়া অসম্ভব।'

এর ভেতরেও রিনির কথা মনে ছিল সন্দীপের। দু দিন পর সে ফোন করল। রিনিকে বাড়িতে পাওয়া গেল। ঘণ্টা খানেক আগে দীঘা থেকে ফিরেছে।

সন্দীপ বলল, 'তোমার তো দুপুরে ফেরার কথা ছিল, এত দেরি হ'ল?'

'ট্রেন লেট ছিল।'

'দীঘায় কে কে গিয়েছিল? শেষ পর্যন্ত কারোকে পেয়েছিলে?'

'পাবো না মানে? দাদা, রজত আর আমি গিয়েছিলাম।

'দীঘা কিরকম এনজয় করলে?'

'ফাইন। তুমি গেলে আরো জমতো।'

একটুক্ষণ বিষণ্ণ হয়ে রইল সন্দীপ। তারপর বলল, 'ব্যাড লাক। কী আর করব—'

রিনি হাসল, 'সত্যিই তোমার লাকটা খারাপ।'

সন্দীপ বলল, সী কিরকম ছিল? রাফ?

'দীঘার সী রাফ হয় নাকি? কোয়াইট কাম। আর কি আশ্চর্য—'

'কী হ'ল?'

'তোমার মা'র খবর নেওয়া হয়নি। কেমন্ আছেন এখন?'

'একরকম। অপারেশনের পর আর জ্ঞান ফেরেনি।'

'আমি যেদিন দীঘা যাই, সেদিন অপারেশন হয়েছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'দু দিনেও জ্ঞান ফিরল না?'

'না।'

একটু চুপ। তারপর রিনি আবার বলল, 'দীঘা থেকে ফিরে একটা গুড নিউজ পেয়েছি।'

'কী?' সন্দীপের গলায় আগ্রহ।

'আমার টিকিট হয়ে গেছে। পরশু রাত্তিরে বি. ও. এ. সি.-র ফ্লাইটে লণ্ডন যাচ্ছি। কাল কিছু মার্কেটিং করব। তুমি আসতে পারবে?'

'গ্ল্যাডলি।'

'আমি আগে আর ফরেনে যাইনি। কী কী নিতে হবে কিছুই জানি না। দাদা তোমার কথা বলল।'

ঠিক আছে। কখন যাব?'

'ন'টা দশটার ভেতর চলে এসো। মার্কেটিং সেরে বাইরে কোথাও লাঞ্চ করে নেব।'

'আচ্ছা—'

পরের দিন একবারের জন্য হাসপাতালে এসেই তক্ষুণি রিনিদের যোধপুর পার্কের বাড়ি চলে গেল সন্দীপ। আজও মা'র জ্ঞান ফেরেনি। কখন ফিরবে কিংবা আদৌ ফিরবে কিনা ডাক্তার বা নার্সরা কেউ কিছু বলতে পারল না। যে সার্জন অপারেশন করেছিল, বলল, 'ইট'স এ স্ট্রেঞ্জ কেস।'

বেডে মা'র শীর্ণ রোগা শরীর শোয়ানো রয়েছে। গলা পর্যন্ত সাদা চাদর টানা। মা'র মুখটা কাগজের মত সাদা রক্তশূন্য। চোখদুটি বোজা। খুব আস্তে আস্তে, ধীর মৃদু শব্দহীন ভঙ্গিতে মা'র পাখির মতন ছোট্ট পলকা বুকটা ওঠানামা করছিল। যে কোন মুহূর্তে এই উত্থান-পতন যেন বন্ধ হয়ে যাবে।

এই মা তার জন্মদাত্রী। আজ সমস্ত পৃথিবী ঘুরে জীবনকে যে ইচ্ছামতো

ভোগ করতে পারছে তা এই মহিলাটি হৃৎপিণ্ড-ছেঁড়া অসহ্য যন্ত্রণার ভেতর তাকে পৃথিবীতে এনেছিল বলেই না ?

একবার সন্দীপের মনে হ'ল, মাকে ফেলে সে যাবে না। আবার মনে হ'ল, মা যদি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, কিংবা যুগ-যুগান্ত অজ্ঞান হয়ে থাকে, সে কি এই হাসপাতালে বসে থাকতে পারবে ?

প্রবল শক্তিতে সন্দীপ নিজেকে প্রায় উপড়ে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রাস্তায় একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা যোধপুর পার্ক। রিনি রেডি হয়েই ছিল ; সন্দীপকে নিয়ে তক্ষুণি একটা টু-সীটারে উঠল।

রিনির সঙ্গে সারাদিন ঘুরে ঘুরে মার্কেটিং করল সন্দীপ, ওয়েসাইড দামী রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিল। তারপর চরকিবাজির মতো অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে রিনি তাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'কাল সকালে আমাদের বাড়ী চলে এসো। অন্য বন্ধু-বান্ধবরাও আসছে। সারাদিন আমাদের বাড়ী থেকে রাত্তিরে এয়ারপোর্টে সী-অফ করবে। তুমি এলে খুব সুখী হ'ব।'

'ও, সিওর।'

পরের দিনও হাসপাতালটাকে একটু ছুঁয়েই সন্দীপ রিনিদের বাড়ি চলে গেল। অন্য বন্ধুরা—রাকেশ, ইন্দ্রজিৎ, চন্দ্রাণী, প্রেমা—সবাই তার আগে হাজির হয়েছে।

সমস্ত দিন গান-বাজনা খাওয়া-দাওয়া এবং হুল্লোড়বাজি চলল। সন্ধ্যের পর স্নান-টান সেরে দারুণ সেজে যখন রিনি বন্ধুদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, ঘরের নানারঙের আলোগুলো হঠাৎ দশগুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ইন্দ্রজিৎ লাফ দিয়ে উঠে ক্লাউনের মতো এক পাক নেচে নিল। তারপর গোল্লা করে চেঁচিয়ে উঠল, 'এক্সকুইজিটলি বিউটিফুল।'

প্রেমা বলল, 'চারমিং।'

রজত বলল, 'ইংলণ্ডের মাথা তুমি ঘুরিয়ে দেবে।'

ঘরের সবাই মুগ্ধ স্তাবকের মতো নানারকম প্রশংসার কথা বলছিল। নানা রকম কমপ্লিমেণ্ট দিচ্ছিল।

রিনি সকলের মাঝখানে সম্রাজ্ঞীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ সন্দীপের কাছে এসে সে বলল, 'তুমি কিছু বললে না ?'

সন্দীপ বলল, 'আমি আর কি বলব ; ওরাই তো সব বলে ফেলেছে।'

'তবু কিছু একটা বল—' শ্বেত পাথরের মসৃণ ফুলদানীর মতো গলা বাঁকিয়ে রিনি বলল, 'আমাকে দেখে ওরা গাঁইয়া-টাঁইয়া ভাববে না তো ?'

সন্দীপ গাঢ় আবেগের গলায় বলল, 'কী যে বল তার ঠিক নেই। ভাববে ইণ্ডিয়ার কোন প্রিন্সেস বুঝি এসেছে।'

রিনি আলতো করে সন্দীপের কাঁধে টোকা দিল। কমপ্লিমেণ্টটা তার খুবই ভালো লেগেছে। আর সন্দীপ দারুণ একটা বকশিস্ পাওয়ার মতো ভেতরে ভেতরে গদগদ হয়ে রইল।

আরও কিছুক্ষণ পর চারটে গাড়ি ঠাসাঠাসি করে সবাই এয়ারপোর্ট গেল। রিনির বাবা-মাও গেল ওদের সঙ্গে। এয়ারপোর্টে এসে রিনি সন্দীপকে বলল, তুমি কবে জার্মানী যাচ্ছ?'

সন্দীপের হঠাৎ মনে পড়ল, এখনও যাবার কোন তোড়জোড়ই সে ক[illegible]নি। মা'র অপারেশনটা সব গোলমাল করে দিয়েছে। রিটার্ন টিকিট অবশ্য করা আছে কিন্তু ফেরার দিন এখনও ঠিক করতে পারেনি। সন্দীপ দ্রুত শ্বাস টানার মতো শব্দ করে বলল, 'শিগগির যাব।'

'এক কাজ কর না—'

'কী?'

'সোজা জার্মানী না গিয়ে ভায়া লণ্ডন যাও। ওখানে আমি কোথায় থাকব, কে দেখা-শোনা করবে, সব এ্যারেঞ্জমেণ্ট করা আছে। তবু তুমি গেলে আরো নিশ্চিন্ত হতে পারব।'

ওপাশ থেকে তাপস বলল, 'রিনি যা বলছে তাই কর, লণ্ডন হয়েই যা। একজন চেনাজানা লোক পেলে ওর ভালো লাগবে।'

রিনির মা-বাবাও তাই বলল।

সন্দীপ তক্ষুণি সায় দিল, 'আচ্ছা।'

আরো কিছুক্ষণ পর ঝাঁক ঝাঁক 'উইশ এ সেফ ফ্লাইট' এর মধ্যে বি. ও. এ. সি-র বোয়িং-এ গিয়ে উঠল রিনি।

তেইশ

রিনি চলে যাবার পর দু-দিন কেটে গেছে। এখনও মা'র জ্ঞান ফেরেনি। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে মা। এর নামই কি 'স্ট্রাগল্ ফর একজিসটেন্স'? মৃত্যুর সঙ্গে এরকম যুদ্ধ আগে আর দ্যাখেনি সন্দীপ।

মা'র অপারেশনের পর প্রথমটা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সন্দীপ।

তখন সে কিছুই ভাবতে পারছিল না। হাড়-টাড় ভাঙা তালগোল-পাকানো জড়পিণ্ড হয়ে গিয়েছিল যেন। দীঘা থেকে ফিরে রিনি আবার তার মধ্যেকার সেই সন্দীপকে উস্কে দিয়েছে যে জার্মানীতে একটা দিনও বান্ধবী ছাড়া কাটায়নি, একটা সন্ধ্যাও 'বারে' না গেলে যার চলত না।

রিনি যাবার পর দুটো দিন বিমান কোম্পানির অফিসে ছোটাছুটি করল সন্দীপ। কলকাতা ফ্র্যাঙ্কফুর্ট পর্যন্ত তার ডাইরেক্ট টিকিট; ওটাকে ভায়া লণ্ডন করিয়ে নেবার ইচ্ছা। এখন আর মা'র জন্য ততটা অস্থিরতা নেই। হাসপাতালে কিছু-ক্ষণের জন্য সন্দীপ যায় ঠিকই, তখন মনে মনে বলে—মা যদি চিরকাল অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালের বেডে পড়ে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে তাকে বসে থাকতে হবে? সে যদি কলকাতায় না আসত? আর থেকেই বা কতদূর কী করছে? জ্ঞান ফেরাতে পারছে কী? আর এখানে থাকাও যা, জার্মানীতে থাকাও তাই। তা ছাড়া ছুটিও তার আর নেই। যেমন করে হোক পরশুর প্লেন তাকে ধরতেই হবে।

দু-দিন ছোটাছুটির পর কিছু টাকা গচ্চা দিয়ে লণ্ডন হয়ে জার্মানী যাবার ব্যবস্থা করে ফেলল সন্দীপ, বাড়ি ফিরে সবাইকে জানিয়ে দিল—পরশু দিন সে চলে যাচ্ছে।

বাবা-বৌদি-গৌরী-রমারা বোবার মতো তাকিয়ে থাকল। তাদের দিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সন্দীপ। একবার ভাবল, স্যুটকেশ-ফুটকেশগুলো গুছিয়ে ফেলে। সারাদিন ঘোরাঘুরি গেছে, খুব ক্লান্ত লাগছিল। সন্দীপ বিছানায় শুয়ে পড়ল; ভাবল ক'টাই বা জিনিস! কালকের গোটা দিনটা আছে, পরশুও সন্ধ্যে পর্যন্ত পাওয়া যাবে। এক ফাঁকে গুছিয়ে নিলেই চলবে।

শুয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সন্দীপ; হঠাৎ কার ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল। তখনই দেখতে পেল মল্লিকা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেই মল্লিকা বলল, 'নিরুপায় হয়ে আপনার ঘুম ভাঙাতে হ'ল।'

সন্দীপ অবাক। অনেকদিন পর তার ঘরে এল মল্লিকা। সন্দীপ বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসে বোসো—'

মল্লিকা একমাত্র চেয়ারটায় বসল। সন্দীপ আবার বলল, 'কিছু দরকার আছে?'

'তা না হলে কাঁচা ঘুম ভাঙাবো কেন?'

'বল, কী বলবে—'

'আপনি নাকি পরশু জার্মানী চলে যাচ্ছেন?'

মল্লিকা কি তার কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছে? নাকি অন্য কোন বোঝাপড়া?

সন্দীপের চোয়াল শক্ত হ'ল। তবু হেসে হেসে বলল, 'এর মধ্যেই খবর পেয়ে গেছ? কে বললে?'

মল্লিকা বলল, 'কাকাবাবু—'

'ও—'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনার একটা কথা জানা দরকার।' সোজা সন্দীপের চোখের ভেতর তাকাল মল্লিকা।

সন্দীপ এক পলক তাকিয়ে রইল, তারপর চাপা আধফোটা গলায় বলল, 'কী?'

'আমাদের অফিস কাল বন্ধ হয়ে গেছে। কবে খুলবে, আদৌ খুলবে কিনা কে জানে। পাওনা-টাওনা যা আছে, কবে দেবে ঠিক নেই।'

মল্লিকা কী বলতে চায়, সন্দীপ বুঝতে পারল না। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল।

মল্লিকা আবার বলল, 'এ-সময় আপনার যাওয়া ঠিক হবে না।'

'তার মানে?'

'আমার চাকরি নেই, এ-মাস থেকে মাইনে পাব না। তাতে আপনাদের সংসার অচল হয়ে যাবে।'

সন্দীপ হকচকিয়ে গেল, 'তোমার চাকরি না থাকলে আমাদের সংসার অচল হবে কেন?'

চোখ নামিয়ে মল্লিকা বলল, 'মাইনের টাকার প্রায় সবটাই তো আপনাদের বাড়ি দিয়ে দি। গৌরী আর রমা মাসের শেষে আর কত পায়! তাতে কি চলে?'

'এ কথা তো কেউ আমাকে বলেনি।'

'আমিই বলতে বারণ করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কোনদিন বলব না। কিন্তু এখন আর উপায় নেই।'

সন্দীপ বলল, 'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না।'

মল্লিকা চোখ তুলল, 'কী?'

'আমাদের সংসারকে বাঁচাবার জন্যে তুমি এত কষ্ট করেছ কেন?'

কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থাকল মল্লিকা। থাকতে-থাকতে তার গলার কাছে ঢেউয়ের মতো কী খেলে যেতে লাগল। ঠোঁট টিপে-টিপে আর ঢোক গিলে-গিলে কিছু বলতে চেষ্টা করল সে, প্রথমটা পারল না। তার মধ্যে কোথায় যেন একটা দারুণ যুদ্ধ চলছে। এক সময় গলার ভেতর থেকে স্বরটাকে সে বার করে

আনতে পারল। আবছাভাবে বলল, 'তুমি অন্ধ—অন্ধ। কিছুই দেখতে পাও না, কিছুই বুঝতে পার না।' মল্লিকার দু' চোখ জলে ভরে যেতে লাগল।

জার্মানী থেকে ফেরার পর এই প্রথম 'তুমি' বলল মল্লিকা। সন্দীপ অনুভব করতে লাগল তার বুকের ভেতর দুরন্ত বেগে চাকা ঘুরে যাচ্ছে। মনে হতে লাগল, সে বুঝি আর বাঙলাদেশ ছেড়ে যেতে পারবে না। হারুটার খবর নেই, কোথায় গেছে কে জানে, পটলা জেলে। মা'র জ্ঞান এখনও ফেরেনি; মল্লিকার অফিস বন্ধ। সব একাকার হয়ে তার চারপাশের ফাঁদটা দ্রুত ছোটো হয়ে যাচ্ছে। এই নোংরা দীন কদর্য জন্মভূমি হাজার বাহু মেলে তাকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে।